শওকত ওসমানের ছোটগল্পের বিষয় ও আঙ্গিক

গবেষক
শিরীন আখ্‌তার জাহান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ. ডি. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত

বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা

ফেব্রুয়ারি ২০১৯

শওকত ওসমানের ছোটগল্পের বিষয় ও আঙ্গিক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ. ডি. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত

ফেব্রুয়ারি ২০১৯

তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক ডক্টর বায়তুল্লাহ্ কাদেরী
বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০

গবেষক

শিরীন আখ্তার জাহান
রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ৮৬/ ২০০৬-২০০৭
পুনঃ রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ১৫৯/২০১০-২০১১
: ৪৬/২০১৫-২০১৬

প্রত্যয়নপত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, শিরীন আখ্‌তার জাহান আমার তত্ত্বাবধানে 'শওকত ওসমানের ছোটগল্পের বিষয় ও আঙ্গিক' বিষয়ে অভিসন্দর্ভ রচনা সম্পন্ন করেছেন। তাঁর রেজিঃ ৮৬/২০০৬-২০০৭, পুনঃ রেজিঃ ১৫৯/২০১০-২০১১ এবং ৪৬/২০১৫-২০১৬। আমার জানা মতে এই অভিসন্দর্ভের কোনো বিষয়বস্তু অন্য কোনো ব্যক্তি দ্বারা প্রকাশিত হয়নি এবং কোন অংশ ইতোপূর্বে কোনো প্রকাশনা, সাময়িকী, পত্রপত্রিকা, বেতার, টেলিভিশন, ইন্টারনেটে প্রকাশিত বা পঠিত হয়নি। এর কোনো অংশ অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রির জন্য গৃহীত হয়নি।

এই অভিসন্দর্ভটি মূল্যায়নের জন্য সুপারিশ করছি।

(অধ্যাপক ডক্টর বায়তুল্লাহ্ কাদেরী)
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

অনুবন্ধ

‘শওকত ওসমানের ছোটগল্পের বিষয় ও আঙ্গিক’ শীর্ষক অভিসন্দর্ভ রচনার কাজ শুরু করি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক ডক্টর বায়তুল্লাহ্ কাদেরী-এর তত্ত্বাবধানে। গবেষণার বিভিন্ন ধাপে তাঁর সুচিন্তিত নির্দেশনা, অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ অভিমত এ অভিসন্দর্ভ রচনায় সহায়ক হয়েছে। গবেষণা কর্মের সামগ্রিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও রূপরেখা-নির্মাণে তাঁর নিরন্তর উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা ছিল আমার অন্যতম শ্রম-উৎস। তাঁর কাছে আমার কৃতজ্ঞতা ও ঋণ অপরিসীম।

গবেষণাকর্মটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে আমাকে মূল্যবান পরামর্শ ও উৎসাহ দিয়েছেন আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক ডক্টর ভীষ্মদেব চৌধুরী, অধ্যাপক ডক্টর সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ, অধ্যাপক ডক্টর শাহজাহান মিয়া, অধ্যাপক ডক্টর সৌমিত্র শেখর, সহযোগী অধ্যাপক ড. মোমেনুর রসুল, সহকারী অধ্যাপক জনাব মেহের নিগার।

গবেষণাকালে আমি প্রধানত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগ সেমিনার, বাংলা একাডেমি গ্রন্থাগারের সাহায্য নিয়েছি। এ সূত্রে গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারিবৃন্দকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের উপ-গ্রন্থাগারিক, জনাব মোঃ মাঈন উদ্দিনকে বিশেষভাবে স্মরণ করছি। তিনি অনেক সহযোগীতা করেছেন।

অভিসন্দর্ভ রচনাকালে যাঁরা আমাকে নিরন্তর উৎসাহ প্রদান করেছেন, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন আমার মা হাজেরা বেগম ও বাবা মীর এম এ তাহের। নিজের পেশাগত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করেও গবেষণা কর্ম সমাপ্ত করতে যাঁর অবিরত সহযোগিতা ও অনুপ্রেরণা আমাকে অনবসন্ন ও উজ্জীবিত করেছে তিনি আমার স্বামী মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন। গার্হস্থ্য দায়িত্ব পালন থেকে প্রায় বিরত রেখে আমাকে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা মুক্ত করতে তিনি সদা সচেষ্ট থেকেছেন। ক্ষুদ্র ধৈর্য দিয়ে নিজেদের অধিকার বঞ্চিত রেখে আমার অভিনিবেশ বাধাহীন রেখেছে স্কুল পড়ুয়া তিন আত্মজ– ফারহান শাহরিয়ার, সামিহা শেহ্‌রিন ও সায়মা শেহ্‌রিন।

সবশেষে অভিসন্দর্ভের কম্পিউটার কম্পোজ, প্রুফ সংশোধন কাজে সার্বিক সহযোগীতা করার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে কর্মরত জনাব মো. সাইফুল হাসান শামীমকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

শিরীন আখ্‌তার জাহান

অবতরণিকা

শওকত ওসমান বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে একটি বিশিষ্ট নাম। তিনি নানা উপকরণে সমৃদ্ধ করেছেন বাংলা কথসাহিত্যের ভাণ্ডার। একজন বহুপ্রজ লেখক হিসেবে জীবদ্দশায় তিনি যে সুনাম ও সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন খুব কম সাহিত্যেকের ভাগ্যে তা জুটে থাকে। বাংলা কথাসাহিত্যে তাঁর অবদানের বিশিষ্টতা ও যথার্থতা এবং আমাদের সাহিত্যে তাঁর বলিষ্ঠ লেখা দ্বারা কিভাবে দ্যোতনা সৃষ্টি করেছেন, বর্তমান গ্রন্থের আলোচনা সেই দৃষ্টিভঙ্গিজাত।

চল্লিশ-এর দশকের গোড়া থেকেই কলকাতাকেন্দ্রিক সাহিত্যচর্চায় শওকত ওসমান ছিলেন নিবেদিতপ্রাণ। সাহিত্য জীবনের শুরু থেকে গল্প লেখার প্রবণতা ছিল শওকত ওসমানের। চল্লিশের দশকে কলকাতা থেকে তাঁর কিশোর পাঠ্য *ওটেন সাহেবের বাংলো* গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। মূলত দেশ বিভাগের পর থেকে ঢাকা হতে তাঁর গ্রন্থরাজি প্রকাশিত হয়।

মুসলিম রচিত বাংলা কথাসাহিত্যে একটি বড় দৈন্য দেখা যায় মুক্ত চিন্তাচর্চায়। উনিশ শতকে আমাদের কথাসাহিত্যের প্রারম্ভপর্ব থেকে মুসলমানদের মধ্যে ধর্মীয় আচ্ছন্নতা এত প্রবল ছিল যে, পাশ্চাত্য মানবতাবাদী জীবনাদর্শ একমাত্র মীর মোশাররফ হোসেন ছাড়া অন্য কারো মধ্যে পরিলক্ষিত হয় না। এই ধর্মীয় আবছায়ায় কথাসাহিত্যের চর্চা অব্যাহত থাকে ১৯৩০-এর দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত। এরপর থেকে মুসলমানদের মধ্যে মুক্তবুদ্ধি ও উদার জীবননীতির আলোকে সাহিত্যচর্চার স্ফুরণ ঘটে। শওকত ওসমান তাঁর সমগ্র সাহিত্যিক জীবনে মুক্ত জীবনবোধের দীপ্তিকেই লালন করেছন।

বাংলাদেশের ছোটগল্প রচনার ক্ষেত্রে শওকত ওসমান বিষয়ভাবনা, জীবনবৈচিত্র্যের রূপায়ণ ও আঙ্গিকের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় একজন অসাধারণ শিল্পী। চল্লিশের দশক থেকে শুরু করে নব্বই এর দশক পর্যন্ত তিনি আমাদের কথাসাহিত্যকে বিচিত্র উপকরণে সমৃদ্ধ করেছেন। যার কারণে শওকত ওসমানের ছোটগল্পের বিষয় ও আঙ্গিক সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করার জন্য এই বিষয়টি নির্বাচন করা হয়েছে।

শওকত ওসমানের ছোটগল্পের বিষয় ও আঙ্গিক শীর্ষক এ-অভিসন্দর্ভে উপসংহার ও পরিশিষ্ট ব্যতীত তিনটি অধ্যায় রয়েছে। প্রথম অধ্যায়ের শিরোনাম– 'শওকত ওসমানের শিল্পী-মানস'। এই অধ্যায়ে শওকত ওসমানের সংক্ষিপ্ত জীবনকথার মধ্যে তাঁর অভিজ্ঞতার আলেখ্য ধারণ করার চেষ্টা করেছি। অর্থাৎ তাঁর শৈশব, শিক্ষাজীবন, সংসারজীবন, কর্মজীবন এবং সমকালীন সমাজ ও মানুষের সঙ্গে একীভূত হয়ে ওঠার পরিপ্রেক্ষিত

Dhaka University Institutional Repository

আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায় তিনটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। প্রথম পরিচ্ছেদের শিরোনাম– 'শওকত ওসমানের ছোটগল্পে গ্রামীণ জীবন ও সমাজ'। এই পরিচ্ছেদে গ্রামীণ সমাজবাস্তবতা, সমাজ অন্তর্গত বিচিত্র মানুষের হাসি-কান্না, তাদের জীবন-সংগ্রাম, দুঃখ-দুর্দশা প্রভৃতি বিষয় শওকত ওসমানের ছোটগল্পে কিভাবে ফুটে উঠেছে সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের শিরোনাম– 'শওকত ওসমানের ছোটগল্পে নগর জীবন'। এই পরিচ্ছেদে নগরজীবনে মানুষের বিচিত্র অভিজ্ঞতা, তাদের দৈনন্দিন জীবনের নানা টানাপড়েন সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। তৃতীয় পরিচ্ছেদের শিরোনাম– 'শওকত ওসমানের ছোটগল্পে রাজনীতিচেতনা'। বাংলাদেশের রাজনৈতিক অবস্থা– ভাষা আন্দোলন, স্বাধীনতা যুদ্ধের পটভূমি, যুদ্ধের সময় পাক হানাদারদের বর্বরতা-নিপীড়নের ভয়াবহ চিত্র শওকত ওসমানের ছোটগল্পে কিভাবে রূপ লাভ করেছে সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম– 'শওকত ওসমানের ছোটগল্পের আঙ্গিক'। ছোটগল্পের আঙ্গিক নির্মাণের প্রশ্নে শওকত ওসমানের সাফল্য স্বীকৃত। লেখকের শিল্পদৃষ্টি ও সৃষ্টিবৈচিত্র্যের স্বরূপ বহুমাত্রিক বৈশিষ্ট্যে অভিব্যঞ্জিত। তাঁর গল্পের দৃষ্টিকোণ, আঙ্গিক নির্মাণ, চরিত্রানুগ ভাষা-প্রয়োগ, এমনকি ব্যঞ্জনাধর্মী রূপক-প্রতীকের ব্যবহার, প্রতিটি ক্ষেত্রেই নব-আঙ্গিকের পরিচয় স্পষ্ট। তীব্র ও গভীর ইঙ্গিতের দ্বারা, ক্ষেত্র বিশেষে রূপক-প্রতীকের আশ্রয়ে তিনি তাঁর গল্পের বক্তব্যকে প্রাঞ্জল করে তোলেন। মূলত দেশকালের সঙ্কট থেকে নিরাপত্তা লাভের জন্যই ছিল লেখকের রূপক-প্রতীকাশ্রয়ী মানসচেতনার জন্ম। যার ফলে তাঁর গল্পগুলো কখনও হয়ে ওঠে ইঙ্গিতধর্মী, কখনও ঘটনাধর্মী আবার কখনও রূপক-প্রতীকধর্মী।

শওকত ওসমানের ছোটগল্পের বিষয় ও আঙ্গিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে যে সত্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে তার সারাংশ বর্ণিত হয়েছে উপসংহার অংশে। গ্রন্থপঞ্জি অংশে অভিসন্দর্ভের ব্যবহৃত শওকত ওসমানের গ্রন্থপঞ্জি, শওকত ওসমান-বিষয়ক গ্রন্থ ও পত্রিকা এবং এছাড়াও অন্যান্য সহায়ক গ্রন্থ ও পত্রিকার তালিকা তুলে ধরা হয়েছে। এ অভিসন্দর্ভ রচনায় মূলগ্রন্থ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে–

উপলক্ষ্য, ওয়ার্সী বুক করপোরেশন, ঢাকা, ১৯৬৫

বিগত কালের গল্প, বিউটি বুক হাউস, ঢাকা, ১৯৮৭

হন্তারক, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯১

শওকত ওসমান গল্পসমগ্র (সম্পা. বুলবন ওসমান), সময় প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৩

Dhaka University Institutional Repository

সূচি

অবতরণিকা			৫-৬
প্রথম অধ্যায়	:	শওকত ওসমানের শিল্পী-মানস	৮-৩৩
দ্বিতীয় অধ্যায়	:	শওকত ওসমানের ছোটগল্প	৩৪-১৩৮
প্রথম পরিচ্ছেদ	:	শওকত ওসমানের ছোটগল্পে গ্রামীণজীবন ও সমাজ	৩৫-৬৯
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	:	শওকত ওসমানের ছোটগল্পে নগরজীবন	৭০-৯৪
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	:	শওকত ওসমানের ছোটগল্পে রাজনীতিচেতনা	৯৫-১৩৮
তৃতীয় অধ্যায়	:	শওকত ওসমানের ছোটগল্পের আঙ্গিক	১৩৯-২০৫
উপসংহার			২০৬-২০৯
পরিশিষ্ট			২১০-২২০

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

শওকত ওসমানের শিল্পী-মানস

শওকত ওসমান (১৯১৭-১৯৯৮) বিশ শতকের বাংলাদেশের কথাসাহিত্যের একজন শক্তিমান শিল্পী। বাংলাদেশের ছোটগল্প রচনার ক্ষেত্রে শওকত ওসমান বিষয়ভাবনা, জীবনবৈচিত্র্যের রূপায়ণ ও আঙ্গিকের পরীক্ষা নিরীক্ষায় একজন অসাধারণ রূপকার। চল্লিশের দশক থেকে শুরু করে নব্বই-এর দশক পর্যন্ত তিনি এদেশের কথাসাহিত্যকে বিচিত্র উপকরণে সমৃদ্ধ করেছেন। জীবন, কর্ম ও সাহিত্যে শওকত ওসমান একজন নিরতিশয় বৈচিত্র্যসন্ধানী পুরুষ। সাহিত্যের সৃষ্টিক্ষেত্রে নিরন্তর বৈচিত্র্যের যাত্রা কবিতা দিয়ে শুরু হলেও কবিতার মধ্যে তাঁর প্রয়াস সীমিত থাকেনি। কবিতা ছাড়াও গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রসারিত হয়েছে তাঁর মনন ও চিন্তাধারা। এমনকি নতুনত্বের অনুধ্যানে পিতৃদত্ত নাম আড়াল রেখেই 'শওকত ওসমান' এই সাহিত্যিক নামে তিনি পাঠক মহলে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর জীবনের মধ্যে যেমন নানা রূপ বৈচিত্র্যের স্পর্শ পাই, কর্মে পাই গতি আর অভিজ্ঞতা, তেমনই সৃষ্টিতেও মেলে বহুজ্ঞ পুরুষের দর্শন ও চিন্তার সমাহার।

১৯১৭ সালের ২ জানুয়ারী পশ্চিমবঙ্গের হুগলী জেলার খানাকুল থানার অন্তর্গত সবলসিংহপুর গ্রামের মেহেদি মহল্লায় কথাশিল্পী শওকত ওসমান জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পৈত্রিক নাম শেখ আজিজুর রহমান। পিতার দেয়া নামের স্থলে সাহিত্যিক ছদ্মনাম ব্যবহার করার পেছনে যে ইতিহাসটুকু কাজ করেছে সে সর্ম্পকে লেখক বলেছেন :

> আজিজুর রহমান নামে আর একজন কবি ছিলেন। আর ছদ্মনাম গ্রহণের পেছনে হয়তো অচেতন কোন কারণ থাকতে পারে। আমার জানার কথা নয়। আমার এক বোন ছিলেন। নাম সুফিয়া খাতুন। তিনি শওকত আলী রাখার পক্ষপাতি ছিলেন। আমি আলীর জায়গায় ওসমান যোগ করেছিলাম। ১৯৩১, ঠিক চুয়ান্ন বছর আগে তিনি পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন। তাঁর স্মৃতি আমার ছদ্মনামের সঙ্গে জড়িত। [১]

সাহিত্যে এবং সামাজিক জীবনে তিনি শওকত ওসমান নামে পরিচিত হয়ে উঠলেও পৈতৃক নামটি তাঁর কাগজে-কলমে থেকে যায়। এটাকে এফিডেবিট করে আমূল পরিবর্তনে তিনি আর অগ্রসর হননি। তাঁর চাকরি বা পেশায় শেখ আজিজুর রহমান নামেই সকল কার্যাদি সম্পন্ন হত। শওকত ওসমানের বাবার নাম মোহাম্মদ ইয়াহিয়া। তিনি ছিলেন কৃষিজীবী। কারুবিদ্যা (কাঠমিস্ত্রি) ছিল তাঁর অন্যতম পেশা। দারিদ্র্যের

Dhaka University Institutional Repository

কারণেই মাঝে মাঝে তাঁর পেশার পরিবর্তন ঘটেছে। একবার শহরে কাঠগোলা করেছিলেন। সেটাও দেনার দায়ে বিক্রি হয়ে যায়।[২] দারিদ্র্য আর অভাবের সাথে সংগ্রাম করে ১৯৪৭ সালে তিনি লোকান্তরিত হন। শওকত ওসমানের মাতার নাম গুলজান বেগম। পিতামহ কোরবান আলী ছিলেন কিছুটা গতানুগতিক গ্রামীণ স্বভাবের বাইরে। তিনি সম্ভবত স্ত্রীর প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন না। কলকাতা শহরের এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াতেন। শওকত ওসমানের জন্ম, শৈশব, কৈশোর, তারুণ্য, ছাত্রজীবন, পেশা, সাহিত্যিক ও ব্যক্তি জীবনের বিভিন্ন দিক উন্মোচনের জন্য তাঁর আত্মজীবনীমূলক রচনাসমূহ[৩] বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ''এ সব রচনা থেকে জানা যায়, শওকত ওসমান তাঁর দাদির হাত ধরে নিজ গ্রাম সবলসিংহপুর গ্রামের মেহেদি-মহল্লা এবং পার্শ্ববর্তী গ্রাম-প্রতিবেশের সান্নিধ্যে আসেন এবং প্রত্যক্ষ করেন জন-জীবনের বিচিত্ররূপ। শৈশবে লেখক দাদির নিকট থেকে শুনেছেন রূপকথা, উপকথা, পুথি, স্বগ্রাম-পার্শ্ববর্তী গ্রাম জনপদের বিচিত্র কাহিনি।''[৪] অর্থাৎ লেখক শওকত ওসমান বাল্যকালে দাদি খুশীমন এর আদর যত্নে লালিত হয়েছেন এবং পার্শ্ববর্তী জনগোষ্ঠীর-জনপদের হাজারো সুখ-দুঃখ, ভাঙ্গা-গড়ার ইতিহাসের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। এবং এ সম্পর্কে লেখকের বক্তব্য :

> অতি সাদাসিধা মানুষ, এক থেকে বিশ পর্যন্ত গণতে পারতেন না। পাঁচ বা দশের হিসাবে চলতেন। বলাবাহুল্য, তিনি নিরক্ষর। গোলমাল প্রশান্ত মুখাবয়ব। কারো খারাপ আচরণে তিনি চেতে উঠতেন না। ছেলেবেলায় তিনি ছিলেন আমার গোটাপৃথিবী। মার চেয়ে বিশেষ প্রিয়জন, বায়না-আবদারের ক্ষেত্রভূমি।... ছেলেবেলায় দাদির সঙ্গে গ্রামের পথে হাঁটা মানে নানা অভিজ্ঞতা।[৫]

শওকত ওসমান শৈশবে একদিকে যেমন দাদির স্নেহসিক্ত হয়ে সমকালীন নানামাত্রিক অভিজ্ঞতার সাথে পরিচিত হয়েছেন, অন্যদিকে মায়ের কোমল ও কঠিন অনুশাসনের মধ্য দিয়ে বিদ্যাভ্যাস করেছেন। "তাছাড়া মায়ের আগ্রহে-প্রশ্রয়ে-শাসনে তিনি সাধারণ মানুষজন ও বহির্জগৎ সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেন। তাঁর লেখকসত্তা গঠনে শৈশব-কৈশোরের অর্জিত অভিজ্ঞতা প্রত্যক্ষ প্রভাব ফেলেছে এবং এর সাথে জগৎ ও জীবনের বিচিত্র অনুষঙ্গ যুক্ত হয়েছে।"[৬] তবে লেখকের গল্প উপস্থাপন কৌশলটি সম্ভবত মাতৃসূত্রে প্রাপ্ত। লেখকের উক্তি :

> তবে মার গল্প বলা সবচেয়ে ভালো লাগত। মেজাজ কড়া তার। লেখাপড়ার বেলা তো আগুন। কিন্তু গল্প বলতেন চমৎকার। গাঁয়ের ভিতর নানা কাণ্ড হয়। আকসাআক্সি দুই ভায়ে বা দুই সতীনে–এসব মা বড় সুন্দর বয়ান করতেন। কিন্তু সে গল্প রূপকথা নয়। গাঁয়ের কাহিনি। ব্যক্তি-ভিত্তিক, ঘটনা-ভিত্তিক। নিজের পাড়ার বিশ্লেষণ, কে কেমন ধরণের মানুষ বা আচার ব্যবহারে কি পরিচয় পাওয়া যায়, তা সুন্দর বয়ান করতেন।[৭]

দাদির রূপকথার জগৎ ছেড়ে বস্তু ও বাস্তব জগতে অনুপ্রবেশ করতে মায়ের এ মেজাজ, জীবনদৃষ্টি উত্তরোত্তর তাঁকে সাহিত্যের পথে চালিত করেছে এবং মানুষ-মানবসমাজকে বুঝতে সহযোগিতা করেছে। এর

Dhaka University Institutional Repository

ফলে তিনি মন থেকে অন্ধসংস্কার-অন্ধবিশ্বাস, গোঁড়ামির শেকড় ঝেড়ে ফেলে সাহিত্য রচনা করেছেন। যদিও পিতামহী, মাতা আর পিতার স্নেহ-ছায়ায় শওকত ওসমানের শৈশব অতিবাহিত হয় সবলসিংহপুরে, শুধু এই রক্তের সম্পর্কেই ধন্য হননি লেখক; পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজনদের সাহচর্য ও স্নেহ-লালিত্যে তিনি পেয়েছিলেন জীবনচলার অনুপ্রেরণা। জন্মভূমির স্মৃতিচিহ্ন নিয়ে পাড়া-প্রতিবেশীদের প্রতি গভীর মমতার চিহ্ন-স্বরূপ লিখেছেন *স্বজন স্বগ্রাম* গ্রন্থটি।

শওকত ওসমানের শিক্ষাজীবন শুরু হয়েছিল নিজ গ্রামের মক্তবে মাত্র পাঁচ বছর বয়সে ১৯২২-২৩ সালে। মুসলমান অধ্যুষিত পল্লি অঞ্চলে ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি বরাবর জোর দেয়া হত। এ সময় তাঁর শিক্ষক ছিলেন মৌলভী আইনুদ্দিন। এ বাল্য শিক্ষকের কথা অতীব শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে লেখক বলেছেন :

> বিভিন্ন বয়সে বিভিন্ন জন আমার ইমাম। মক্তবে ছিলেন মৌলভী আইনুদ্দিন। তিনি খুলনা জেলার অধিবাসী ছিলেন। তাঁর কাছেই আমার হাতেখড়ি। তাঁর স্নেহ আমাকে লেখাপড়ার দিকে আকৃষ্ট করেছিল। বছর দেড়েক পরে হঠাৎ তিনি চলে গেলেন। তাঁর স্মৃতি আমাকে বহুদিন আবিষ্ট রেখেছিল।[৮]

আইনুদ্দিন সাহেবের পর শওকত ওসমান সবলসিংহপুর গ্রামেরই কাজী পাড়ার মক্তব ছেড়ে মোহাম্মদ আলি নামক একজন শিক্ষকের নিকট প্রাইভেট পড়তেন। এরপর নিজ গ্রাম থেকে মাইল তিনেক দূরে 'নন্দনপুর রূপচাঁদ গুপ্ত একাডেমি' নামক হাই স্কুলে ভর্তি হন। এখানে তিনি ভর্তি হয়েছিলেন তদানীন্তন শিশুশ্রেণী ক্লাস 'সেভেনথ-এ'তে। এরপর নিজ গ্রামে মাদ্রাসর প্রতিষ্ঠিত হলে সেখানে তিনি ভর্তি হন। গ্রামের মাদ্রাসা সম্পর্কে তাঁর ভাষ্য:

> গ্রামে শিক্ষা নিকেতন না থাকলে আমার বিদ্যাভ্যাস কোথায় শেষ হত। কল্পনার ব্যাপার। হয়ত লেখাপড়াই হত না।[৯]

দারিদ্র্যের সঙ্গে সদা সংগ্রাম করতে হয়েছে বলেই লেখক শওকত ওসমান এহেন মন্তব্য করেছেন। বাড়িতে থেকে খরচ বাঁচিয়ে প্রাথমিক জ্ঞান অর্জনের ভিত্তি এখান থেকেই তাঁকে রপ্ত করতে হয়েছিল।

১৯২৬ থেকে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত গ্রামের মাদ্রাসাতেই তিনি পড়াশোনা করেন। তারপর ভর্তি হন কলকাতার মাদ্রাসা-এ-আলিয়ায় ১৯২৯-'৩০-এ। এ প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারের অসংখ্য পুস্তক ছিল লেখকের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু। এখানে থেকে তিনি অধ্যয়ন করেছেন ইংরেজ লেখক চার্লস ডিকেন্স (১৮১২-১৮৭০)-এর *এ টেল অব টু সিটিজ*, রুশ গল্প এবং উপন্যাস– "তবে বিশেষ পাঠ্য ছিল কবিতা, কবিতা পড়াই ছিল নেশা।"[১০] তিনি বিশেষ করে অধ্যয়ন করতেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতাসমূহ। "গ্রন্থাগারের বৈচিত্র্যধর্মী

Dhaka University Institutional Repository

অসংখ্য গ্রন্থ এবং কবিতা পড়ার নেশা ধীরে ধীরে তাঁর মধ্যে লেখকসত্তার ভিত গড়ে তোলে। কবিতার প্রতি শওকত ওসমানের আগ্রহ দেখে তাঁর এক সহপাঠী আবু নসর মহাম্মদ তবীর তাঁকে বারবার উৎসাহ যুগিয়েছেন এবং কবিতা লেখার তাগিদ দিয়েছেন। শওকত ওসমানের মানস জগতে লেখালেখির জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা থাকলেও তা এ পর্যন্ত প্রকাশের পথ খুঁজে পায়নি– কিন্তু অবশেষে বন্ধুর হৃদয়ভেদী উষ্ণ উৎসাহে সাহিত্যের ভুবনে প্রবেশ করতে তাঁর আর কোনো দ্বিধা-বাধা বা পিছুটান থাকে না।"[১১] পরবর্তীকালে তিনি স্কুল ম্যাগাজিনে কবিতা প্রকাশ করে বন্ধুমহলে 'কবিসাব' উপাধি লাভ করেন। শওকত ওসমানের স্বীকারোক্তি :

> সহপাঠীদের মধ্যে কয়েকজন আমার আজীবন সহচর হয়ে আছে। কোনো না কোনো ভাবে তারা আমাকে মানুষ হয়ে গড়ে ওঠার উপাদান যুগিয়েছে। তাঁদের আমি চিরকাল স্মরণ করব। আবু নসর মহাম্মদ তবীর অবদান আদৌ ভুলে যাওয়া দায়। নিজে আর সাহিত্যের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করেনি, কিন্তু আলিবাবার মতো রত্নগুহার খবর সে আমাকে দিয়েছিল। আমার সাহিত্য সাধনা কবিতা দিয়েই শুরু হয়। আজ আমি নিছক গদ্য লেখক রূপে পরিচিত।[১২]

কবিতা দিয়ে শওকত ওসমান সাহিত্য সাধনা আরম্ভ করলেও পরবর্তী সময়ে প্রতিশ্রুতিশীল কথাসাহিত্যিক হিসেবে সমধিক পরিচিতি লাভ করেন। তাঁর প্রথম গল্প প্রকাশিত হয় স্কুল ম্যাগাজিনে। "১৯৩০ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত শওকত ওসমান কলকাতার বিভিন্ন স্থানে অতিবাহিত করেছেন। তিনি কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে এবং কলকাতার কমার্স কলেজে পেশাগত সময়ে ধর্মতলা, ২/১ই তাঁতিবাগান লেন, ধুকাড়িয়া বাগান, সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ হোস্টেল, বোর্ডিং হাউজ ও বাংলাভাগের সময় অবস্থান করেন বিখ্যাত বেকার হোস্টেলে। বৈচিত্র্যপূর্ণ অবস্থানের কারণে তিনি বিচিত্র ঘটনার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেন– যা পরবর্তীকালে তাঁর সাহিত্য রচনার উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।"[১৩] কলকাতার মাদ্রাসা-এ-আলিয়ার ওল্ডস্কিম ছেড়ে শওকত ওসমান নিজের ইচ্ছায় এ্যাংলো পার্সিয়ান বিভাগে স্থানান্তরিত হয়েছিলেন। এখান থেকেই ১৯৩৩ সালে তিনি ম্যাট্রিক পাশ করেন।

১৯৩৪ সালে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে ভর্তি হলে লেখকের মানস জগতে বিশাল পরিবর্তন সাধিত হয়। সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের পূজনীয় কয়েকজন শিক্ষকের সাহচর্য এবং তাদের যৌক্তিক ব্যাখ্যা গল্পকারের মন তথা অন্তর্জগৎকে অসাম্প্রদায়িক চিন্তায় আলোকিত করেছিল। এদের মধ্যে বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবং ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক ফাদার ব্রায়ান অন্যতম ছিলেন। সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে অধ্যয়নকালে শওকত ওসমান কলকাতার তাঁতিবাগান এলাকায় এক আত্মীয়ের বাসায় অবস্থান করতেন। সে পাড়ার হিন্দু-মুসলমানের সহাবস্থান তাঁর অসাম্প্রদায়িক মানস গঠনে আরও কার্যকর ভূমিকা

Dhaka University Institutional Repository

পালন করে– "পাড়ায় পাশাপাশি হিন্দু-মুসলমান পরিবার। মেলা-মেশার এই আবহাওয়া আমাদের বড় নিশ্চিন্তে রেখেছিল।"[১৪]

শওকত ওসমান জীবনাচরণ ও সংস্কৃতিচর্চার মধ্যেই খুঁজেছেন জীবনের গভীর সত্যকে এবং উপলব্ধি করেছেন মানুষের শাশ্বত কল্যাণকর দিককে, তাই তিনি সহজেই স্ব-পরিবেশ থেকেই আহরণ করেছেন মানবতাবাদী রূপকে। বলা বাহুল্য, স্ব-গ্রামের অসাম্প্রদায়িক পরিবেশ, সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষকদের মানবতাবাদী যৌক্তিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এবং কলকাতায় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নকালে অসাম্প্রদায়িক সহাবস্থান–এ ত্রিমাত্রিক অভিজ্ঞতা লেখকের মুক্ত জীবনবোধে উত্তরণে যুগপৎ সহায়ক ভূমিকা রেখেছে।

সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ ছিল লেখকের কাছে এক নতুন মহাদেশ আবিষ্কার। কত বড় তার জ্ঞানের ল্যান্ডস্কেপ। এ প্রতিষ্ঠানের শ্রেণিকক্ষ এবং গ্রন্থাগার ছিল শওকত ওসমানের কাছে সমান আকর্ষণীয়। বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবং ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক ফাদার ব্রায়ান তাঁকে সাহিত্যের প্রতি আগ্রহী করে তোলেন এবং এখান থেকেই তিনি সাহিত্য রচনার উৎসাহ অনুভব করেন। সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের সাহিত্যিক পরিমণ্ডল এবং শিক্ষকদের সান্নিধ্য লেখকের সঞ্চরণশীল মনে লেখার ভুবনে অনুপ্রবেশের জন্য সঞ্জীবনীশক্তির উৎস খুলে দেয়। সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে ১৯৩৬ সালে ইন্টারমেডিয়েট পাশ করেন। অতঃপর এই কলেজেই অর্থনীতিতে অনার্সে ভর্তি হন। কিন্তু অনার্স ছাড়াই ১৯৩৮ সালে তিনি বি.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৪১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি বাংলায় দ্বিতীয় শ্রেণী পেয়ে এম.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

যখন তিনি এম.এ. পড়েন তখন থেকেই কলকাতার সাহিত্য মহলে তাঁর অবারিত যাতায়াত আরম্ভ হয়। "১৯৪০-১৯৪১ সালে সাহিত্যিক আবু রুশ্‌দ্‌-এর পৈতৃক নিবাস কলকাতার বালিগঞ্জ এলাকায় কর্ণেল বিশ্বাস রোডের বৈঠকখানায় 'কালচারাল মজলিস' নামে নিয়মিত একটি সাহিত্য সভা অনুষ্ঠিত হত। শওকত ওসমান এ আসরের একজন নিয়মিত সদস্য ছিলেন। আবু রুশ্‌দের সাংগঠনিক তৎপরতায় কাজী নজরুল ইসলাম 'কালচারাল মজলিস'-এ উপস্থিত হয়ে 'রসলোক' বিষয়ে বক্তৃতা দেন।"[১৫] বক্তৃতায় বিদ্রোহী কবি বলেন– "শিল্পী জগতের সকল অলিগলির ভেতর জড়িয়ে থাকবেন। কিন্তু তাঁর শিল্পের ধর্মে তাঁকে জাগতিকতার ঊর্ধ্বে উঠতে হবে। এবং সেখান থেকেই তিনি আবার মানুষের কাছে নেমে আসবেন। নদী

Dhaka University Institutional Repository

সমুদ্রের জল পৃথিবীর মাটিসংলগ্ন। কিন্তু এই জল মেঘরূপে আকাশচারী হয়। তারপর নেমে আসে বর্ষণ-ধারায় এবং পৃথিবী শস্যশ্যামল হয়ে ওঠে।"[১৬]

বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে অনেক শিক্ষকের সাহচর্যে শওকত ওসমান তাঁর জ্ঞানের দীপ্তিকে প্রসারিত করেছেন। তাঁদের মধ্যে ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কথা তিনি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেছেন। উত্তরকালে *নিঃসঙ্গ নির্মাণ* (১৯৮৫) গ্রন্থে তিনি "মাষ্টার মশাই: সু.কু.চ." শিরোনামে স্মৃতিকথা লিখেছেন।[১৭] আসলে কোনো শ্রদ্ধেয় শিক্ষকের ঋণ লেখক তাঁর স্মৃতি থেকে বিলুপ্ত হতে দেননি। বাল্যকালে মৌলভী আব্দুল মজিদ নামক একজন শিক্ষকের কাছে তিনি আরবি পড়েছিলেন। সে কথাও তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন।[১৮]

অধ্যয়নই যে ছাত্রদের তপস্যা এবং একমাত্র পেশা তা ছাত্রজীবনে শিক্ষার্থী শওকত ওসমানের কাছে সর্বৈব প্রযোজ্য ছিল না। কারণ তাঁর কর্মজীবন মূলত ছাত্রজীবনেই শুরু হয়েছিল। "দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে আত্মপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পড়াশোনা করতে গিয়ে ছাত্রজীবনেই তাঁকে নানারকম কাজ করতে হয়েছে।"[১৯] "মাদ্রাসায় পড়ার সময়ও টিউশনি করেছেন। সপ্তম-অষ্টম শ্রেণীতে পড়ার সময় জায়গীর থেকেছেন।"[২০] সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে পড়ার সময়েও টিউশনি করেছেন। এ সময় বাড়িতে তাঁকে রীতিমত টাকা পাঠাতে হত। *স্বজন স্বগ্রাম* গ্রন্থে কলেজ জীবনে টিউশনি করার স্মৃতি লিখেছেন।[২১]

আই.এ. পরীক্ষার পর দেড় মাস কেরানির চাকরি করেছিলেন কলকাতা কর্পোরেশনে।[২২] দেশ বিভাগের পর ১৯৪৭ সালের শেষের দিকে তিনি চট্টগ্রামের সরকারী কমার্স কলেজে যোগদান করেন। সেখান থেকে ১৯৫৮ সালে ঢাকা কলেজে স্থানান্তরিত হন। ১৯৭০ সালে সহকারী অধ্যাপক হন। ঢাকা কলেজ থেকেই ১৯৭২ সালের ১লা এপ্রিল শওকত ওসমান অধ্যাপনা থেকে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করেন।[২৩]

এম.এ. পড়ার সময় শওকত ওসমান বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। ১৯৩৮ সালের ৬ই মে হাওড়া জেলার কওসার আলির কন্যা সালেহা খাতুনের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। তিনি পাঁচ ছেলে এবং এক কন্যার জনক।[২৪] পাঁচ ছেলের মধ্যে তুরহান ওসমান ১৯৬৪ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারী মৃত্যুবরণ করেন। শওকত ওসমান সন্তান হারানোর বেদনা কবিতায় ধারণ করেছেন :

অপরাহ্ন বেলা আসে পড়ে
স্কুলের ছেলে ফেরে ঘরে

Dhaka University Institutional Repository

স্কুল থেকে - পথে কলস্বর
রিকসা, বাস, ট্রাকের ঘর্ঘর
হৈ চৈ ডাক প্রাত্যহিকতার
চোখে শুধু কাঁটা প্রতীক্ষার
অপরাহ্ন বেলা আসে পড়ে
সকলের ছেলে ফেরে ঘরে।[২৫]

শওকত ওসমান একজন সব্যসাচী লেখক, মূলত কথাসাহিত্যিক হলেও তাঁর হৃদয় কবিত্ব বর্জিত নয়। সাহিত্যের বিচিত্র শাখায় বিচরণ করে শওকত ওসমান নিজেই পরিণত হয়েছেন একটি প্রতিষ্ঠানে। শিল্পী শওকত ওসমানের লেখা শুরু হয়েছিল কলকাতা মাদ্রাসা-এ-আলিয়াতে অধ্যয়নকালে। এই মাদ্রাসার ইংরেজী বিভাগের ম্যাগাজিনে ১৯৩২ সালে তাঁর প্রথম লেখা গল্প প্রকাশিত হয়।[২৬] এখানে তাঁর প্রথম কবিতাও ছাপা হয়েছিল। তাঁর কবিতা লেখা সম্পর্কে অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান বলেছেন:

> শওকত ওসমান এক সময় কবিতা লিখত। বাংলাদেশের প্রকৃতি এবং ঋতুচক্রের আবর্তের মধ্যে মানুষকে স্থাপিত করে কয়েকটি মনোরম কবিতা সে লিখেছিল। এরপর কবিতার ধারাচক্রের মধ্যে যদিও সে আর রইল না, কিন্তু কবিতার একজন সচেতন পাঠক হিসেবে সবসময় আমি তাঁকে পেয়েছি।[২৭]

"দেশবিভাগের পূর্ব পর্যন্ত পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় শওকত ওসমান লেখালেখি করেছেন। এগুলোর মধ্যে যুগান্তর, আনন্দবাজার, অমৃতবাজার, আজাদ, হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড, সওগাত, কালান্তর, চতুরঙ্গ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।"[২৮] শওকত ওসমানের প্রথম গ্রন্থ *ওটেন সাহেবের বাংলো* কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। এরপর ১৯৪৫ সালে তাঁর একটি নাটক *তস্কর ও লস্কর* কলকাতা অবস্থানকালে লিখিত হয়, যা পরে প্রকাশিত হয়েছিল। দেশ বিভাগের পর মূলত ঢাকা থেকেই শওকত ওসমানের সাহিত্যের সৃষ্টিসম্ভার গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হতে থাকে।

বিভাগোত্তর কালের প্রথম গল্পের বই *পিঁজরাপোল* (১৯৫১)। এরপর প্রকাশিত হয় *জুনু আপা ও অন্যান্য গল্প* (১৯৫১), *সাবেক কাহিনী* (১৯৫৩), *প্রস্তর ফলক* (১৯৬৪), *উভশৃঙ্গ* (১৯৬৮), *নেত্রপথ* (১৯৬৮), *উপলক্ষ্য* (১৯৬৫), *শ্রেষ্ঠগল্প* (১৯৭৪), *জন্ম যদি তব বঙ্গে* (১৯৭৫), *নির্বাচিত গল্প* (১৯৮৪), *মনিব ও তাহার কুকুর* (১৯৮৬), *এবং তিন মির্জা* (১৯৮৬), *বিগত কালের গল্প* (১৯৮৭), *পুরাতন খঞ্জর* (১৯৮৭), *ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী* (১৯৯০), *হন্তারক* (১৯৯১), *রাজপুরুষ* (১৯৯৪) প্রভৃতি।

Dhaka University Institutional Repository

শওকত ওসমানের কথাসাহিত্য ছোটগল্পের সাথে উপন্যাস যৌথভাবেই সমৃদ্ধ হয়েছে। ১৯৬১ সালে তাঁর প্রথম উপন্যাস *জননী* গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এরপর থেকে উপন্যাস রচনায় তাঁর স্বাচ্ছন্দ্য অব্যাহত থাকে। তাঁর অন্যান্য উপন্যাস হচ্ছে : *ক্রীতদাসের হাসি* (১৯৬২), *সমাগম* (১৯৬৮), *চৌরসন্ধি* (১৯৬৬), *রাজা উপাখ্যান* (১৯৭০), *জাহান্নম হইতে বিদায়* (১৯৭১), *দুই সৈনিক* (১৯৭৩), *নেকড়ে অরণ্য* (১৯৭৩), *জলাংগী* (১৯৭৪), *পতঙ্গপিঞ্জর* (১৯৮৩), *আর্তনাদ* (১৯৮৫), *রাজসাক্ষী ও পিতৃপুরুষের পাপ* (১৯৮৬)। গল্প ও উপন্যাসের পর শওকত ওসমানের সৃজনশীল সাহিত্যের অন্যতম কীর্তি হচ্ছে নাটক। এক সময় তাঁর রচিত নাটক খুব জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। তাঁর প্রকাশিত নাটকগুলো হচ্ছে : *তস্কর ও লস্কর* (১৯৪৮), *আমলার মামলা* (১৯৪৯), *কাঁকরমণি* (১৯৪৯), *বাগদাদের কবি* (১৯৫২), *এতিমখানা* (১৯৫৫), *নষ্ট তান অষ্ট ভান* (১৯৮৬), *জন্ম জন্মান্তর* (১৯৮৬), *মলিয়ার : পাঁচটি নাটক* (১৯৬৫) প্রভৃতি।

প্রবন্ধ সাহিত্যেও শওকত ওসমান বিশেষ ব্যুৎপত্তির পরিচয় দিয়েছেন। মানুষের কল্যাণের জন্য প্রয়োজনীয় যে কোনো বিষয়ে তিনি প্রবন্ধ রচনা করেছেন। সমাজ, অর্থনীতি, সাহিত্য, ভাষাতত্ত্ব, সংস্কৃতি, জাতি ও জাতীয়তা নানা বিষয় তাঁর প্রবন্ধের অঙ্গনে বাঙময় হয়ে উঠেছে। তাঁর প্রবন্ধগুলো হচ্ছে : *সমুদ্র নদী সমর্পিত* (১৯৭৩), *ভাব ভাষা ভাবনা* (১৯৭৪), *সংস্কৃতির চড়াই উৎরাই* (১৯৮৫), *ইতিহাসে বিস্তারিত* (১৯৮৫), *নিঃসঙ্গ নির্মাণ* (১৯৮৬), *মুসলিম মানসের রূপান্তর* (১৯৮৬), *পূর্ণ স্বাধীনতা চূর্ণ স্বাধীনতা* (১৯৯০), *উপদেশ রূপদেশ* (১৯৯২), *মন্তব্য মৃগয়া* (১৯৯৪), *মৌলবাদের আগুন নিয়ে খেলা* (১৯৯৫), *অস্তিত্বের সঙ্গে সংলাপ* (১৯৯৫), প্রভৃতি। তাঁর রম্য কথাভিত্তিক পাঁচমিশেলী বই *নেত্রপথ* (১৯৬৮) এবং মিশ্ররচনার বই *হপ্তম পঞ্চম* (১৯৫৮)।

গ্রন্থ রচনার পাশাপাশি গ্রন্থ সম্পাদনায়ও তাঁর বিশেষত্ব লক্ষণীয়। শওকত ওসমান সম্পাদিত গ্রন্থগুলো হচ্ছে : *হাবিবুল্লাহ বাহার* (আনোয়ারা বাহার চৌধুরী সহযোগে, ১৯৭০), *ফজলুল হকের গল্প* (১৯৮৩)। শওকত ওসমানের গ্রন্থ ইংরেজীসহ অন্যান্য ভাষাতেও অনূদিত হয়েছে। *ক্রীতদাসের হাসির* ইংরেজী অনুবাদ *A Slave Laughs* (১৯৭৬), *রাজা উপাখ্যানের* ইংরেজী অনুবাদ *The King and the Serpents* (১৯৮৫)। তাঁর *জননী* উপন্যাসের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে ইংল্যান্ড থেকে *Janani* (১৯৯৩) নামে। *রাজসাক্ষীর* অনুবাদ *The state witness* প্রকাশিত হয় একই স্থান থেকে। এছাড়া তাঁর স্মৃতিকথাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যেমন : *স্বজন স্বগ্রাম* (১৯৮৬), *কালরাত্রি খণ্ডচিত্র* (১৯৮৬), *১৯৭১ : স্মৃতিখণ্ড মুজিবনগর* (২০০৯), *উত্তরপর্ব মুজিবনগর* (২০০৯) প্রভৃতি।

Dhaka University Institutional Repository

অন্যান্য রচনার মতো অনুবাদ কর্ম এবং শিশু সাহিত্য রচনাতেও শওকত ওসমান খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর শিশুতোষ গ্রন্থগুলো হচ্ছে : *ওটেন সাহেবের বাংলো* (১৯৪৪), *মস্কুই টোফেন* (১৯৫৭), *তাঁরা দুইজন* (১৯৫৮), *ডিগবাজী*, *প্রাইজ ও অন্যান্য গল্প* (১৯৬৯), *ছোটদের নানাগল্প* (১৩৭৬), *ক্ষুদে সোসালিস্ট* (১৯৭৩), *পঞ্চসঙ্গী* (১৯৭৫), *ছোটদের কথা রচনার কথা* (১৯৮৩), *জুজুগগা* (১৯৮৮) প্রভৃতি।

সাহিত্য রচনার মাধ্যমে সমকালীন সমাজে অনেকের মতো শওকত ওসমানও নন্দিত হয়েছেন। সাহিত্য স্বীকৃতি স্বরূপ পেয়েছেন শ্রদ্ধা, সম্মান ও পুরস্কার। ১৯৬২ সালে তিনি ছোটগল্পের জন্য বাংলা একাডেমি পুরস্কার পান। এ বছরেই *ক্রীতদাসের হাসি* উপন্যাসটির জন্য পান আদমজি পুরস্কার। ১৯৬৭ সালে পাকিস্তান সরকারের পুরস্কার পান। একুশের পদক পেয়েছেন ১৯৮৩ সালে।

বিভাগ পূর্বকালে শওকত ওসমান বহু সাহিত্যিক কবি-বন্ধুদের সাহচর্য লাভ করেন। তাঁর বন্ধু ছিলেন আবু জাফর শামসুদ্দিন (১৯১১-১৯৮৮), ফজলুল হক (১৯১৬-১৯৪৯), আবুল হোসেন (১৯২২-২০১৪), সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ (১৯২২-১৯৭১), সরদার জয়েন উদ্‌দীন (১৯২০-১৯৮৬), আলাউদ্দীন আল আজাদ (১৯৩২-২০০৯), আবুল কালাম শামসুদ্দীন (১৮৯৭-১৯৭৮), গোলাম কুদ্দুস (১৯১৭-২০০৬) প্রমুখ। এঁদের মধ্যে অনেকের সাথে লেখকের হৃদ্যতা ও ঘনিষ্ঠতা জন্মেছিল। অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান তাঁর *সতত স্বাগত* (১৯৮৩) গ্রন্থে তাঁর লেখক বন্ধু শওকত ওসমান সম্পর্কে একটি মনোজ্ঞ আলোচনা লিপিবদ্ধ করেছেন। এখানে ব্যক্তি শওকত ওসমান থেকে শিল্পী শওকত ওসমানের একটি অন্তর্ভেদী নিরীক্ষণ রয়েছে। কলকাতা জীবনের চাকরি আর সাহিত্য পথের যাত্রী হিসেবে বহু স্মৃতিময় ঘটনার সাথে উভয়ের সন্নিপাত ঘটেছে। তাঁর ভাষ্য :

> যখন কলকাতায় ছিলাম আমরা একত্রে পথ হেঁটেছি। এসপ্লানেড ধর্মতলা হয়ে ওয়েলেসলি স্ট্রিট (বর্তমানে রফি আহমদ কিদওয়াই স্ট্রিট) এবং তারপর আমার সংকীর্ণ গুহায়। মনে পড়ে শওকতের দৃষ্টিতে সাধারণ মানুষগুলো অত্যন্ত শাণিত ভাবে ধরা পড়তো।[২৯]

প্রখ্যাত সমালোচক আবু সয়ীদ আইয়ুবের (১৯০৬-১৯৮২) সাহচর্য লাভে সমর্থ হয়েছিলেন কলকাতার চাকরি ও সাহিত্য জীবনকালে। সেই সময়ের প্রথিতযশা কবি, সাহিত্যিকদের সঙ্গে যে আবু সয়ীদ আইয়ুবের বাড়িতেই তাঁর পরিচয় হয়েছিল সে সম্পর্কে কথাশিল্পী শওকত ওসমান বলেছেন :

> ফজলুল হক (গল্পকার) ছিলেন আমার চেয়ে এক বছরের সিনিয়র, প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র। আমি তখন সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে। তাঁর সঙ্গে আমার যোগাযোগ সম্প্রতি সদ্য লোকান্তরিত এক মনীষী মারফত, যিনি ছিলেন

Dhaka University Institutional Repository

নেকলেসের মধ্যমনি আবু সয়ীদ আইয়ুব। আইয়ুব সাহেব আমার চেয়ে দশ, ফজলুল হকের চেয়ে ন'বছরের বড়। কিন্তু বয়োঃবৃদ্ধির সঙ্গে আমাদের সামাজিক লৌকিকতা বন্ধন ঘুচে যেতে লাগল। ... ফজলুল হকের সহপাঠি ছিলেন আইয়ুবের এক ভাগিনা হাবিবুর রহমান। সেই সূত্রে ফজলুল হকের ওদের পারিবারিক মঞ্চে প্রবেশ। আমি পৌঁছাই আকস্মিকভাবে। অথবা বলা যায়, স্বতঃই কলিকাতা তালতলা এলাকার ওয়েলেসলি পার্কের (বর্তমানে হাজী মহসিন পার্ক) বৈকালিক ভ্রমণের সুযোগে, আইয়ুব সাহেবও যেখানে নিয়মিত বায়ুসেবী।[৩০]

প্রখ্যাত কবি, সমালোচক, রাজনীতিক হুমায়ুন কবিরের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা বেড়েছিল কলকাতা জীবনে। বয়োজ্যেষ্ঠ হলেও কবির সাহেব তাঁকে যে প্রশ্রয় দিয়েছিলেন তার মধ্যে নিহিত ছিল ভবিষ্যৎ শওকত ওসমানের এক অলিখিত সম্ভাবনা। এ সম্পর্কে তিনি বলেছেন :

যৌবনে যখন ছাত্র এবং কালাপাহাড় তখন চতুরঙ্গ পত্রিকায় আমার প্রবেশাধিকার ঘটে। বয়োজ্যেষ্ঠ কবির সাহেব কিন্তু তারুণ্যের নষ্টামির প্রশ্রয় দিতে এতটুকু সঙ্কোচ দেখান নি। তিনি আমাকে যে উৎসাহ প্রেরণা দিয়েছিলেন, আজ তা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি। এ সময় কবিরকে খুব কাছে থেকে দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল।[৩১]

লেখালেখির সুবাদে মোহাম্মদী, সওগাত-গোষ্ঠীর সঙ্গে শওকত ওসমানের নিবিড়তা লক্ষ করা যায়। শওকত ওসমানের গল্পের আসরে আবির্ভাব সম্পর্কে 'দৈনিক আজাদের' প্রধান সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দিন (১৮৯৭-১৯৭৮) বলেছেন :

শওকত ওসমান প্রথম দিকে কবিতা লিখতেন এবং সেসব প্রধানতঃ বাহার সাহেবের ত্রৈমাসিক 'বুলবুলে' প্রকাশিত হত। মাসিক 'মোহাম্মদী'তে আজিজুর রহমান নাম দিয়ে তাঁর কয়েকটি লেখা প্রকাশিত হয়। ...কিন্তু তিনি যে মূলত গল্প লেখক আমি বুঝতে পেরেছিলাম তাঁর একটি প্রবন্ধ দেখে। প্রবন্ধটি ছিল একটি ভ্রমণ বৃত্তান্ত। তাতে তাঁর তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার যে পরিচয় আমি পেয়েছিলাম তাতে আমার স্থির ধারণা হয়েছিল যে, কালে এ লেখক একজন শক্তিশালী গল্প লেখক হয়ে উঠবেন।[৩২]

কলকাতার জীবনের বিশেষ আর এক পথিকৃত মনীষীর সাহচর্য শওকত ওসমানের সাহিত্য চর্চার পথে অনুকূল আবহ তৈরি করেছিল। তিনি হচ্ছেন তৎকালীন 'বুলবুল'[৩৩] সম্পাদক হবীবুল্লাহ্ বাহার। তাঁর সঙ্গে পরিচিত হবার পর থেকে শওকত ওসমানের ভেতরে অনুপ্রেরণা ও লেখার প্রস্রবণ উৎসারিত হয়ে অনেক সাহিত্যিক বন্ধুদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা জন্মে। এ সম্পর্কে স্বয়ং লেখক বলেছেন:

আমার সাহিত্য জীবনের বিশেষ অধ্যায় হবীবুল্লাহ্ বাহারের সঙ্গে জড়িত। বিশেষ কেন বরং বলা যায় জীবনের বিকাশের জন্য যে আবহাওয়াটুকু প্রয়োজন, যাছাড়া হয়তো তার বিনাশই ঘটে বা বিকাশ বাধা পায় এমন সংকট সংকুল মুহূর্তের দিশারি অধ্যায়।[৩৪]

Dhaka University Institutional Repository

১৯৩৮ সালে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের বি. এ. এর ছাত্র থাকাকালীন সময়ে শওকত ওসমানের পরিচয় হয় বাহারের সঙ্গে। তখন 'বুলবুল' প্রকাশিত হত কলকাতা বেলেপুকুর অঞ্চলের ২৩নং ক্রিমেটোরিয়াম স্ট্রিট থেকে। সুধী মহলে 'বুলবুল' প্রশংসিত হয়। প্রমথ চৌধুরী, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অন্নদাশঙ্কর রায় 'বুলবুলে'র আসরে জমায়েত ছিলেন। শওকত ওসমান লিখেছেন :

> তখন আমি নেপথ্য সাহিত্য সেবী। অর্থাৎ লুকিয়ে লুকিয়ে লেখার অভ্যেস। আর লেখা গদ্য নয়, যার সঙ্গে আজ অনেকে পরিচিত। আমি তখন ঈশ্বর গুপ্ত না হয়েও গুপ্ত কবি।[৩৫]

বুলবুল পত্রিকার সূত্রে শুধু সম্পাদকের সাথেই তাঁর হৃদ্যতা জন্মেনি, এখানে অনেক সাহিত্যিক বন্ধুদের সান্নিধ্য তিনি লাভ করেছিলেন :

> উত্তরসূরী এবং সতীর্থদের সাক্ষাত ঘটল বুলবুল সম্পাদকের বাগানে। এক কথায় জীবনের পরিধি বেড়ে গেল। সাংবাদিক আবুল কালাম শামসুদ্দিন, আয়নল হক খাঁ ও অন্যান্যদের সঙ্গে এখানেই চেনা। বর্তমান স্ব-স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠ কবি আবুল হোসেন, আবু রুশদ্, গোলাম কুদ্দুস (এখন পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী), ফররুখ আহমদ, আহসান হাবীব, যাঁরা আমার সতীর্থ, নানা অর্থে সকলের সহিত সাক্ষাৎ বুলবুলে ঘটে। ... মনের নানা সমিধ ও উপকরণ আমার বুলবুলের ঘাটে সংগৃহীত।[৩৬]

'বুলবুল' সম্পাদক হবীবুল্লাহ্ বাহারের সহযোগিতায় শওকত ওসমান একবার বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন।[৩৭]

কলকাতার সাহিত্যিক জীবনের এহেন উচ্ছলতায় ভাঁটা পড়ল দেশবিভাগের ফলে। শওকত ওসমানের কর্মস্থল পরিবর্তিত হল। ১৯৪৭ সালের শেষে চট্টগ্রাম সরকারী কমার্স কলেজে যোগদানের পর তাঁর সাহিত্যিক জীবনে কিছুটা পরিবর্তন দেখা দেয়। বন্ধুদের অধিকাংশ নতুন রাজধানী শহর ঢাকায় আশ্রয় নিলেন। তিনি হয়ে পড়লেন কিছুটা বিচ্ছিন্ন। এ জন্য *জননী*'র মতো নন্দিত উপন্যাস গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে পত্রিকায় প্রকাশের ১৫/১৬ বছর পরে। চট্টগ্রাম থেকেও তাঁর *কাঁকরমণি* নাটকের দ্বিতীয় সংস্করণ ও *হপ্তম-পঞ্চম* মিশ্র রচনার বইটি প্রকাশিত হয়। চট্টগ্রামে অবস্থানকালে ফিরিঙ্গি বাজারের 'মিলন মন্দির' নামক বাসায় তাঁর বন্ধু ফজলুল হক ১৯৪৮ সালে তিন দিনের অতিথি হয়েছিলেন। লেখক শওকত ওসমান চট্টগ্রামে যাঁর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন তিনি হচ্ছেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক আবুল ফজল। আবুল ফজল শওকত ওসমান সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন। তিনি তাঁর আত্মজীবনী *রেখাচিত্রে* (১৯৬৫) এবং *লেখকের রোজনামচা* (১৯৬৯)

Dhaka University Institutional Repository

নামক গ্রন্থে শওকত ওসমান সম্পর্কে নানা মন্তব্য করেছেন। তাঁর সঙ্গে শওকত ওসমানের হৃদ্যতা প্রসঙ্গে লিখেছেন:

> শওকত ওসমান পশ্চিম বঙ্গের মানুষ। পাকিস্তান হওয়ার পর স্থায়ীভাবে এখানে চলে এসেছেন চট্টগ্রাম সরকারী বাণিজ্য কলেজের বাংলা ভাষার অধ্যাপক হয়ে, সে থেকে একটানা অনেক দিন ছিলেন চাটগাঁ। ফলে আমার সঙ্গে গড়ে ওঠে বন্ধুত্ব। ... আমাদের উত্তরসূরীদের মধ্যে যে কয়জন সাহিত্যকে মনে-প্রাণে গ্রহণ করেছেন, আর তাতে আত্মনিবিষ্ট, তাঁদের মধ্যে শওকত ওসমান অন্যতম। তাঁর প্রতিভা আর রচনার বিশিষ্টতা অনস্বীকার্য।[৩৮]

কথাশিল্পী শওকত ওসমানের সঙ্গে পরিচয়ের সুবাদেই তাঁদের মধ্যে বেশ কিছু পত্র বিনিময় হয়েছিল। লেখক শওকত ওসমানের ঢাকা আসবার পরেও এই সম্পর্ক বজায় ছিল। "১৯৪৮ সালে চট্টগ্রামে প্রতিষ্ঠিত হয় একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন 'সাংস্কৃতিক বৈঠক'। এখানে ইবনে গোলাম নবী, গোপাল বিশ্বাস, মাহবুবুল আলম চৌধুরী, কলিম শরাফী প্রমুখ গুণীজনদের সঙ্গে শওকতের হৃদ্যতা জন্মে। প্রবীণ সাহিত্যিক মাহবুবুল আলম এবং ওহীদুল আলমের সঙ্গেও শওকত ওসমানের ভাল সম্পর্ক গড়ে উঠে। চট্টগ্রামের প্রান্তিক নবনাট্য সংঘের ভাইস প্রেসিডেন্টও হয়েছিলেন শওকত ওসমান। পঞ্চাশের দশকের 'রেলওয়ে ইন্সটিটিউট' (পরে ওয়াজিউল্লাহ ইন্সটিটিউট) থেকে প্রকাশিত 'পরিচিতি' পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন শওকত ওসমান। চট্টগ্রামের জীবন, পরিবেশ ও তাঁর অবস্থান নিয়ে লেখা *স্মৃতিখণ্ড চট্টগ্রাম* একটি মনোজ্ঞ রচনা।"[৩৯]

১৯৫৮ সালে ঢাকা কলেজে বদলি হবার পর থেকে শওকত ওসমানের লেখায় নতুন চাঞ্চল্য দেখা দেয়। বলা যায় তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠতম সময় হচ্ছে ১৯৬০-এর দশক। কেবল এক দশকে তিনি যতখানি সাফল্য অর্জন করেছেন, অন্য সময় এমন সম্ভব হয়নি। এই দশকের শুরুতে ১৯৬২ সালে ছোটগল্পের স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি পেয়েছেন বাংলা একাডেমি পুরস্কার এবং এ বছরেই *ক্রীতদাসের হাসি* উপন্যাসের জন্য পেলেন আদমজি পুরস্কার। ষাটের দশকে তৎকালীন সরকারের প্রেসিডেন্ট পুরস্কারে ভূষিত হন। বলাবাহুল্য, এ দশকেই তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো প্রকাশিত হয়েছিল।

শওকত ওসমানের সাহিত্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়– জীবনমুখী সমাজসচেতন সাহিত্যিক হিসেবে অনিবার্য উপকরণরূপেই বহমান ঘটনাস্রোত তাঁর সাহিত্যে উঠে এসেছে। তাঁর সাহসী উচ্চারণ, প্রবল জীবনজিজ্ঞাসা, দার্শনিক মনোদৃষ্টি, সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ তাঁর সাহিত্যের বিষয়-বৈচিত্র্যেও বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করেছে এবং সমাজসংশ্লিষ্টতার ফলে তাঁর সাহিত্যে খুঁজে পাওয়া যায় সমাজ নির্মাণের অন্তর্নিহিত রূপ।

Dhaka University Institutional Repository

শওকত ওসমান ভ্রমণপ্রিয় মানুষ ছিলেন। ভারত ও পাকিস্তান ছাড়াও তিনি ইংল্যান্ড, তুরস্ক, ইরান, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ফ্রান্স ভ্রমণ করেছেন।[৪০] তিনি লন্ডনে গিয়েছিলেন ১৯৬৪ সালের অক্টোবর মাসের একটি স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণ কোর্সে। এ সময় তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ থাকতেন প্যারিসে। তিনি লন্ডন থেকে যান বন্ধুর সাথে দেখা করতে। প্রেসিডেন্ট পুরস্কার প্রাপ্তির পর ওয়ালীউল্লাহ্ প্যারিস থেকেই তাঁকে পত্র লিখেছিলেন।[৪১]

১৯৬৯ সালের গণ আন্দোলনের সমর্থক শওকত ওসমান একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নেন। এ সময় বাংলাদেশের হালচাল জানিয়ে সুষ্ঠু নির্বাচন করার জন্য দীর্ঘ পত্র লেখেন তৎকালীন চীনা প্রেসিডেন্ট চৌ-এন-লাইকে।[৪২] ১৯৭৫ সালে শেখ মুজিব হত্যার পর তিনি পশ্চিম বাংলায় অবস্থান নিয়েছিলেন। এখানে স্মরণীয় যে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের (১৯২০-১৯৭৫) মৃত্যু-পরবর্তীকালে তিনি নীরব প্রতিবাদ হিসেবেই স্বেচ্ছা নির্বাসনে দেশ ত্যাগ করেন। সম্ভবত এর সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল লেখকের আবেগ-অনুভূতি, নিরাপত্তার অভাব। তবে, "১৯৮১ সালে নির্বাসন থেকে ফিরে শওকত ওসমান প্রথমেই ছুটে যান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদ প্রাঙ্গণে চিরনিদ্রায় শায়িত কবি কাজী নজরুল ইসলামের সমাধিতে। সকল অসমতা, নিপীড়ন ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের স্মারক বাঙালির জাতিসত্তার চেতনা বিকাশের প্রধানতম স্থপতি কাজী কবির সমাধিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদনের মাধ্যমে নির্বাসন প্রত্যাগত শওকত ওসমান সেদিন তাঁর পরবর্তী জীবনের কর্মধারায় বিপ্লবাত্মক ইঙ্গিত করলেন।"[৪৩] বলা যায়, স্বেচ্ছা নির্বাসন থেকে প্রত্যাগমনের পরে তাঁর লেখা আরও বেশি শানিত এবং ইঙ্গিতধর্মী হয়ে ওঠে। এ-সময় তিনি তাঁর মনের পুঞ্জীভূত ব্যথা-বেদনা, ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন সাহিত্য-শিল্পের মধ্য দিয়ে। তিনি এ সময় *নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত* (১৯৮২) এবং *শেখের সম্বরা* (১৯৯২) ব্যঙ্গ কাব্য রচনার মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন অসঙ্গতিকে ফুটিয়ে তুলেছেন তির্যক ভাষায়।

ঢাকায় বসবাসকালে তিনি সিকানদার আবু জাফর সম্পাদিত 'সমকাল' পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন। জীবনে, সাহিত্যে, কর্মে ও সাধনায় তিনি একজন নিরলস সাহিত্যকর্মী। একদা কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর নিষ্ঠা ও সাধনায় প্রীত হয়ে আশীর্বাণীতে বলেছিলেন–

আছে সত্যের পূর্ণ স্বরূপ
চূর্ণিত - পরমাণুতে,
আছে দেহাতীত অজানা অরূপ
তোমারই বদ্ধ তনুতে।[৪৪]

Dhaka University Institutional Repository

কবি নজরুলের আশীর্বাণী শওকত ওসমানের জীবনে পূর্ণ সত্যের স্বরূপে বরাবরই বিকশিত হয়। বয়স যতই বেড়েছে ততই তিনি দেশ-কাল গণমনস্ক হয়ে উঠেছেন। ১৯৮০-র দশকের সামরিক আইন ও বাংলাদেশের গণতন্ত্রের বিপর্যয় তাঁকে অনেকটা বেদনাদগ্ধ করেছিল। তাঁর *পূর্ণ স্বাধীনতা চূর্ণ স্বাধীনতা* গ্রন্থে সামরিকতন্ত্রের প্রতি লেখকের বিরূপ মানসিকতার পরিচয় মেলে। ১৯৯০ সালের গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পর তিনি "সংবাদ" পত্রিকায় লেখেন, *রাষ্ট্রপতির কাছে খোলা চিঠি* শীর্ষক প্রবন্ধ।[৪৫] এখানে তাঁর নির্ভীক মনের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর প্রবন্ধকে স্বাগত জানিয়ে সাহিত্যিক মজনুনুল হক লেখেন, *শওকত ওসমান সমীপে খোলা চিঠি*।[৪৬] এমনকি ১৯৯০-র দশকে যে প্রত্যাশা ও প্রত্যয়ে গণতন্ত্রের পুনর্যাত্রা শুরু হয়, সেখানেও নানা অসঙ্গতি ও প্রতিক্রিয়াশীলতা প্রযুক্ত হয়। 'আজকের কাগজ' পত্রিকায় *শেখের সম্বরা* শীর্ষক কলামে বিদ্রূপিত ও শ্লেষাত্মক কবিতাপংক্তি রচনা করে তিনি এগুলোর প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করেছেন। এগুলি দু'খণ্ডে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে।

শিক্ষকরূপেও শওকত ওসমান সর্বাংশে অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছেন। একজন ছাত্রের চোখ দিয়ে দেখা একজন শিক্ষকের সফলতা-ব্যর্থতা, ত্রুটি-বিচ্যুতি তিনি ছাত্রজীবনেই গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। সেই অভিজ্ঞতার আলোকে এবং বাস্তবতার নিরিখেই তিনি অধ্যাপনায় দ্যুতি ছড়িয়েছেন– যা একজন শিক্ষকরূপে সাফল্যের চূড়াস্পর্শী। সুদীর্ঘ ত্রিশ বছর (১৯৪২-১৯৭২) ধরে তিনি আলোর ফেরিওয়ালার মতো শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিভিন্নমুখী জ্ঞানের আলো বিতরণ করেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, বিদ্যাভাসে অবহেলা কাউকে সমাজে কোনো উঁচু স্তরে নিয়ে যেতে পারে না। ঢাকা কলেজে শওকত ওসমানের তৎকালীন ছাত্র আখতারুজ্জামান ইলিয়াস তাঁর শিক্ষক সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন :

> কোনো বিষয়ে কথা বলার সময় তিনি আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাপন থেকে অজস্র দৃষ্টান্ত দিতেন। তিনিই একদিন ক্লাসে এবং সাহিত্যকর্মে আমাদের সমাজতান্ত্রিক সমাজের অপরিহার্যতার কথা বলেছেন খুব বিশ্বাসের সঙ্গে।– তবে তিনি যাই বলুন না কেন, জোর করে ছাত্রদের উপর চাপিয়ে দেওয়ার প্রবণতা তাঁর একেবারেই ছিল না। ... কিন্তু ক্লাসে নানা প্রসঙ্গের অবতারণা করে ছাত্রদের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি করার ক্ষমতা তাঁর অসাধারণ। তাঁর ব্যক্তিত্বে এমন শক্তি ছিলো যে তাই দিয়ে ছাত্রদের ওপর প্রভাব ফেলতে পারতেন।... ছাত্রের কৃতিত্বে তিনি সব সময়েই আনন্দিত, তাঁর ছাত্রদের কেউ যদি কোনোদিন তাঁর চেয়ে বেশি কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারে তো, আমি নিশ্চিত, তিনি সবচেয়ে বেশি খুশি হবেন। কৃতী ছাত্রদের নিয়ে এরকম গর্ববোধ করতে-এরকম উচ্ছ্বসিত হতে পারেন ক'জন শিক্ষক?[৪৭]

উপরিউক্ত মন্তব্য থেকে স্পষ্ট যে, শওকত ওসমান শুধু প্রথাগত শিক্ষা পদ্ধতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেননি, তিনি শিক্ষাকে ব্যবহার করেছিলেন বহুমুখী জ্ঞানের আধার হিসেবে। শওকত ওসমান শিক্ষকের আসনে

Dhaka University Institutional Repository

উপবিষ্ট হয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে শুধু পুথিগত বিদ্যা আত্মস্থ করার শিক্ষা দেননি। তিনি জীবন-বাস্তব থেকে ছেকে আনা অজস্র ঘটনা-অভিজ্ঞতার সমবায়িত রূপের মধ্য দিয়ে শিক্ষার আলো ছড়িয়েছেন শিক্ষার্থীদের মাঝে।

শওকত ওসমানের লেখার গতি-প্রকৃতি দেশকালের পরিবর্তনের ধারার সঙ্গে অঙ্গীভূত। তাঁর জন্মের বছর থেকে আরম্ভ করে তাঁর সাহিত্যিক জীবনের শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিমণ্ডলে বেশ কিছু পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। ভারতবর্ষে ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলন চলার মধ্যেই, ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আরম্ভ হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। এ সময় বিশ্বরাজনীতি এবং দেশীয় রাজনীতি এক বিক্ষুব্ধকাল অতিক্রম করছিল। ফলে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক পরিবর্তন ঘটল ব্যাপকভাবে। ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ লাহোর প্রস্তাব পাস এবং স্বতন্ত্র আবাসভূমির জন্য হিন্দু-মুসলিমের বিরোধ আরো তীব্র আকার ধারণ করে, ১৯৪১ সালে ভারতবর্ষে জাপানি আক্রমণ, ১৯৪২ সালের ৮ আগস্ট মহাত্মাগান্ধীর নেতৃত্বে আরম্ভ হয় 'ভারত ছাড়' (Quit India Movement) আন্দোলন, যা আগস্ট আন্দোলন নামে পরিচিত, ১৯৪৩ সালে দুর্ভিক্ষ, ১৯৪৬ সালে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক সহিংস বিরোধ সংঘটিত হয়, 'দ্বি-জাতি তত্ত্বে'র (Two Nations Theory) উপর ভিত্তি করে হিন্দু-মুসলিমের পৃথক আবাসভূমি প্রতিষ্ঠা (১৯৪৭), রাষ্ট্রভাষা নিয়ে ষড়যন্ত্র (১৯৪৮-১৯৫২), বাংলাভাগ-পরবর্তীকালে পূর্ব বাংলায় পাকিস্তানি শোষকদের নতুন শোষণ-পীড়ননীতি, যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন (১৯৫৪), ১৯৫৮ সালের সামরিক শাসন ও পাকিস্তানের সংসদীয় গণতন্ত্রের অবসান, ১৯৬২-এর ছাত্র আন্দোলন, ছয় দফা আন্দোলন (১৯৬৬), গণঅভ্যুত্থান (১৯৬৯), অখণ্ড পাকিস্তানের জাতীয় ও প্রাদেশিক নির্বাচন (১৯৭০), ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ, ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের সপরিবারে নিহত হওয়া, ১৯৯০ সালে স্বৈরাচার-বিরোধী আন্দোলন প্রভৃতি ঘটনা লেখক অতি সচেতনভাবে প্রত্যক্ষ করেছেন। ফলে, শওকত ওসমানের সাহিত্যে জাতীয় জীবনের উপর দিয়ে প্রবাহিত এসব সামাজিক-রাজনৈতিক ডামাডোলের চিত্রের সন্নিবেশ ঘটেছে।

আর্থসামাজিক, ভূ-রাজনৈতিক, ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সময়সচেতন গল্পকার শওকত ওসমান "সাহিত্য জীবনের পুরো সময়টা প্রধানত জাতির সামাজিক ও রাজনৈতিক নানা সংকটের অভিমুখী হয়ে তাঁর সাহিত্য মানসকে এক ধরণের বিপ্লবের ভূমিকায় অবতীর্ণ করেছেন। এ জন্যেই জাতীয় আন্দোলনের অনেকগুলো ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর সাহিত্যিক কৃর্তির বিচার চলে।"[৪৮] সভ্যতার সঙ্কটকালে শিল্পী-সাহিত্যিকরা নির্লিপ্ত থাকতে পারেন না। শওকত ওসমান নির্লিপ্ত কথাসাহিত্যিক ছিলেন না। তিনি তাঁর সাহিত্য কীর্তির মাধ্যমে সমাজ ও রাষ্ট্রযন্ত্রের সব অন্যায়-অত্যাচার-অবিচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার এবং দৃঢ় প্রতিবাদ করে গেছেন। তিনি

Dhaka University Institutional Repository

সাহিত্যিক জীবনের প্রারম্ভে (ব্রিটিশ কালপর্বে) প্রতিবাদ করেছেন 'দ্বি-জাতি তত্ত্ব', বাংলাভাগ এবং সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে। পাকিস্তান কালপর্বে লড়াই করেছেন পাকিস্তানি শাসকদের বাংলা ভাষা নিয়ে ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে, সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে, সর্বোপরি দেশ-মাতৃকার মুক্তির জন্য। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশ কালপর্বে বা তাঁর সাহিত্যিক জীবনের অন্তিম পর্বেও তিনি মৌলবাদ, অপসংস্কৃতি, স্বৈরাচার-বিরোধী আন্দোলনের সাথে কখনও লেখনীর মাধ্যমে আবার কখনও সরাসরি রাজপথে নেমে এসে উচ্চকণ্ঠে প্রতিবাদ করেছেন। সমকালের বিভিন্নমুখী ঘটনা লেখকের মনোলোকে বিভিন্নমুখী অনুভূতির সৃষ্টি করেছে এবং তাঁকে উদ্দীপ্ত করেছে সাহিত্যের পথে ধাবিত হতে।

শওকত ওসমানের সাহিত্যের স্বীকৃতি, পুরস্কার ও সম্মাননার ক্ষেত্রে স্বাধীনতা উত্তরকাল অতীব গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৮৩ সালে তিনি পেয়েছেন একুশের পদক, মাহবুবউল্লাহ ফাউন্ডেশন পুরস্কার ও নাসির উদ্দিন স্বর্ণপদক। ১৯৮৯ সালে ৭৩তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ঢাকা তথা দেশের শিল্পী সাহিত্যিকরা তাঁকে সংবর্ধনা প্রদান করেন। এ উপলক্ষে 'শুভ জন্মদিন' শিরোনামে একটি সুভেনির প্রকাশিত হয়। ৭৫তম জন্মবার্ষিকী সাড়ম্বরে পালিত হয় ১৯৯১ সালের ২রা জানুয়ারি। এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অধ্যাপক জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী তাঁকে মানুষের 'অপরাজেয় আত্মার প্রতীক' হিসেবে চিহ্নিত করেন।[৪৯] এ অনুষ্ঠানে তাঁকে এক লক্ষ এক হাজার টাকা প্রদান করা হয়। ১৯৯০ সালে তিনি পান *ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী* গ্রন্থের জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা মূল্যমানের ১৩৯৬ সালের ফিলিপস্ পুরস্কার। টেলিভিশন নাট্যশিল্পী সংসদ ১৯৯০ সালের টেনাশিনাস পদক প্রদান করে তাঁকে সম্মানিত করে। নাটক রচনার জন্য তাঁকে এ সম্মান প্রদান করা হয়।[৫০] মুক্তধারা ১৯৯০ সালের 'মুক্তধারা সাহিত্য পুরস্কার' প্রদান করে শওকত ওসমানকে সম্মানিত করে।[৫১] বাংলাদেশ লেখিকা সংঘ পুরস্কার (১৯৯২) ও সত্যেন সেন পুরস্কারও (১৯৯৫) তাঁকে প্রদান করা হয়। বৈচিত্র্যসন্ধানী জীবনদ্রষ্টা শওকত ওসমানের জীবন নানা অভিজ্ঞতা ও প্রজ্ঞাভারে সমৃদ্ধ হয়েছিল।

ব্রিটিশ, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ এই তিন আমলের দ্রষ্টা শওকত ওসমান নিজের সাহিত্যিক মানস গঠনের ক্ষেত্রে যুগ পরিবেশ দ্বারা কিভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন তা তাঁর রচনা পাঠে জানা যায়। মানস গঠনের প্রস্তুতি লগ্নের কথা স্মরণ করে একবার তিনি এক মানপত্রের জবাবে বলেছিলেন :

> ইংরেজের হাতিয়ার শালে তৈরি পরাধীনতার বেড়ি হাতে পায়ে নিয়েই সাহিত্য সাধনা আরম্ভ করেছিলাম। দেখেছি, আবেষ্টনীর জগদ্বলে ব্যক্তি থেতলে দলামাংস কি নার্ভে পরিণত, আদর্শ-বোধ, শূন্যমূক মুখ-যে দিকে বিদেশী শাসক চোখ দেয়ার কোন প্রয়োজন মনেই করত না, উপরন্তু অজ্ঞ, অনুন্নত (ওদের কাছে এদেশের মানুষও আন্ডার ডিভোলাপ্ড) পদবী জুড়ে বেইজ্জতির কাঁটা গায়ে লবণের ছিটা দিত।[৫২]

Dhaka University Institutional Repository

পরাধীনতার এহেন গ্লানিবোধই শওকত ওসমানকে স্বাধীনতা সচেতন, অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির অনুধ্যানে আত্মনিবেদিত হতে সাহায্য করেছে। ইংরেজ আমলের পশ্চাদপদ মুসলমানদের ইংরেজী শিক্ষায় পারদর্শী করে তোলার জন্য স্যার সৈয়দ আহমদ (১৮১৭-১৮৯৮) যে উদ্যোগ নিয়েছিলেন, শওকত ওসমান আলিয়া মাদ্রাসার ছাত্র হয়েও সেই ইংরেজী শিক্ষায় প্রয়াসী হয়েছিলেন। ইংরেজী শিক্ষার মাধ্যমে উপমহাদেশের জনগণ পাশ্চাত্যের আধুনিক জীবনবোধে উদ্দীপিত হয়। যুক্তিবাদিতা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, স্বাধীনতা ও মানবতার মন্ত্রণায় তারা হয়েছিল জাগ্রত। শওকত ওসমান বিশ্বাস করতেন :

> জাগরিত চিত্ত এবং বুদ্ধি ছাড়া জীবনের প্রতিভাসকে ঠিকমত ধরা কঠিন। বহির্জগতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছাড়া শিল্প সৃষ্টি অসম্ভব। প্রতিচ্ছায়াগ্রাসী নির্মল ফলকের সাধনা মনের পক্ষে আদৌ সহজ নয়।[৫৩]

এই কারণে ছাত্রজীবনে মাদ্রাসার ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি ইংরেজী শিক্ষার প্রতি অনুরক্তি তাঁকে যেমন বহির্জগতের জ্ঞানপিপাসা নিবৃত্তির পথ দেখিয়েছিল, তেমনই সকল সংস্কারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার শক্তি যুগিয়েছিল। আর সত্যি সত্যিই তিনি জাগরিত চিত্তের অধিকারী বলেই আপন সৃষ্টির ভুবনে দেশ-কাল-সমাজ ও সভ্যতার রূপায়ণ ঘটিয়েছেন অনায়াসে।

শওকত ওসমান বরাবর নির্যাতিত মানুষের স্বপক্ষে লেখনী ধারণ করেছেন। শোষিত মানুষের মুক্তির উপায় হিসেবে সমাজতন্ত্রকে বিবেচনা করেছেন। সেটা হয়ত বা দলীয় ব্যানারে সম্পন্ন হয়নি। তাঁর আরেক বন্ধু অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান বলেছেন :

> সে সমাজতান্ত্রিক কিন্তু কখনও কোনও রাজনৈতিক দলের প্রেক্ষাপটে সমাজতন্ত্রকে দেখতে চায়নি। সে দেশপ্রেমিক এবং মানবতাবাদী।[৫৪]

সমাজতান্ত্রিক মতবাদ সম্পর্কেও নানা জায়গায় শিল্পী শওকত ওসমান আশাপ্রদ মতামত ব্যক্ত করেছেন। মাওলানা ভাসানীকে লেখা এক খোলা চিঠিতে তিনি সমাজতন্ত্রের প্রতি তাঁর দৃঢ় অবস্থা ব্যক্ত করে বলেছেন :

> চৌদ্দ বছর বয়স থেকে বর্তমান ছাপ্পান্ন এই বিয়াল্লিশ বছর সমাজতন্ত্রের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেছি এই জন্য যে, এই ভাবধারা জীবনের সাধক।[৫৫]

Dhaka University Institutional Repository

শওকত ওসমানের রাজনৈতিক এই আস্থাশীলতা এবং এহেন মতবাদের প্রতি দৃঢ় প্রত্যয় ১৯৩০ এবং ১৯৪০ এর দশকে ঘনীভূত এবং আমূলিত হয়েছিল, তার কিছু প্রমাণ মেলে সমকালীন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে। রাজনৈতিকভাবে অক্টোবর বিপ্লব এবং ১৯২০ সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হবার পর অবিভক্ত বাংলার প্রেক্ষাপটে ফ্যাসিস্ট বিরোধী মনোভাব গড়ে উঠতে থাকে। আন্তর্জাতিক পরিসরে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে রোঁমা রোঁলার (১৮৬৬-১৯৪৪) নেতৃত্বে *Declaration of Independence of the spirit,* ১৯৯৯ সালে প্রকাশ পায়। এই ঘোষণা পত্রে রবীন্দ্রনাথ, আনন্দকুমার অত্যাচারী অশুভ শক্তির কবল থেকে মানবজাতিকে রক্ষায় পুঁজিবাদ ও যুদ্ধের দোসরতায় বুদ্ধিজীবীদের নিযুক্ত না হওয়ার জন্য স্বাক্ষর করেছিল। এই স্বাক্ষর পত্রে বলা হয়েছিল :

> আমরা কেবল সত্যের উপাসক, যা মুক্ত, যার কোন সীমান্ত নেই, দিগন্ত নেই, জাতিগত অথবা বর্ণগত কোন কুসংস্কার নেই। অবশ্যই মানবজাতির কল্যাণ থেকে আমরা নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে নেব না। তার জন্য আমরা সংগ্রাম করব, কিন্তু সংগ্রাম করব অখন্ডভাবে। কোন জাতিকে আমরা স্বীকার করি না, আমরা স্বীকার করি এক ও বিশ্বজনীন জনসমষ্টিকে, যে জনসমষ্টি অত্যাচারিত হয়, সংগ্রাম করে, পরাভূত হয়, কিন্তু পুনরায় মাথা তুলে দাঁড়ায় এবং যারা ঘর্মাক্ত ও রক্তাক্ত কলেবরে জীবনের বন্ধুর পথে এগিয়ে যায় চিরকাল।[৫৬]

বিশ্বের বহু লেখক এই স্মারকপত্রে স্বাক্ষর করেন। এতে লেখক-বুদ্ধিজীবীদের প্রগতিশীল চৈতন্যের প্রতি আস্থা এবং সাম্রাজ্যবাদী ফ্যাসিস্ট ঘাতক শক্তির বিরুদ্ধে ঘৃণা বিশেষভাবে প্রকটিত হয়। ভারতীয় লেখকদের দ্বারা ১৯৩৬ সালে 'All India Progressive Writers Association' স্থাপিত হয়। এর সভাপতি মুন্সী প্রেমচাঁদ (১৮৮০-১৯৩৬) এবং সম্পাদক ছিলেন সাজ্জাদ জহীর। এই নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘের প্রথম সম্মেলনে ঘোষণা করা হয়, 'বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদকে সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত করা এবং প্রগতিবিমুখ ভাবনাসমূহকে উন্মুলিত করা হবে প্রগতি সাহিত্যের কাজ। প্রগতি সাহিত্যকে ক্ষুধা, দারিদ্র্য, সামাজিক পরানুখতা ও রাজনৈতিক পরাধীনতা নিয়ে আলোচনা করতেই হবে।'[৫৭] ১৯৩৬ সালের ১৮ই জুন 'নিখিল বঙ্গ প্রগতি লেখক সংঘ' গঠিত হয়। এই সংস্থার সভাপতি হন নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত (১৮৮২-১৯৬৪) ও সম্পাদক হন দর্শনের অধ্যাপক ও কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য সুধীন্দ্রনাথ গোস্বামী (১৯০৯-১৯৪৫)।[৫৮] ১৯৩০ এর দশকের শেষ এবং চল্লিশের দশকের প্রথম দিকে মুক্তবাংলার লেখক বুদ্ধিজীবীরা সাহিত্য সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে বাংলার সমাজ প্রগতিকে উর্মিমুখর ও গণমানুষের মুক্তির মন্ত্রদানের প্রয়াস পান। এ সময় কলকাতায় 'সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি' (১৯৪১), 'ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক সংঘ' (২৯ শে মার্চ, ১৯৪২), 'গণনাট্য সংঘ' প্রভৃতির মাধ্যমে প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী, লেখকরা সোচ্চার হয়ে ওঠেন।[৫৯] কলকাতার ধর্মতলা স্ট্রীটের ৪৬ নং চারতলা বাড়িতে এই সমস্ত সংঘ সমিতির অফিস ছিল। এখানেই 'ইয়ুথ কালচারাল

Dhaka University Institutional Repository

ইনস্টিটিউট' এবং 'পরিচয়' পত্রিকারও অফিস ছিল। 'ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক-সংঘের' সাহিত্য বৈঠক 'বুধবারের বৈঠক'-এ যোগ দিতেন বামপন্থী ও প্রগতিশীল মানসিকতার নানান লেখক। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিষ্ণু দে, গোপাল হালদার, হীরেন মুখোপাধ্যায়, গোলাম কুদ্দুস, সুকান্ত ভট্টাচার্য ছাড়াও অনেক অমার্কসবাদী সাধারণ মেজাজের লেখক এখানে আসতেন। ৪৬ নং ধর্মতলা স্টীটের এই বাড়িতে শওকত ওসমান যাতায়াত করেছেন। তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু গোলাম কুদ্দুসেরও নিয়মিত যাতায়াত ছিল 'বুধবারের বৈঠকে'।

এ থেকে বোঝা যায়, কথাশিল্পী শওকত ওসমানের প্রগতিশীল চিন্তা চেতনার উম্মীলন অনির্দেশ্য কোনো কিছু থেকে আসেনি। একটি সাবলীল রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মধারার উৎসনির্ভর থেকে তিনি পেয়েছিলেন এই প্রেরণা। ফলে মুক্তবুদ্ধিচর্চা, সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী এবং ধর্মান্ধতা প্রতি তাঁর বিরূপ মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। বিভাগ পূর্বকালে তাঁর সৃষ্ট সাহিত্য ও রাজনৈতিক চেতনায় এই বিষয়গুলো খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ১৯৪৭ সালের ধর্মভিত্তিক জাতীয়তার ভিত্তিতে ভারত বিভক্তিকে তিনি মেনে নিতে পারেননি। সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাশেম ও শরৎচন্দ্র বসুর অভিন্ন বাংলার পরিকল্পনার সাথে সংহতি প্রকাশ করে 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান' আন্দোলনের তুঙ্গ অবস্থায় যে সমস্ত লেখক-বুদ্ধিজীবী বাংলা ভেঙ্গে তার একাংশকে পাকিস্তানভুক্তকরণের বিপক্ষে পত্রিকায় বিবৃতি দিয়েছিলেন, তাঁদের উদ্যোক্তাদের মধ্যে শওকত ওসমান অন্যতম ছিলেন। অন্যান্য মুখ্য উদ্যোক্তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য লেখকরা হচ্ছেন কাজী আব্দুল ওদুদ, আবু সয়ীদ আইয়ুব, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, গোলাম কুদ্দুস প্রমুখ। 'আজাদ' ছাড়া কলকাতার সকল পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত এই বিবৃতির বিষয়বস্তু ছিল :

> বাঙ্গালিদের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রয়োজন, কারণ ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মুসলমান এবং বাঙ্গালী মুসলমান শিক্ষা, সংস্কৃতি ও স্বভাবে এক নয়। সুতরাং বাংলার অংশ বিশেষকে পাকিস্তানের অন্তর্ভূক্ত করার যৌক্তিকতা সামান্যই।[৬০]

এই অসঙ্গত, অবৈজ্ঞানিক রাষ্ট্রীয় বিভক্তির নানা ত্রুটি নিয়ে পরবর্তীকালে শওকত ওসমান নানা প্রবন্ধ লিখেছেন।

ব্রিটিশপর্ব, তথা বিভাগ পূর্বকালের রচনায় সমাজবাদী সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে শওকত ওসমান বেছে নিয়েছিলেন বাংলার গ্রামীণ সমাজ ও জীবনের সমস্যাকে। যুগ যুগ ধরে নিগৃহীত ও লাঞ্ছিত বাংলার কৃষক সমাজ রৌদ্র-বৃষ্টিতে ভিজে-পুড়ে মাঠে ফসল ফলাবার পরেও দু'বেলা পেট পুরে খাবার পায় না। জমিদারী ও মহাজনী শোষণের নিস্পেষণ সহ্য করতে হত কৃষককুলকে। শওকত ওসমানের *জননী* (১৯৬১) এবং *বনী আদম* (১৯৪৬) উপন্যাসে কৃষকদের দুর্দশার নানা চিত্র পাওয়া যায়। এই দুটো উপন্যাসই

Dhaka University Institutional Repository

বিভাগপূর্বকালে পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। বিভাগপূর্বকালে রচিত এবং বিভাগোত্তরকালে প্রকাশিত *সাবেক কাহিনী* নামক গল্প সংকলনেরও একাধিক গল্পে কৃষকের দারিদ্র্য ও অভাবের কথা বর্ণিত হয়েছে।

শওকত ওসমানের কালচেতনা তাঁর রচনাগুলোতে নানাভাবে ছড়িয়ে আছে। যুগ বা কালচেতনাকে তিনি সমধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। ১৯২৯ সালে এদেশে 'নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি' গঠিত হয়। পরে এর নামকরণ করা হয় 'নিখিল বঙ্গ কৃষক প্রজা সমিতি'।[৬১] ১৯৩৫ সালে কৃষক প্রজা সমিতির সম্মেলন হয় ময়মনসিংহে এবং ফজলুল হক সভাপতিত্ব করেন। ১৯৩৭ সালে কৃষক প্রজা সমিতির মাধ্যমে নির্বাচিত হয়ে তিনি মুসলিম লীগের সঙ্গে মন্ত্রী পরিষদ গঠন করেন। ১৯৩৭ থেকে '৪০ এর মধ্যে কৃষকদের সুবিধার্থে তিনি কয়েকটি বিল পাস করেন। এগুলো হচ্ছে: ঋণ সালিশী বোর্ড (১৯৩৮), প্রজাসত্ব আইন (১৯৩৯), মহাজনী আইন (১৯৪০) প্রভৃতি। এগুলোর মাধ্যমে সাময়িকভাবে কৃষকের কিছুটা উপকার হলেও জমিদারী অত্যাচার বহাল থাকে। বিভাগ পূর্বকালের *জননী*-তে দুই জমিদারের হানাহানি, *বনী আদম*-এ চড়া খাজনার বর্ণনা রয়েছে। জমিদারী অত্যাচারের চিত্র পাওয়া যায় *সাবেক কাহিনী* গ্রন্থের 'বকেয়া' গল্পে। জমিদারী আমলে জমিদার তথা তাদের নায়েবদের অত্যাচারের কাহিনি লেখা শওকত ওসমানের কাল চেতনারই পরিচয় বহন করে। ১৯২০ এবং ১৯৩০ এর দশকের রাজনৈতিক সংগ্রামের বিশেষ একটি দিক হচ্ছে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন। রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন :

> স্বদেশী আন্দোলনের ফলেই বাংলার বিপ্লবীদের মধ্যে গুরুতর মতভেদ উপস্থিত হয় এবং সন্ত্রাসবাদের আরম্ভ হয়। ইহা ক্রমে ভারতের নানা স্থানে ছড়াইয়া পড়ে ও ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত স্বাধীনতা সংগ্রামে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে।[৬২]

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের ফলে সরকারের নির্যাতন প্রক্রিয়া বেড়ে গেলে এবং এদেশের মুসলিম লীগ এবং কংগ্রেসের ভূমিকা আবেদন-নিবেদনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকায় মানুষের মুক্তি অসম্ভব ছিল। এই কারণে সশস্ত্র সংগ্রামের দিকে আন্দোলন মোড় নেয় এবং বঙ্গভঙ্গের সময় থেকেই সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন দানা বাঁধতে থাকে।

বিভাগ-পূর্ব বাংলার সামাজিক সংকটের অন্যতম প্রসঙ্গ ছিল হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। উপমহাদেশে এই ধর্মীয় জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে হানাহানি নতুন নয়। ১৭৩০ সালে মোঘল সম্রাট ফররুখ শিয়রের রাজত্বকালে দোল খেলা উপলক্ষে উভয় সম্প্রদায়ের প্রচুর রক্তক্ষয় হয়েছিল।[৬৩] আমরা ইতিহাসের চলমান ধারায় মাঝে মাঝেই সম্প্রীতিহীনতা ও জিঘাংসাবৃত্তির রূপ প্রত্যক্ষ করি। ১৯২০ থেকে ১৯৪৬ সালের মধ্যে বাংলার নানা জায়গায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিষোদগার লক্ষ করা গেছে। সাধারণত আর্থিক অসমতা বিধানের বাস্তবতা থেকেই এহেন দাঙ্গার কালো হাত বারবার বাঙালী সমাজ পরিবেশে আঘাত হানে। শওকত

Dhaka University Institutional Repository

ওসমান বাল্যকাল থেকেই হিন্দু মুসলমানের হানাহানি দেখে আসছেন। ১৯৪৬ সালে কলকাতায় যে দাঙ্গা সংঘটিত হয় তার সঙ্গে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং মাড়োয়ারী-শ্রেণীর ষড়যন্ত্র যুক্ত ছিল। শওকত ওসমান বিভাগপূর্ব কালের রচনায় এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রসঙ্গ নিয়ে এসেছেন। *জননী* উপন্যাসে দুই জমিদারের স্বার্থবাজ মানসিকতা থেকে এরূপ দাঙ্গার লেলিহান শিখা দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠার প্রেক্ষিত বর্ণিত হয়েছে। 'চুহাচরিত' নামক একটি গল্পেও লেখক সাম্প্রদায়িক ফায়দাবাজদের ইঙ্গিত করেছেন।

বিভাগ-পূর্বকালের একটি উল্লেখযোগ্য প্রসঙ্গ ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ। বাংলাদেশের গ্রামীণ দরিদ্র কৃষকের দুর্গতির জন্য যেমন প্রাকৃতিক দুর্যোগ আংশিকভাবে দায়ী, তেমনই কৃত্রিম অভাব সৃষ্টিকারী বণিকসমাজ ও হৃদয়হীন শাসকগোষ্ঠীর হঠকারী ভূমিকাও কম নয়। ১১৭৬ বঙ্গাব্দের মন্বন্তর থেকে ১৩৫০ সন পর্যন্ত উপমহাদেশে বহুবার দুর্ভিক্ষ সংঘটিত হয়েছে। যেমন- ১৭৮৩, ১৮৬৬, ১৮৭৩, ১৮৭৫-৭৬, ১৮৯১-৯২, ১৮৯৭ ও ১৯১০ খিস্টাব্দের দুর্ভিক্ষের কথা আমরা বলতে পারি।[৬৪] বিশ শতকের গোড়ার দশক থেকে ত্রিশের দশক পর্যন্ত বেশ কয়েকবার এদেশের মানুষ দুর্ভিক্ষ কবলিত হয়। ইতিহাসের সবচেয়ে মর্মান্তিক ট্রাজেডি ঘটে ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষে। এ শতকের সবচেয়ে বড় ভয়ঙ্কর দৃশ্যের হোতা-এই দুর্ভিক্ষে ১৫ লক্ষ মানুষ মারা যায়।[৬৫] শওকত ওসমানের প্রত্যক্ষে সংঘটিত এই দুর্ভিক্ষের চিত্র তাঁর কথাসাহিত্যে নানাভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের *আনন্দমঠ*-এ (১৮৮২) ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের ভয়াবহ বর্ণনা রয়েছে। ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের বর্ণনা পাওয়া যায় বিভূতিভূষণের *অশনি-সংকেত* (১৩৬৬ বঙ্গাব্দ) এবং তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের *মন্বন্তর* (১৯৪৪), মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *নমুনা*, *আজকাল পরশুর গল্প* ইত্যাদিতে। শওকত ওসমানের *বনিআদম* ও *জননী* উপন্যাস দুটি, বিশ ও তিরিশের দশকের প্রেক্ষাপটে চল্লিশের দশকে লেখা। এই দুটি উপন্যাসেও বাংলার তৎকালীন নগ্ন দারিদ্র্যের ছবি পাওয়া যায়। আমাদের ধারণা গ্রাম বাংলার সঙ্গে লেখকের নাড়ির যোগ থাকলেও এগুলো রচনার সময় '৪৩-এর বোধ কাজ করেছিল। শওকত ওসমানের 'আকালের গল্প', 'আজব জীবিকা', 'একশ বছর পরে', 'ভাগাড়', 'হিংসাধার' প্রভৃতি গল্পে ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সংযোগ ঘটেছে।

ব্রিটিশ রাজত্বের শেষের তিন দশক রাজনৈতিক স্বাধিকার আদায়ের যুগে নানা বৈচিত্র্যের ঢেউয়ে বাংলাদেশ আন্দোলিত হয়েছিল। শওকত ওসমান এ সময়ে শিক্ষা শেষ করে কর্মজীবনে প্রবেশ করেন। এই সময়েই যেমন একদিকে তাঁকে সচেতন কথাশিল্পীরূপে নিজেকে গড়ে তুলবার পথে সংগ্রামে লিপ্ত করেছে,

Dhaka University Institutional Repository

তেমনই এই সময়ে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন সমাজ, রাজনীতি ও অর্থনৈতিক পরিসরে নানা ভণ্ডামি ও হঠকারিতা। আবার পেয়েওছিলেন কিছু যুগ প্রকাশক হিতৈশীদের কাছ থেকে সঠিক পথের সন্ধান। সুতরাং ১৯১৭ থেকে ১৯৪৭-এ সময়কে আমরা শওকত ওসমানের মানসিক পরিপুষ্টি স্ফুর্তি লাভের শ্রেষ্ঠ সময় হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি।

১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত সময়কালকে শওকত ওসমানের প্রাগ্রসর সৃষ্টিমুখর পর্ব হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের বেদনা নিয়ে তিনি পাকিস্তান ভূ-খণ্ডের তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানে চলে এসেছিলেন। মানসিকভাবে পাকিস্তানকে মেনে না নিলেও কর্ম ও বন্ধুদের সুবাদে তাঁকে পূর্ব বাংলায় চলে আসতে হয়। সাহিত্য সৃষ্টি ও চিন্তার পরিপক্বতা এমনকি সাহিত্যিক সার্থকতা ও শৈল্পিক নৈপুণ্যের সম্মাননা এই পর্বেই তাঁর জীবনে শুরু হয়েছিল।

পাকিস্তান পর্বের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত তাঁর রচনাকে রীতিমতো স্পর্শ করে আছে। শুধু তাই নয়, জন্মসূত্রে হুগলী জেলার মানুষ হয়েও ভাষা, সংস্কৃতি ও সমাজদর্শনের ব্যাপ্তিস্থান হিসেবে তিনি পূর্ব বাংলাকে আপন করে নিয়েছিলেন। ফলে এ দেশের জাতীয় জাগরণের নানা দীপ্তি, সমাজমানসের নানা সমস্যা ও সম্পর্কের ইঙ্গিত শওকত ওসমানের কথা সাহিত্যের অঙ্গনে আমূলিত হয়েছে। পূর্ববাংলার আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার তাঁর নানা রচনায় লক্ষ করা যায়। আরেকটি বড় কথা, সেটা হচ্ছে পূর্ব বাংলায় আগমনের পর শওকত ওসমান তাঁর গল্প ও উপন্যাসে স্থান-কালের পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গের স্থান নামের ব্যবহার করেননি। এ থেকে ধারণা করা সম্ভব, পূর্ব-বঙ্গকে তিনি আপন করে নিতে পেরেছিলেন এবং এর বহুমুখী দৈন্য ও ঐশ্বর্যকে আত্মস্থ করতে সক্ষম হয়েছেন। নিঃসন্দেহে শওকত ওসমান ছিলেন বাঙালি মুসলমানের সাহিত্য-অঙ্গনের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি পুরুষ। বিরতিহীন ও নিরবচ্ছিন্নভাবে যিনি প্রজনন-প্রসূ, সময় ও তার নির্যাসের সারবত্তা নিয়েছিলেন। শওকত ওসমানের বিক্ষিপ্ত বিশাল সৃষ্টি সম্ভারের মধ্যে গল্প একটি বহুবর্ণিল ও বহু আয়তনিক অংশ।

পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে, শওকত ওসমানের গল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল ব্যাপকতা। জীবনের সুদীর্ঘ পথ পর্যটনে বিভিন্ন সময়ের অর্জিত অভিজ্ঞতার একত্রীকরণ ও সমীকরণ ঘটেছে তাঁর গল্পে। গল্পের অপর নামই তো সমুন্নত অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের ব্যঞ্জিত ফসল। বহুধাবিস্তৃত জীবনক্ষেত্রের ভেতর-বাহির, আদ্যোপান্ত ও আপাদমস্তককে যে লেখক অন্তর-রশ্মির আওতায় এনে নবকলেবর দিতে জানেন, তিনিই গল্প নামের হীরকখন্ড উপহার দিতে পারেন। একজন গল্পকারের কাছে জীবনের বিভিন্ন মাত্রিক বাস্তব অভিজ্ঞতার

Dhaka University Institutional Repository

যেমন প্রয়োজন, তেমনি তার সমান্তরাল মানসিক ও কাল্পনিক অভিজ্ঞতারও প্রয়োজন। শওকত ওসমানের গল্পের ক্ষেত্রে এমনি সমুন্নত অভিজ্ঞতার সন্নিবেশ ঘটেছে। কিছু গল্পে গভীর স্ফূর্তি আছে, জীবনের নানা অভিজ্ঞতার সার্থক প্রতিফলন ঘটেছে। তিনি ১৯৯৮ সালের ২৯ শে মার্চ সকাল সাতটার দিকে হঠাৎ সেরিব্রাল এ্যাটাকে পড়েন। ১৪ই মে সকাল ৭টা ৪০ মিনিটে ঢাকায় সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। পরদিন ১৫ই মে মিরপুর বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে সমাহিত হন।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসূত্র

১. হুমায়ুন আজাদ, *কথাসাহিত্যের পথিকৃত শওকত ওসমান*, রোববার, ঢাকা, ৭ম বর্ষ, ২৯শ সংখ্যা, ২১শে এপ্রিল, ১৯৮৫, পৃ. ৩১।

২. শওকত ওসমান, *স্বজন স্বগ্রাম*, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৮৬, পৃ. ২৩।

৩. শওকত ওসমানের আত্মজীবনীমূলক রচনার মধ্যে *স্বজন স্বগ্রাম (১৯৮৬)*, *কালরাত্রি খণ্ডচিত্র* (১৯৮৬), *স্মৃতিখণ্ড মুজিবনগর* (১৯৯২), *উত্তরপর্ব মুজিবনগর* (১৯৯৫), *রাহনামা ১ ছেলেবেলা ও কৈশোর কোলাহল (২০০৭)* এবং *রাহনামা ২ অন্য রণপ্রান্তর ও ভুবন চত্বরে* (২০০৭) উল্লেখযোগ্য।

৪. ড. মো. আব্দুর রশীদ, *শওকত ওসমানের ছোটগল্প : সমকাল, জীবনবৈচিত্র ও শিল্পরূপ*, দিকদর্শন প্রকাশনী লি., বাংলাবাজার, ঢাকা, ২০১৫, পৃ. ১৪।

৫. শওকত ওসমান, *রাহানামা ১ ছেলেবেলা ও কৈশোর কোলাহল*, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ২২০৭, পৃ. ১৭।

৬. ড. মো. আব্দুর রশীদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪।

৭. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪।

৮. শওকত ওসমান, *স্বজন স্বগ্রাম*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০-১১।

৯. শওকত ওসমান, *স্বজন স্বগ্রাম*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০-৩১।

১০. শওকত ওসমান, পূর্রোক্ত, পৃ. ১৯৭।

১১. ড. মো. আব্দুর রশীদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬।

১২. শওকত ওসমান, *রাহনামা ২ অন্য রণপ্রান্তর ও ভুবন চত্বরে*, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ১৯৮।

১৩. ড. মো. আব্দুর রশীদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭।

১৪. শওকত ওসমান, *রাহনামা ২ অন্য রণপ্রান্তর ও ভুবন চত্বরে*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৮।

১৫. ড. মো. আব্দুর রশীদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০।

১৬. আবুল আজাদ, *নজরুল ইসলাম-শওকত ওসমান সমকাল-সংস্কৃতি*, রাইটার্স ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ২০০০, পৃ. ১৭।

১৭. শওকত ওসমান তাঁর *নিঃসঙ্গ নির্মাণ* গ্রন্থে মাষ্টারমশাই সুনীতিকুমার সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন: ১৯৩৯-'৪০ সন বিধিবদ্ধভাবে এই বনস্পতির ছায়ায় বর্তমান লেখকের বিদ্যাভ্যাসের সুযোগ ঘটেছিল। সৌভাগ্য সূত্রে লব্ধ বিরল এমন চিন্তাকাশগামী নিখাদ সুবর্ণ সোপান কোন্ মূর্খতায় স্মৃতিচ্যুত হতে দেব। দ্রষ্টব্য: *নিঃসঙ্গ নির্মাণ*, নওরোজ সাহিত্য সংসদ, ঢাকা, ১৯৮৬, পৃ. ৪০।

১৮. শওকত ওসমান, *স্বজন স্বগ্রাম*, পূর্বোক্ত, পৃ.৩৬।

Dhaka University Institutional Repository

১৯. অনীক মাহমুদ, *বাংলা কথাসাহিত্যে শওকত ওসমান*, ইউরেকা বুক এজেন্সী, রাজশাহী, ১৯৯৫, পৃ. ৩৩।

২০. হুমায়ুন আজাদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩।

২১. শওকত ওসমান, *স্বজন স্বগ্রাম*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২। আমার কথা শুনে এগিয়ে এল স্নেহাস্পদ জাকারিয়া, আমার ছাত্র ছিল। প্রাইভেট পড়ত আমার কাছে। যখন আমি নিজেও কলেজের ছাত্র।

২২. হুমায়ুন আজাদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩।

২৩. হুমায়ুন আজাদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩

২৪. তাঁর ছেলে-মেয়েদের নাম: (১). বুলবন ওসমান। (২). আসফাক ওসমান। (৩). ইয়াফেস ওসমান। (৪). তুরহান ওসমান। (৫). জানেঁসার ওসমান এবং কন্যার নাম। (৬). আনফিসা (অনন্যা)।

২৫. উদ্ধৃত, হুমায়ুন আজাদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১।

২৬. হুমায়ন আজাদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬।

২৭. সৈয়দ আলী আহসান, *সতত স্বাগত*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লি:, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ. ১৭৩।

২৮. অনীক মাহমুদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫।

২৯. সৈয়দ আলী আহসান, *সতত স্বাগত*, পৃ. ১৭৩।

৩০. শওকত ওসমান, *নিঃসঙ্গ নির্মাণ*, নওরোজ সাহিত্য সংসদ, ঢাকা, ১৯৮৬, পৃ. ৭২-৭৩।

৩১. শওকত ওসমান, *সমুদ্র নদী সমর্পিত*, নবজীবন প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৭৩, পৃ. ৭৪।

৩২. আবুল কালাম শামসুদ্দিন, *অতীত দিনের স্মৃতি*, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৬২, পৃ. ২২২।

৩৩. *বুলবুল*, ত্রৈমাসিক পত্রিকা। প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৪০ সালের বৈশাখ মাসে। বন্ধ হয়ে যায় ১৩৪৫ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা থেকে।

৩৪. শওকত ওসমান, *বাহার দা*, আনোয়ারা বাহার চৌধুরী ও শওকত ওসমান (সম্পাদিত), 'হবীবুল্লাহ বাহার', বাহার স্মৃতি কমিটি, ঢাকা, ১৩৭৭, পৃ. ১০৭।

৩৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৭।

৩৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১০।

৩৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১০।

৩৮. আবুল ফজল, *রেখাচিত্র*, বইঘর, চট্টগ্রাম, ১৯৬৫, পৃ. ৩৭০।

৩৯. অনীক মাহমুদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১।

Dhaka University Institutional Repository

৪০. ''জীবন কথা", 'শুভ জন্মদিন' (কথাসাহিত্যিক শওকত ওসমানের-এর ৭৩তম জন্মদিনের স্মরণিকা)। ০২ জানুয়ারি, ১৯৮৯।

৪১. সৈয়দ আবুল মকসুদ, *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর জীবন ও সাহিত্য*, ২য় খন্ড, মিনার্ভা বুকস্, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ. ২৩৪।

৪২. শওকত ওসমান, "চৌ এন লাই এর নিকট খোলা চিঠি", *ইতিহাসে বিস্তারিত*, তুরহান স্মৃতিলোক, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ. ৭২।

৪৩. আবুল আজাদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫।

৪৪. শওকত ওসমানকে প্রদত্ত নজরুলের আশীর্বাণী। ১৭ ই ভাদ্র, ১৩৪৭।

৪৫. সংবাদ, ২৩শে জানুয়ারি, ১৯৯১।

৪৬. সংবাদ, ১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯১।

৪৭. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, 'শওকত ওসমানের প্রভাব ও প্রস্তুতি'; নিসর্গ (সম্পা. সরকার আশরাফ), বাণী প্রকাশনী, বগুড়া, ১৯৯১, পৃ. ১১০-১১১।

৪৮. আজহার ইসলাম, *বাংলাদেশের ছোটগল্প : বিষয়-ভাবনা স্বরূপ ও শিল্পরূপ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ১০৫।

৪৯. সংবাদ, ৩ জানুয়ারী, ১৯৯১।

৫০. ছায়াছন্দ, ৩-৯ আগষ্ট, ১৯৯৫, পৃ. ৩০।

৫১. সংবাদ, ৮ জানুয়ারি, ১৯৯১।

৫২. শওকত ওসমান, *সমুদ্র নদী সমর্পিত*, নবজীবন প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৭৩, পৃ. ৯৫।

৫৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৬।

৫৪. সৈয়দ আলী আহসান, *সতত স্বাগত*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিঃ , ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ১৭৫।

৫৫. শওকত ওসমান, *পূর্ণ স্বাধীনতা চূর্ণ স্বাধীনতা*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯০, পৃ. ৭৪।

৫৬. অরবিন্দ পোদ্দার , রবীন্দ্রনাথঃ 'রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব', উচ্চারণ, কলকাতা, ১৯৮২, পৃ . ২০২।

৫৭. অশ্রুকুমার সিকদার, "প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনঃ একটি রূপরেখা", 'সাহিত্যিকী', রাজশাহী, পঞ্চবিংশ খন্ড, ১৩৯৬, পৃ. ৩৭।

৫৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭।

৫৯. মলয় বসু, *অক্টোবর বিপ্লব ও আধুনিক বাংলা সাহিত্য*, কে-পি বাগচী এন্ড কোম্পানি, কলকাতা, ১৯৮৯, পৃ. ১৮৮।

Dhaka University Institutional Repository

৬০. সৈয়দ আবুল মকসুদ, *সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহর জীবন ও সাহিত্য*, ১ম খন্ড, মিনার্ভা বুকস্, ঢাকা, ১৯৮১, পৃ. ৩০।

৬১. বদরুদ্দীন উমর, *চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাংলাদেশের কৃষক*, চিরায়ত প্রকাশন, কলকাতা, তৃ-মু, ১৯৮৩, পৃ. ৪২।

৬২. রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, দ্বিতীয় খণ্ড, জেনারেল প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স লি., কলকাতা, দ্বি-স, ১৯৮২, পৃ. ১০৬।

৬৩. কামরুদ্দীন আহমদ, *পূর্ব-বাংলার সমাজ ও রাজনীতি*, ইনসাইড লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ. ১৯।

৬৪. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, *পঞ্চাশের মন্বন্তর*, বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৩৫০ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২১।

৬৫. রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, দ্বিতীয় খণ্ড, জেনারেল প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স লি., কলকাতা, দ্বি-স, ১৯৮২, পৃ. ৫৬৭।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

শওকত ওসমানের ছোটগল্প

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম পরিচ্ছেদ

শওকত ওসমানের ছোটগল্পে গ্রামীণজীবন ও সমাজ

বাংলা কথাসাহিত্যে শওকত ওসমান (১৯১৭-১৯৯৮) একটি উজ্জ্বল নাম। শওকত ওসমান কথাসাহিত্যে তাঁর প্রাতিস্বিক শিল্পদৃষ্টিতে বিশিষ্ট। শওকত ওসমানের তীক্ষ্ণ রসবোধ, সমাজ সচেতনতার সাথে রাজনৈতিক বিষয়গুলোকে অঙ্গীভূত করে দেখার দৃষ্টি, বিষয়-নির্বাচন ও নির্ভীক উচ্চারণ তাঁকে বাংলা সাহিত্যে একটি পৃথক আসন দান করেছে। জীবনচলার পথের বিচিত্র অভিজ্ঞতা, যাপিত জীবনের অসংখ্য চিত্র, সমাজ-রাষ্ট্রের বুকে ঘটে যাওয়া বহুবিধ ঘটনা তাঁর সাহিত্যে শৈল্পিকরূপ ধারণ করেছে। ব্যক্তিজীবনাচরণের অনুরূপ তিনি সাহিত্য সাধনাতেও ছিলেন সমান আন্তরিক, ন্যায়নিষ্ঠ, স্পষ্টভাষী, প্রতিবাদী ও কর্তব্যসচেতন। তাঁর গল্প জীবনের বহু বিচিত্র বিষয়কে আত্মস্থ করেছে। সন্ধানী পরিব্রাজকের সংবেদনশীল দৃষ্টিতে শওকত ওসমান মানবজীবন ও সমাজ চৈতন্যের নানা প্রান্তকে উন্মোচন করেছেন। শওকত ওসমান দেশ-কাল বিভিন্নমুখী ঘটনাকে অত্যন্ত গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন। তিনি পরিকল্পিত, তীব্র ও গভীর ইঙ্গিতের দ্বারা তাঁর বক্তব্যকে উপস্থাপন করেছেন।

শওকত ওসমানের সাহিত্যিক জীবন তিন কালপর্বে বিভক্ত। তিনি দীর্ঘকাল নিবিষ্টচিত্তে সাহিত্যসাধনায় মগ্ন ছিলেন। স্ব-কালের সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনাস্রোত, শাসকবর্গের ক্ষমতার পরিবর্তন, ঘটনাবলির রূপান্ত-রশীলতা, পৃথিবীর অস্থির পালাবদল, ইতিহাস-ঐতিহ্য তাঁর মগ্নচৈতন্য ও সৃজনপ্রতিভায় আলোড়ন সৃষ্টি করে। সমাজ ও রাজনীতি সচেতন গল্পকার হিসেবে তিনি সময়ের নানামাত্রিক জটিলতাকে অতি সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং গড়ে তুলেছেন তাঁর সাহিত্যভুবন।

বাংলা কথাসাহিত্যের উজ্জ্বল নক্ষত্র শওকত ওসমানের সাহিত্যিক মানস গঠনে প্রথম পর্যায়ে কলকাতা কেন্দ্রিক এবং পরবর্তীকালে পূর্ব বাংলাকেন্দ্রিক সমাজ ও জীবন পরিবেশ কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে। হুগলি জেলার সবলসিংহপুরের গ্রাম-প্রতিবেশ থেকে ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠার মধ্য দিয়ে তিনি শৈশবকালের অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছেন। কলকাতা আগমনের মধ্য দিয়ে গ্রাম-পরিবেশের সাথে তাঁর সাময়িক বিচ্ছেদ ঘটে, কিন্ত চেতনাগত দিক থেকে তিনি কোন না কোনভাবে গ্রাম-প্রতিবেশের সাথে সংযোগ

Dhaka University Institutional Repository

রেখেছেন। লেখকের ভাষায় বলতে হয়: "গ্রাম আমাদের শিকড় বৈকি।"[১] এ বক্তব্যের মধ্য দিয়ে লেখকের গ্রাম-প্রীতি এবং গ্রামের সাথে নিবিড় সম্পর্কের পরিচয় বহন করে।

শওকত ওসমানের জন্ম-সমকালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, বাংলায় মুসলমানদের খেলাফত আন্দোলন, মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন এবং বহির্বিশ্বে রুশ বিপ্লব সংঘটিত হয়। তাঁর জন্মের বছর থেকে আরম্ভ করে তাঁর সাহিত্যিক জীবনের শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিমণ্ডলে বেশ কিছু পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। ভারতবর্ষে ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলন চলার মধ্যেই, ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আরম্ভ হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। "এ সময় বিশ্ব রাজনীতি এক বিক্ষুব্ধকাল অতিক্রম করছিল। ফলে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক পরিবর্তন ঘটল ব্যাপকভাবে। ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ লাহোর প্রস্তাব পাশ এবং স্বতন্ত্র আবাসভূমির জন্য হিন্দু-মুসলিম বিরোধ আরো তীব্র আকার ধারণ করে, ১৯৪১ সালে ভারতবর্ষে জাপানি আক্রমণ, ১৯৪২ সালের ৮ আগস্ট মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে আরম্ভ হয় 'ভারত ছাড়' (Quit India Movement) আন্দোলন, যা আগস্ট আন্দোলন নামে পরিচিত, ১৯৪৩ সালে দুর্ভিক্ষ, ১৯৪৬ সালে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক সহিংস বিরোধ সংঘটিত হয়, 'দ্বি-জাতি তত্ত্বে'র (Two Nations Theory) উপর ভিত্তি করে হিন্দু-মুসলিমের পৃথক আবাসভূমি প্রতিষ্ঠা (১৯৪৭), রাষ্ট্রভাষা নিয়ে ষড়যন্ত্র (১৯৪৮-১৯৫২), বাংলাভাগ-পরবর্তীকালে পূর্ব বাংলায় পাকিস্তানি শোষকদের নতুন শোষণ-পীড়ন নীতি, যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন (১৯৫৪), ১৯৫৮ সালের সামরিক শাসন ও পাকিস্তানের সংসদীয় গণতন্ত্রের অবসান, ১৯৬২-এর ছাত্র আন্দোলন, ছয় দফা আন্দোলন (১৯৬৬), গণঅভ্যুত্থান (১৯৬৯), অখণ্ড পাকিস্তানের জাতীয় ও প্রাদেশিক নির্বাচন (১৯৭০), ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ, ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সপরিবারে নিহত হওয়া, ১৯৯০ সালে স্বৈরাচার-বিরোধী আন্দোলন প্রভৃতি ঘটনা লেখক অতি সচেতনভাবে প্রত্যক্ষ করেছেন।"[২] এ কারণে শওকত ওসমানের সাহিত্যে জাতীয় জীবনের উপর দিয়ে প্রবাহিত এসব সামাজিক-রাজনৈতিক ঘটনাবলী প্রভাব বিস্তার করেছে।

রাজনীতি ও সমাজ সচেতন গল্পকার শওকত ওসমান "সাহিত্য-জীবনের প্রায় পুরো সময়টা প্রধানত জাতির সামাজিক ও রাজনৈতিক নানা সংকটের অভিমুখী হয়ে তাঁর সাহিত্য মানসকে এক ধরনের বিপ্লবের ভূমিকায় অবতীর্ণ করেছেন। এ জন্যেই জাতীয় আন্দোলনের অনেকগুলো ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর সাহিত্যিক কৃতির বিচার চলে।"[৩] সভ্যতার সঙ্কটকালে শিল্পী-সাহিত্যিকেরা নির্লিপ্ত থাকতে পারেন না। শওকত ওসমানও নির্লিপ্ত কথাসাহিত্যিক ছিলেন না। "তিনি তাঁর সাহিত্য-কীর্তির মাধ্যমে সমাজ ও রাষ্ট্র-যন্ত্রের সব অন্যায়-অত্যাচার-অবিচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার এবং দৃঢ় প্রতিবাদ করে গেছেন। তিনি সাহিত্যিক জীবনের প্রারম্ভে

Dhaka University Institutional Repository

(ব্রিটিশ কালপর্বে) প্রতিবাদ করেছেন 'দ্বি-জাতি তত্ত্ব', বাংলাভাগ এবং সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে। পাকিস্তান কালপর্বে লড়াই করেছেন পাকিস্তানি শাসকদের বাংলা ভাষা নিয়ে ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে, সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে, সর্বোপরি দেশ-মাতৃকার মুক্তির জন্য। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশ কালপর্বে বা তাঁর সাহিত্যিক জীবনের অন্তিমপর্বেও তিনি মৌলবাদ, অপসংস্কৃতি, স্বৈরাচার-বিরোধী আন্দোলনের সাথে কখনও লেখনীর মাধ্যমে আবার কখনও সরাসরি রাজপথে নেমে এসে উচ্চকণ্ঠে প্রতিবাদ করেছেন। সমকালের বিভিন্নমুখী ঘটনা লেখকের মনোলোকে বিভিন্নমুখী অনুভূতির সৃষ্টি করেছে এবং তাঁকে উদ্দীপ্ত করেছে সাহিত্যের পথে ধাবিত হতে।"[৪]

শওকত ওসমান ছিলেন ধর্মীয় মৌলবাদ, ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রব্যবস্থা, সামাজিক কুসংস্কার এবং সামরিক স্বৈরাচারের তীব্র সমালোচক। "তিনি ছিলেন বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রতি গভীরভাবে আস্থাশীল– আর এ কারণেই তিনি বাঙালিদের জন্য পৃথক আবাসভূমির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। তবে, তিনি ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার বাঙালিদের পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্তর্ভূক্তির ঘোর বিরোধী ছিলেন।"[৫] বাংলাভাগের পূর্বে লেখক-বুদ্ধিজীবী সমাজের পক্ষে কাজী আবদুল ওদুদ, আবু সয়ীদ আইয়ুব, গোলাম কুদ্দুস, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-সহ বিভিন্নজনের সাথে শওকত ওসমানও বাংলা-অংশকে পাকিস্তানভূক্ত করার বিপক্ষে বিবৃতি প্রদান করেন। বিবৃতিতে বলা হয়:

> বাঙ্গালীদের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রয়োজন, কারণ ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মুসলমান এবং বাঙ্গালী মুসলমানের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও স্বভাবে এক নয়, সুতরাং বাংলার অংশবিশেষকে পাকিস্তানের অন্তর্ভূক্ত করার যৌক্তিকতা সামান্যই।[৬]

শওকত ওসমান সমাজ ও রাজনৈতিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে তিনি ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রব্যবস্থার অসারতা প্রমাণ করেন ইতিহাসের আলোকে। তিনি মনে করতেন, "ধর্ম এবং জাতীয়তা আলাদা ব্যাপার। তবু এই মিথ্যের উপর মানুষকে উন্নত করে পাকিস্তান তৈরি করে দেখল তা টিকল না, তবু তাদের শিক্ষা হয় না। মিথ্যের বুনিয়াদ অমানুষের বুনিয়াদ। তবু এই অমানুষিয়ানার প্রতি বাংলাদেশের এক শ্রেণীর প্রবণতা কি দুর্দম এবং প্রগাঢ় তা দেখে শিউরে উঠতে হয়।"[৭]

শওকত ওসমানের শিল্পচেতনা সামাজিক দায়বদ্ধতার অচ্ছেদ্য দলিল। জীবনশিল্পী হিসাবে তিনি ছিলেন সমাজ সম্পৃক্ত এবং বাস্তবনিষ্ঠ। তিনি কখনো কারো মনোরঞ্জনের জন্য সাহিত্য রচনা করেননি। তিনি তাঁর সামগ্রিক সাহিত্যকর্মে সমাজ ও সমাজস্থ মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তিনি তাঁর সাহিত্য সম্পর্কে হুমায়ুন আজাদের কাছে এক সাক্ষাৎকারে বলেন :

Dhaka University Institutional Repository

> আমি সুড়সুড়ি-দানে কোনো কিছুই লিখি না। যদি চিন্তার ব্যাপার না হয়ে দাঁড়ায় পাঠকের কাছে, লিখে লাভ কী? বিনোদনী ভূমিকায় আমি বিশ্বাসী নই। তাই হয় তো আমার রচনা সুখপাঠ্য নয়।[৮]

মন্তব্যটির মধ্য দিয়ে লেখকের শিল্পিসত্তার পরিচয় পরিদৃষ্ট হয়।

ব্রিটিশ শাসনাধীন চল্লিশের দশকের প্রায় শেষাবধি অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক দিক থেকে মুসলমানরা ছিল বিপর্যস্ত ও নানা সঙ্কটে নিপতিত। শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও তারা ছিল তুলনামূলক ভাবে অনগ্রসর। চল্লিশের দশকের রাজনৈতিক অস্থিরতা, সহিংসতা ও সাম্প্রদায়িক দলাদলির কারণে যে সামাজিক অবক্ষয় ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছিল তার ভয়াবহ চিত্র রয়েছে শওকত ওসমানের ছোটগল্পে। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মধ্যে যে বৈষম্য বিরাজমান তা তিনি মর্মমূলে উপলব্ধি করেছিলেন। 'তাঁর গল্পে সামাজিক মানুষের শ্রেণিগত বৈষম্য সম্পর্কে সচেতনতা খুব বেশি লক্ষ করা যায়।'[৯]

লক্ষযোগ্য যে, জীবনবোধের গভীরতায় তাঁর গল্পে অবলীলায় উঠে এসেছে বিরুদ্ধ রাষ্ট্রীয় শক্তির পদতলে নিস্পিষ্ট সমাজ ও মানুষ। সমকালীন প্রেক্ষাপটে তাঁর গল্পে ক্ষুধা-অভাব-দারিদ্র্য-দুর্ভিক্ষ, শোষণ-নিপীড়ন, নারীনিগ্রহ ও নারী-নির্যাতন, সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় সচেতন দৃষ্টিভঙ্গিতে হয়েছে পরিস্ফুটিত। তাঁর প্রথম দিকের লেখায় তিনি উপজীব্য করেছেন সমাজের নানান পেশার মানুষকে। এ প্রসঙ্গে একজন সমালোচক বলেছেন :

> তাঁর প্রথম দিকের ছোট গল্পের মধ্যে আমরা পাই নৌকার মাঝি, জেলে, গ্রামীণ চাষী, পাদ্রী, বাড়ির বাবুর্চি, গরুর বাগানের পশু পালকদের। বস্তুনিষ্ঠ সামাজিক বাস্তবতার ধারায় রচিত শওকত ওসমানের গল্পে এই কেন্দ্রীয় সমাজসচেতন দৃষ্টিভঙ্গির সাথে একাত্ম হয়ে আছে তাঁর প্রতিবাদী সত্তা।[১০]

বিশ শতকের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর দুর্ভিক্ষ-দারিদ্র্য ও ব্রিটিশের শাসন-শোষণের ভয়াবহতা, চল্লিশের দশকের পাকিস্তান আন্দোলন, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ, সর্বোপরি স্বাধীন বাংলাদেশে স্বৈরাচার-বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলন– বাঙালি জাতীয় জীবনের এই সব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা শওকত ওসমানের ছোটগল্পে বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

বিশ শতকের পূর্ব পর্যন্ত বাঙালি সমাজ ছিল প্রধানত গ্রামভিত্তিক, মানুষের জীবনপ্রবাহ ছিলো মন্থরগতির এবং তাতে পরিবর্তনও সাধিত হয়েছে ধীর গতিতে সমাজচক্ষুর অন্তরালে। কিন্তু বিশ শতকে এসে

Dhaka University Institutional Repository

গ্রাম এবং শহরজীবনে পরিবর্তনের নতুন মাত্রা সূচিত হয়। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে কৃষি জমির উপর দ্রুত গতিতে চাপ বৃদ্ধি পায় এবং গ্রামাঞ্চলের মানুষ শহরমুখো হয়। প্রয়োজনের তাগিদে বিভিন্ন স্থানে গড়ে ওঠে হাট-বাজার-শহর-বন্দর। অন্যদিকে বড় শহরগুলো আরও বিস্তৃতি লাভ করে এবং শহরগুলোতে অধিক সংখ্যক অফিস-আদালত, কল-কারখানা গড়ে ওঠে। তাছাড়া এসময় যোগাযোগ এবং পরিবহন ব্যবস্থায়ও উন্নতি সাধিত হয়।

ভারতবর্ষীয় সমাজে ব্রিটিশ শাসনের বিস্তার এবং তা শক্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে ইংরেজরা সরকারি কর্মচারীদের এদেশের সাধারণ জনগণ, ভাষা, সমাজ-সংস্কৃতির সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়ার অভিপ্রায়ে বিভিন্ন প্রকারের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে। উল্লেখ্য, ভাষা-জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রযুক্তিকে এগিয়ে নেয়ার জন্য ব্রিটিশরা এদেশে তাদের শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন করেননি। এ-সম্পর্কে গোলাম মুরশিদ উল্লেখ করেন:

> তাদের শাসনের বাইপ্রোডাক্ট হিসেবে বঙ্গদেশে এমন একটা পথে এগিয়ে গিয়েছিলো, যার নির্দেশ মুসলিম শাসকরা দিতে পারে নি, পর্তুগীজ যোগাযোগও নয়। অতঃপর এই পথ ধরেই উনিশ শতকে বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থা আমূল বদলে গিয়েছিলো এবং কলকাতাকে কেন্দ্র করে বাংলা ভাষা, সাহিত্য এবং সঙ্গীত তথা বাঙালির সংস্কৃতি অসামান্য সমৃদ্ধি লাভ করেছিল।[১১]

ব্রিটিশ শাসন প্রবর্তিত হওয়ার ফলে এ অঞ্চলে ইংরেজি ভাষা শেখার আগ্রহ দ্রুত হারে বৃদ্ধি পায়। কেননা সে সময় ইংরেজদের অধীনে চাকরি এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের একমাত্র মাধ্যম ছিল ইংরেজি ভাষা। তবে এ ক্ষেত্রে মুসলমানদের থেকে হিন্দুরা অনেক বেশি এগিয়ে ছিল। সমকালীন সমাজব্যবস্থায় ইংরেজি চর্চা এবং পাশ্চাত্য ভাবধারা ব্যক্তির মনন এবং আর্থ-সামাজিক পরিবেশের উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব সৃষ্টি করে। এ-সম্পর্কে গোলাম মুরশিদের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য:

> ইংরেজি শেখার সঙ্গে সঙ্গে বাংলার প্রতি অবজ্ঞার ভাবও এসেছিল এই তরুণদের মধ্যে। ইংরেজিতে তাদের জ্ঞান যেমনই হোক না কেন, তাঁরা বাংলা ভাষায় দুর্বল। ...জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে যতদুর সম্ভব ইংরেজি ভাষার ব্যবহার ক্রমশ ফ্যাশনে পরিণত হচ্ছিলো। উনিশ শতকের গোড়া থেকেই নগরায়ণ, ইংরেজি শিক্ষা, ইংরেজদের সঙ্গে যোগাযোগ এবং পশ্চিমা
>
> চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচয়ের ফলে মন ও মননে নানা ধরণের পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল।[১২]

উনিশ শতকের প্রারম্ভে বিদেশি শাসক, ধর্ম এবং সংস্কৃতির সংস্পর্শে এদেশের মানুষের চিন্তা-চেতনা, ধর্মবোধ, রীতি-নীতি এবং মূল্যবোধেও পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগে। ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থার শেষ পর্যায়ে

Dhaka University Institutional Repository

হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে কর্ম, রাজনীতি, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সব ক্ষেত্রে তীব্র প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হয়। এই প্রতিযোগিতা প্রথমে বিদ্বেষে এবং পরবর্তিতে সাম্প্রদায়িকতার পথ ধরে এগিয়ে যায়। এর ফলে, এ অঞ্চলে দুই ধরনের জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটে। একদিকে বাঙালি হিন্দু ভদ্রলোকদের মধ্যে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ, মুসলিম জনগোষ্ঠির মধ্যে বাঙালি জাতীয়তাবাদ এবং স্বল্প সময়ের ব্যবধানে "বাঙালি জাতীয়তাবাদ থেকে পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদের রূপান্তর ঘটে। ...পাকিস্তান জাতীয়তাবাদের পাশাপাশি তারা প্রণয়ন করেছিল স্বাধীন বাংলাদেশের রূপরেখা।"[১৩] এই সাম্প্রদায়িকতার পথ ধরে বাংলাভাগ ত্বরান্বিত হয়। এদেশবাসীর কাছে বাংলাভাগ ছিল অনাকাঙ্ক্ষিত এবং আশ্চর্যজনক ঘটনা।

মধ্যযুগে ভারতের সমাজ ছিল মূলত গ্রামীণ ও কৃষিনির্ভর। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই স্বয়ংসম্পূর্ণ আত্মতৃপ্ত গ্রামীণ সমাজকে ভেঙে ইংরেজ বের করে এনেছিল এক নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণী। বেনে ইংরেজ গ্রামজীবনের দুটি মূল আশ্রয় কুটির-শিল্প ও কৃষির মূলে আঘাত হেনেছিল তার চতুর শাসন-কৌশলের সাহায্যে। সামন্ততান্ত্রিক বাংলার সমাজ যখন তার কুটির শিল্পের স্বল্প উৎপাদন নিয়ে গড়িয়ে চলেছে মন্থর গতিতে তখন হঠাৎ ইংরেজ বণিকের মাধ্যমে ধনতান্ত্রিক ইউরোপের যন্ত্রোৎপাদিত পণ্যের প্লাবন বাঁধ ভেঙে বাংলার বাজার ভাসিয়ে দিল। ভারতের কুটির শিল্পজাত পণ্য ভারতের বাজারেই স্থান পেল না, বিদেশ থেকে টাকা আনা তো তার পক্ষে দূরের কথা। অন্যদিকে বিদেশি পণ্যের চাক্‌চিক্যে লুব্ধ বাঙালি ঘরের সঞ্চয় উজাড় করে দিল বিদেশি বণিকের পায়ে। বাংলার কুটির শিল্পকে নিশ্চিহ্ন করতে এগিয়ে এলেন সরকার বাহাদুর। এতকাল এদেশের কুটির-শিল্পের পণ্যের মধ্যে যেগুলি ছিল উন্নতমানের, বিদেশের বাজারে যেগুলি সমাদরের কিছুমাত্র সম্ভাবনা ছিল, সেগুলিও যাতে রপ্তানি না হয় তার জন্যে সরকারি ব্যবস্থার ত্রুটি হয়নি। ইউরোপের বাজারে ভারতীয় পণ্যের উচ্চকর ধার্য করা হল, অন্যদিকে ভারতের বাজারে ব্রিটিশ পণ্য সরবরাহ উৎসাহিত করা হল নামমাত্র কর ধার্য করে।

কুটির শিল্পের বিলুপ্তিতে বাংলার প্রাণকেন্দ্র গ্রামের একমাত্র সম্বল রইল কৃষি। কিন্তু এই কৃষির উপরেও শাসকের শনিদৃষ্টি পড়তে দেরি হয়নি। ব্রিটিশ শাসনের ফলে একদিকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির স্বার্থ-সন্ধান, অন্যদিকে প্রচুর করভার-এই দুইয়ের চাপে এদেশের কৃষি ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে। এমনি করে যখন গ্রাম্য আশ্রয় কৃষি ও কুটির শিল্প বাঙালিকে ক্ষীণতম ভরসা থেকেও বঞ্চিত করল তখন বাঙালির সামনে একটা প্রলোভন ছিল কেরানির চাকরি। সে কারণে প্রবর্তিত হয়েছিল একটি কেরানি নির্মাণকারী ইংরেজি শিক্ষা ব্যবস্থা। ইংরেজের বাণিজ্য ও শাসনতন্ত্রের পরিপুষ্টির জন্যে প্রয়োজন হয়েছিল ইংরেজি শিক্ষিত ভারতীয় যুবক। চিরস্থায়ী ব্যবস্থায় জমিদারেরা যখন জাঁকিয়ে বসলেন তখন তাঁদেরও দরকার হল বহু কেরানি ও

Dhaka University Institutional Repository

হিসাবরক্ষকের। সেদিন যাদের কিছুমাত্র উপায় ছিল তারা কলকাতায় এসে ইংরেজি শিখল। যাদের আর্থিক সঙ্গতি তেমন ছিল না তারাও জমিজমা বিক্রি করে ছেলেকে ইংরেজি শেখাল। ইংরেজি শিক্ষিতরা চাকরি করে যে নগদ টাকা রোজগার করতে লাগল তা হয়ে উঠল পরম লোভনীয়। গ্রাম থেকে নগরে এসে কৃষি ও কুটির-শিল্প ছেড়ে যারা ইংরেজি শিক্ষা নিয়ে কেরানির চাকরিতে ঢুকল তারাই হয়ে উঠল ঊনবিংশ শতাব্দীর বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্ত। গত শতাব্দীতে এই বুদ্ধিজীবীরাই এনেছিল জাতীয় জীবনে নবজাগরণ, আর বর্তমান শতাব্দীতে এরাই এসে দাঁড়াল মৃত্যুর সামনা-সামনি। কারণ ঊনিশ শতকে এদের এই সৃষ্টির ইতিহাসের মধ্যেই এদের ধ্বংসের বীজ উপ্ত ছিল, বিশ শতকে সেটাই প্রকট হয়ে উঠল। ইংরেজি শিক্ষা প্রসারের ফলে বিশ শতকে শিক্ষিতের তুলনায় চাকরির সংখ্যা ক্রমেই কমতে লাগল।

এই শিক্ষাব্যবস্থার সৃষ্টি মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সমাজ যখন বিশ শতকে কেরানির চাকরি থেকেও বঞ্চিত হল, তখন তার পায়ের তলা থেকে ধরিত্রী যেন সরে দাঁড়ালো। এমনি করে দীর্ঘকালের বিদেশি শোষণ এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রচণ্ড অভিঘাতে রচিত হল আধুনিক যুগের ছিন্নমূল ক্ষতবিক্ষত স্বদেশী সমাজ, যার পটভূমিকায় রচিত হয়েছে আমাদের আধুনিক ছোটগল্প।

শওকত ওসমান সমাজসচেতন শিল্পী হওয়ায় সমাজের বিবর্তনকে গভীরভাবে উপলব্ধি এবং তাঁর গল্পের বিষয় হিসেবে সার্থকভাবে উপস্থাপন করেছেন। গ্রামীণ সমাজের মর্মমূলে বিরাজিত সীমাহীন দারিদ্র-বৈষম্য, সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় চাপে নিপীড়িত গোষ্ঠীগত মানুষের প্রাত্যহিক সংগ্রাম, অসম উৎপাদন সম্পর্কের কারণে নির্বিত্ত মানুষের শেকড়হীনতার যন্ত্রণা, সমাজপতি কর্তৃক প্রান্তিক মানুষদের ক্রমাগত নিঃস্বকরণ প্রভৃতি বিচিত্র সঙ্কট তাঁর ছোটগল্পে বিধৃত হয়েছে।

১৯৪৭-১৯৫৭ কালপর্বে শওকত ওসমানের *পিঁজরাপোল* (১৯৫১), *জুনু আপা ও অন্যান্য গল্প* (১৯৫১), *সাবেক কাহিনী* (১৯৫৩) প্রভৃতি গ্রন্থে মূলত গ্রামজীবন আশ্রয়ী নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত মানুষের ইতিকথাই অঙ্কিত হয়েছে। ঘটনা, উপকরণ ও চরিত্র নির্বাচনে লেখক গ্রামীণ অভিজ্ঞতা নির্ভর। ফলে সমাজে ঘটে যাওয়া অসংখ্য ঘটনার সুসংগঠিত রূপায়ণ তাঁর রচনাতে লক্ষ করা যায়। ১৯৪৩ সালের মন্বন্তরের বিভীষিকা, দুর্ভিক্ষ, শোষণ ও শ্রেণিসংঘাত, নারীর প্রতি বৈষম্য, ধর্ম নিয়ে ব্যবসায়ী মনোবৃত্তি, মানুষের দারিদ্র্যক্লিষ্ট জীবন প্রভৃতি বিষয় শওকত ওসমানের ছোটগল্পে গ্রামীণজীবন ও সমাজে কিভাবে প্রতিফলিত হয়েছে তা কয়েকটি গল্প আলোচনার মাধ্যমে জানতে পারব। শওকত ওসমান কলকাতায় দুর্ভিক্ষের

Dhaka University Institutional Repository

সময়কালীন চিত্র স্বচক্ষে অবলোকনের পর যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন তারই বাস্তব প্রতিফলন লক্ষ করা যায় তাঁর গল্পে।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পর প্রথম মহাযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৮) এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ (১৯৩৯-১৯৪৫) ভারতবর্ষীয় সমাজে রাজনৈতিক ক্ষেত্র ছাড়াও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। এ-সময়ে অনেক আর্থিক প্রতিষ্ঠান দেউলিয়া হয়ে যায়। ঔপনিবেশিক সরকার এবং ব্রিটিশ ব্যবসায়ীদের অর্থ ও মুদ্রা ব্যবস্থার কারণে ব্যাপক মুদ্রাস্ফীতি লক্ষ করা যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, হিন্দু-মুসলমানদের পারস্পরিক সহিংস সংঘাত, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা এ অঞ্চলের মানুষের ক্রয়ক্ষমতাকে আরও বিপন্ন করে তোলে। তাছাড়া এ সময় কর্ডনিং প্রথা চালু বন্টনের চূড়ান্ত অব্যবস্থা, অসাধু ব্যবসায়ী কর্তৃক অধিক মুনাফা লাভের আশায় অধিক খাদ্যশস্য গোপনে মজুদ করে রাখা, জাপান কর্তৃক ব্রহ্মদেশ আক্রমণের ফলে সেখান থেকে চাল আমদানি বন্ধ হয়ে যাওয়া, দুর্ভিক্ষের আভাস পেয়ে ভারত সরকার সেনাবাহিনীর জন্য খাদ্যশস্য সংগ্রহ করে গুদামজাত করার ফলে এ অঞ্চলে খাদ্য ঘাটতি চরম পর্যায়ে পৌঁছায়। অবশেষে ঔপনিবেশিক শোষণ, বিশ্বমন্দা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, রাজনৈতিক টানাপোড়েন এবং খাদ্য ঘাটতির পথ ধরে ১৯৪৩ সালে (১৩৫০ বঙ্গাব্দ) নেমে আসে মহাদুর্ভিক্ষ। এ দুর্ভিক্ষ ছিল মূলত ব্রিটিশ সরকারের শাসন-শোষণ এবং তাদের ষড়যন্ত্রের ফল। ব্রিটিশ সরকার এদেশের রাজনৈতিক এবং সামাজিক বিকাশকে যেমন বাধাগ্রস্ত করেছে তেমনি অর্থনৈতিক বিকাশকেও করেছে স্থবির।

ইতিহাস থেকে জানা যায়, বঙ্গীয় বাংলার জন-জীবন অনেকবার চরম দুর্ভিক্ষের কবলে পড়েছিল। এর মধ্যে ১৭৬৯-১৭৭০ (১১৭৬-১১৭৭ বঙ্গাব্দ), ১৮৮৬ (১২৯৩ বঙ্গাব্দ), ১৮৯৬-১৮৯৮ (১৩০৩-১৩০৫ বঙ্গাব্দ), ১৯৪৩ (১৩৫০ বঙ্গাব্দ) খ্রিষ্টাব্দের মন্বন্তরের ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রকৃতপক্ষে ১৭৬৯-১৭৭০ সালের পরে ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ ছিল চরম ভয়াবহ। পঞ্চাশের মন্বন্তরে আত্মাহুতি দিয়েছে পঞ্চাশ লক্ষ বাঙালি। কিন্তু দুর্ভিক্ষের ব্যাপকতা ও তীব্রতার আকার ছিয়াত্তরের মন্বন্তরকেও হার মানিয়েছে। কারণ অজন্মা সত্বেও সৈন্যদের জন্য প্রচুর খাদ্য সংগ্রহ করে রাখার ফলে সাধারণের খাদ্যাভাব ঘটে ও ছিয়াত্তরের মন্বন্তর হয়। কিন্তু এবার সরকারি নীতির কারণে প্রাচুর্যের মধ্যে অন্নাভাব ঘটেছিল। ১৯৪৩ সালের মন্বন্তরের সৃষ্ট দুর্ভিক্ষকে মনুষ্যকৃত দুর্ভিক্ষ বললে তা অতিরঞ্জিত হয়না। কর্তৃপক্ষ লোকজনের খাদ্যাভাবের কথা জেনেও তা নিরাকরণ করেন নি, অভাবগ্রস্ত অঞ্চলে খাদ্য সরবরাহে সময়ে তৎপর হন নি। সরকারি সূত্র অনুযায়ী "এ দুর্ভিক্ষে ১৫ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয় এবং বেসরকারি হিসাব মতে ৩৫ থেকে ৩৮ লক্ষ মানুষ মারা যায়।"[১৪] রফিকুল ইসলামের মতে: "যুদ্ধের সময় ব্যবসায়ীদের চক্রান্তে এই মন্বন্তরে বিশ লক্ষ বাঙালি অনাহারে প্রাণ

Dhaka University Institutional Repository

দেয়।"[১৫] তবে এ-দুর্ভিক্ষ সংঘটনের মূলে মানুষ এবং প্রকৃতি উভয়ের ভূমিকা সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত। "তৎকালীন নাজিমউদ্দিন মন্ত্রী সভার খাদ্যমন্ত্রীরূপে সোহরাওয়ার্দী দুর্ভিক্ষের মোকাবেলায় চেষ্টা করেন। কিন্তু একদিকে মাড়োয়ারি ব্যবসায়ীদের অসহযোগিতা, অন্যদিকে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির কারণে মন্বন্তর এড়ানো সম্ভবপর হয়নি।"[১৬] তৎকালীন বাংলা সরকার কর্তৃক গঠিত 'উইহেড কমিশন' যে প্রতিবেদন প্রকাশ করে তাতে বলা হয় যে, "এই দুর্ভিক্ষের জন্য ভারত সরকার, হক মন্ত্রিসভা এবং মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভা সকলেই আংশিকভাবে দায়ী।"[১৭] মনুষ্যসৃষ্ট কারণ সমূহের মধ্যে দেশে কর্ডনিং প্রথা চালু, সর্বপ্রকার যানবাহনের জন্য অচলাবস্থা সৃষ্টি, জাপান কর্তৃক ব্রহ্মদেশ দখলের ফলে সেখান থেকে চাল আমদানি বন্ধ হয়ে যাওয়া, দুর্ভিক্ষের আভাস পেয়ে ভারত সরকার কর্তৃক সেনাবাহিনীর জন্য খাদ্যশস্য সংগ্রহ করে গুদামজাত করার ফলে খাদ্য ঘাটতি, বিহার উড়িষ্যার সরকার কর্তৃক এ সময় তাদের উদ্বৃত্ত খাদ্য সরবরাহ করে বাংলা সরকারকে সহযোগিতা করতে অস্বীকৃতি জানানো, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হেতু বাংলায় বহু সংখ্যক বিদেশি সৈন্যের আবির্ভাব, খাদ্য সংগ্রহ অভিযান ও বণ্টনের চূড়ান্ত অব্যবস্থা, সুযোগসন্ধানী অসাধু ব্যবসায়ী কর্তৃক অধিক মুনাফা লাভের আশায় অধিক খাদ্যশস্য মজুত করে গোপনে তা চড়া মূল্যে বিক্রি করা, জাপানি আক্রমণে ভীত ব্রহ্মদেশবাসী লক্ষাধিক মানুষের শরণার্থী হিসেবে বাংলায় প্রবেশের ফলে খাদ্য সংকটের মাত্রা বৃদ্ধি এবং নানা প্রশাসনিক ত্রুটি এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। অপরদিকে, প্রকৃতিসৃষ্ট কারণসমূহের মধ্যে অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, বন্যার ফলে খাদ্যশস্যের উৎপাদন হ্রাস, অসময়োচিত শৈত্যপ্রবাহ, পঙ্গপাল, ইঁদুর বা কীটের উপদ্রবে উৎপাদন হ্রাসের ঘটনাও উল্লেখযোগ্য।

ইংরেজি ১৯৪৩ ও বাংলা ১৩৫০ সাল ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের ন্যায় কুখ্যাতই হয়ে থাকবে। এত দুঃখ-দৈন্যের মধ্যেও সরকারী নীতির কোনরূপ পরিবর্তন হ'ল না। বড়লাট লিন্‌লিথ্‌ গো দুভিক্ষকালে বঙ্গদেশে একটিবারও আগমন করেন নি, কারণ সময়াভাব। লক্ষ লক্ষ লোকের দীর্ঘশ্বাসের মধ্যে অক্টোবর মাসে তিনি স্বদেশে চলে গেলেন। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন ২০শে অক্টোবর তারিখে তাঁর সময়েই আর্চিবল্ড পার্সিভ্যাল ওয়াভেল। তিনি এর পূর্বে বিলাতে গমন করেছিলেন। সেখানে তিনি যে বিবৃতি দেন তাতে ভারতবর্ষের রাজনীতিক অচল অবস্থা এবং অন্নসমস্যা দুয়েরই সমাধানের আভাস ছিল। তিনি দিল্লীতে কার্য্যভার গ্রহণ করার অল্পদিন পরেই বঙ্গদেশে আসেন এবং কলকাতায় ও উপকণ্ঠে যে-সব অবস্থা দেখেন ও দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে যে-সব তথ্য আহরণ করেন তার ফলেই বঙ্গবাসীর খাদ্য সমস্যা সমাধানের ভার নিজেই গ্রহণ ক'রে স্বতন্ত্র দপ্তরের উপর অর্পণ করেন। এর কিছুকাল পরে বর্ষ শেষের সঙ্গে সঙ্গে দুর্ভিক্ষেরও অনেকটা অবসান হল। ১৯৪৩ সালের মন্বন্তর যেমন সমকালে তেমনি পরবর্তী সময়েও সমাজ ব্যবস্থায় ব্যাপক বিপর্যয় সৃষ্টি করে। ফলে, বাঙালি সমাজ এবং তাদের মূল্যবোধে পরিবর্তন আসে। বাংলার কৃষক, শ্রমিক, মজুর, বুদ্ধিজীবীসহ

Dhaka University Institutional Repository

সর্বস্তরের জনসাধারণ এ-দুর্ভিক্ষে আলোড়িত হন। "এ-সময় জীবনমুখী সমাজসচেতন লেখকেরা শিল্পীর দায়বদ্ধতা থেকে কলম ধারণ করে তাঁদের রচিত সাহিত্যে ফুটিয়ে তুলেছেন দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতা।"[১৮]

বাস্তবনিষ্ঠ ও সমাজঘনিষ্ঠ দুর্ভিক্ষ বিষয়ে রচিত সাহিত্যকর্মগুলো হয়ে উঠেছে প্রবহমাণ সমাজ ও ইতিহাসের অনন্য দলিল। মন্বন্তরকালে সামান্য খাদ্যের অভাবে হাজার হাজার মানুষ মৃত্যুবরণ করেছে এবং বিত্তবানরা শোষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে দুর্ভিক্ষকবলিত মানুষের বেঁচে থাকার স্বপ্নকে নিঃশেষ করেছে। দুর্ভিক্ষকালীন পটভূমিতে সমাজে বসবাসরত দরিদ্র মানুষের অবস্থা কিরূপ হয়েছিল তারই গুরুত্বপূর্ণ দলিল শওকত ওসমান রচিত *পিঁজরাপোল* গল্পগ্রন্থের 'দাতব্য চিকিৎসালয়ের ইতিহাস' গল্পটি।

গল্প থেকে জানা যায়, গ্রামের সহজ-সরল মানুষদের ফাঁকি দিয়ে মন্বন্তরকালীন পরিবেশে চোরাকারবারি মজুতদার আব্দুল জলিল তরফদার এবং পুলিন সাহা রাতের অন্ধকারে ধান-চাল নদীপথে পাচার করে। গ্রামের মানুষ তখন দুর্ভিক্ষ এবং কলেরার আক্রমণে দিশেহারা। নদী-পথ পাহারা দিতে গিয়ে পুলিশের ডেপুটি মুস্তাফিজ সাহেব বিশ-ত্রিশ মণ চালসহ জলিল তরফদারের নৌকা আটক করেন। এছাড়াও ডেপুটি সাহেব নদীপথে প্রত্যক্ষ করেন দুর্ভিক্ষের ভয়াবহ রূপ। ডেপুটি মুস্তাফিজ সাহেবের মনোভাব ফুটে উঠেছে লেখকের ভাষায়:

> চম্‌কে উঠে মুস্তাফিজ। আত্মশ্লাঘার গৌরব-আসীন সে চেয়ে দেখে, এই ধ্বনির উৎস কোথায়? মুস্তাফিজ রুমালে চোখ মুছে নিল। বিরাট মিছিল এগিয়ে আস্‌ছে। মানুষের মিছিল? না, মানুষ নয়। নরাকার মানুষের ভগ্নাংশেরা শোভাযাত্রা করে এগিয়ে চল্‌ছে। বিকলাঙ্গ, ভগ্ন-স্বাস্থ্য পাঁজর-নির্গত গ্রামের মানুষ। মুস্তাফিজ দাঁড়িয়ে-নিস্তব্ধ হোয়ে গেল। বুকের স্পন্দন দ্রুত হয় ধীরে ধীরে।[১৯]

গল্পকার এখানে মন্বন্তরকালে বিত্তবান লোকদের নেতিবাচক ভূমিকার পাশাপাশি মানবতাবাদী ডেপুটি মুস্তাফিজ চরিত্র চিত্রণের মাধ্যমে বিবেকবান মানুষের ভূমিকাকে তুলে ধরেছেন।

সাবেক কাহিনী গল্পগ্রন্থের 'ভাগাড়' গল্পে মন্বন্তরের পটভূমিতে একদিকে গ্রামীণ মানুষের অসহায়ত্ব, অন্যদিকে অপশক্তির অধিকারী সমাজ প্রধানের শাসন ও শোষণের চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে এবং শোষকের দানকে ভাগাড়ে নিক্ষেপ করে শোষিত গ্রামবাসীরা সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছে 'ভাগাড়' গল্পে। পঞ্চাশের মন্বন্তরের সময় যে মনসব আলি জোতদার হয়েও গ্রামবাসীকে সাহায্য করেনি, সে

Dhaka University Institutional Repository

চারটি গাভি কোরবানি দিয়ে গ্রামবাসীদের মধ্যে বিতরণ করে। অভাবগ্রস্ত গ্রামবাসীরা ঘৃণা প্রদর্শন করে তার মাংস ভাগাড়ে ফেলে দেয়। মনসব আলি ভেবেছিল:

> এ-বার গ্রামবাসীদের সে গোস্ত খাওয়াবে। গঞ্জে তার চালের আড়তে সকলের দানা বাঁধা ছিল এক দিন। সে দিন ভাত না দেওয়ার প্রায়শ্চিত্ত করবে আজ গোশ্ত খাইয়ে।[২০]

গল্পে দেখা যায়, গ্রামবাসীরা ধূর্ত ব্যবসায়ী মনসব আলির গোশ্ত প্রত্যাখান করে তাকে শুধু অপমানই করল না, সম্মিলিত ক্ষোভ প্রদর্শন করে তার মধ্যে ভীতিরও সঞ্চার করেছিল।

'*পিঁজরাপোল*' গল্পগ্রন্থের 'থুতু' গল্পে অঙ্কিত হয়েছে নিপীড়িত সাধারণ মানুষের ছবি। "এ-গল্পের ফাদার জোহানেস ছিলেন এক সজ্জন দেবতুল্য যাজক। ফাদার জোহানেস-এর গৃহভৃত্য মনসুরের ক্ষোভ ও প্রতিবাদের উৎসভূমি ঔপনিবেশিক শাসনামলের দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা বৈষম্য-বঞ্চনা-নিপীড়ন-নির্যাতন।"[২১] মনসুরের মা ও বোন পুষ্টিকর খাদ্য ও প্রয়োজনীয় পথ্যের অভাবে মারা যান। মা-বোনের মৃত্যু-স্মৃতি মনসুরকে প্রতিশোধপরায়ণ করে তোলে। তাই বিলেত থেকে বেড়াতে আসা জনস্টন পরিবার এবং ফাদার জোহানেস-এর খাদ্যে মনসুর তার শরীরে বাসা-বাঁধা যক্ষার জীবানুমিশ্রিত থুতু গোপনে ছিটিয়ে দেয়। ফাদার জোহানেসের জিজ্ঞাসার উত্তরে সে নির্দ্বিধায় খাবারে জীবানু প্রয়োগের কথা স্বীকার করে। গল্পের ভাষায়:

> ফাদার জোহানেস পাথরের মত স্তব্ধ হোয়ে বসে থাকেন। তারপর ধীরে ধীরে বলেন : তোম মেরা খানামে থুক্ দেতা?
>
> –কভি কভি, ফাদার।
>
> মনসুর নির্ভীককণ্ঠে জবাব দিচ্ছে।
>
> –কিঁউ এয়সা কাম করতা?
>
> –মেরা বহেন কোঢ় আপনে দেখা। বেগায়ের খানা মেরা দেশকা বহুৎ আদমী– মেরা মা–
>
> মনসুরের গলা বুজে আসে। হঠাৎ মিইয়ে যায় সে। বক্তব্যের প্রকাশ-স্রোত ঝড়ে স্তব্ধ যেন।
>
> –ষ্টপ, ষ্টপ, মনসুর।
>
> ফাদার জোহানেস উঠে পড়েন চেয়ার ছেড়ে। মানবতার আদর্শে বিশ্বাসী, প্রতিহিংসার ছায়া পড়ে না ফাদার জোহানেসের বুকে।[২২]

মনসুরের এই কাজ প্রতিশোধমূলক। সে জানত তার শরীরে কালব্যাধি বাসা বেঁধেছে। এক ফোঁটা ঔষধ পথ্য ও পুষ্টির অভাবে তার মা ও বোন অকালে মরেছে সুতরাং মনসুর এই শাসকবর্গকেও বাঁচতে দেবে না। মনসুরের এই অপরিসীম ঘৃণা 'Rudyard Kipling-এর 'Lispeth' গল্পের নায়িকাকে মনে করিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

দেয়।'[২৩] একদা সে খ্রীষ্টান পরিবারকে নিজের আত্মার আত্মীয় ভেবেছিল। পরবর্তীকালে দেখল তা সত্য নয়। এই দম্পতি তাকে কণ্যারূপে গ্রহণ করেনি। আসলে সে ছিল 'Half servant, half companion'. Lispeth তা বুঝতে পারেনি। যখন তাদের সমশ্রেণীর একজনকে (whiteman) বিবাহ করতে চাইল তখনই সৃষ্টি হোল বিরোধ। বৈষম্যের কথা সে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করল:

> মধ্য ভারতের দেহাতী অতি সরল স্নিগ্ধশ্রী মেয়েটির হঠাৎ অন্তরে জাগ্রত হল ঘৃণা। কেন তোমরা আমাকে আমার পরিবেশ থেকে, পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন করলে? সে কি শুধুই করুণার খাতিরে? আমি তোমাদের করুণা চাই না– তোমাদের আমি অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করি। কারণ, 'You liar, you English'.[২৪]

Kipling এই গল্পে স্বসমাজের কপটতাকে সমালোচনা করেছেন।

'থুতু' গল্পের মনসুরেরও ঘৃণার উৎপত্তি বঞ্চনা থেকে। কিন্তু ফাদারের প্রতি মনসুরের শ্রদ্ধার কোন কমতি ছিল না। ফাদার এই সত্য উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাই মানবতার আদর্শে বিশ্বাসী ফাদার মনসুরের এই প্রতিহিংসাপরায়ণতাতে বিচলিত হয়েছেন তবু প্রতিশোধের চিন্তা তার মনে আসে নি। দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ প্রশমিত করতে এই প্রতিবাদের কোন বিকল্প পথ মনসুরের সামনে খোলা ছিল না। মনসুর এঘটনা দ্বারা জনস্টন পরিবার এবং ফাদার জোহানেসকে যে শিক্ষা দিতে চেয়েছে, তার মধ্যে শুধু ব্যক্তিগত আক্রোশই সক্রিয় নয়, এর মধ্যে বিজাতীয় বিদ্বেষও বিদ্যমান। কারণ বৃটিশ শাসকদের অধীনে এদেশবাসী বারবার নিপীড়িত হয়েছে। শাসকশ্রেণির শোষণে জনজীবন যেমন নিগৃহীত হয়েছে তেমনি উভয় মহাযুদ্ধের প্রভাবে সাধারণ পরিবারে এসেছে দারিদ্র্য, শোক আর বঞ্চনা।

ধনিক-শ্রেণির বিরুদ্ধে নিম্নবিত্ত-শ্রেণি মানুষের প্রতিবাদের কাহিনি উপস্থাপিত হয়েছে 'পিঁজরাপোল' গল্পে। ঔপনিবেশিক শাসনামলে জমিদার-শ্রেণির বিরুদ্ধে এ-প্রতিবাদ ভিন্নমাত্রা লাভ করেছে। এ-গল্পে মহারাজা গঙেরীরামের পিঁজরাপোল প্রতিষ্ঠার প্রতি লেখকের তীব্র ব্যঙ্গ লক্ষ করা যায়। একটি সাদা গাভির মৃত্যুতে মহারাজা শোকাচ্ছন্ন হয়ে প্রতিষ্ঠা করেন পিঁজরাপোল-পশুর রোগ-ক্লেশ নিবারণী প্রতিষ্ঠান। এই পিঁজরাপোল-এর আয়তন প্রায় পাঁচশ বিঘা। পিঁজরাপোলকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে মহারাজা গঙেরীরামের বাংলো, বাবুদের কোয়ার্টার। কিন্তু পশুগুলোকে দেখাশোনারত চাকরগুলোর জন্য কোন পৃথক আবাসস্থল গড়ে উঠেনি। গরু-মোষের জন্য নির্মিত কোয়ার্টারে (ছোট ঘর) চাকরেরা অবস্থান করে। এখানে নাইট উপাধিধারী আসাদ আলীর গাভি থাকে মশারির মধ্যে। কিন্তু কর্মচারীদের জন্য কোন মশারির ব্যবস্থা নেই, বরং তাদেরকে পশুদের থেকেও নিম্ন পর্যায়ে জীবন যাপন করতে হয়। খানবাহাদুর গওস মাহমুদ এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম

Dhaka University Institutional Repository

সদস্য। পশুর ক্লেশ নিবারণী প্রতিষ্ঠান স্থাপন করলেও এখানে কর্মরত কেরানি ও রাখালদের পেটের ক্লেশ নিবারণের কোন ব্যবস্থা করেননি গণ্ডেরীরাম। প্রভুভক্ত মারু মিয়া বিশ বছর যাবত বিশ টাকা বেতনের চাকরি করে। ধীরে ধীরে পিঁজরাপোলের অনেক কিছুর পরিবর্তন হলেও মারু মিয়ার বেতন বাড়েনি। তাই তার ভাগ্যের কোন পরিবর্তন হয়নি। গল্পের ভাষায়:

> সে ভেবেছিল তার বেতন বাড়বে একদিন। এক কুড়ি টাকায় সে এই প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করে। আরো কুড়ি বছর পরে পিঁজরাপোল বেড়েছে। কিন্তু মারু মিয়ার বেতন তেমনি অচল দাঁড়িয়ে আছে।[২৫]

'পিঁজরাপোল' গল্পে বাসেদ ও মারু মিয়ার জীবনচেতনার অনুষঙ্গে ব্যক্তি ও সমাজের বিপ্রতীপ অবস্থান চিহ্নিত হয়েছে। মারু মিয়ার পিতৃসুলভ আচরণের পাশে বাসেদের চৌর্যবৃত্তি, বেপরোয়া আচরণ, চুরি করা দুধ বিক্রি করে কাঁচা পয়সা উপার্জন এবং বাবুদের মেয়ের সঙ্গে গোপন প্রণয় প্রভৃতি আচরণের মধ্য দিয়ে বাসেদ জীবন উপভোগ করে। আবাল্য দারিদ্র্যলাঞ্ছিত বাসেদ প্রায়শ হয়ে উঠেছে মনুষ্য বিদ্বেষী। মারু মিয়ার প্রভুভক্তি ও মানবিকতা লক্ষ করে সে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলেছে:

> চুপ করো বড়ো মিয়া। মানুষের জন্য এত দরদ। তোমার মত আমার মত গরীবের জন্য কারও দয়া আছে? গরীবদের কেউ নেই। কোয়ার্টারের ঐ আধ গরীব বাবুরা পর্যন্ত নয়।[২৬]

এই উক্তির মধ্য দিয়ে প্রতিবাদী বাসেদের মানসিক অবস্থা প্রত্যক্ষ করি। গল্পে দেখা যায় বাসেদ পিঁজরাপোলের রুগ্ন গাভীর দুধ বিক্রি করে এবং এ কাজে মারু মিয়াকে সাথী করতে চায়। চুরি করে দুধ বিক্রি করার মাধ্যমে বাসেদ অতিরিক্ত অর্থ উপার্জন এবং উচ্চবিত্ত মানুষদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে বদ্ধ-পরিকর। গল্পের ভাষায়:

> দুধ বিক্রী করব। পয়সা আসবে, মজাসে দিন চলবে। তবে মনে রেখো, গরীবরা মরবে না। গরীবরা দুধ কিনে খাবে। ক্ষেপে গেছ, বড়ো মিয়া! কিন্‌বে ঐ কোয়ার্টারের বাবুরা, গণ্ডেরীরাম, আর শহরের মাঝামাঝি গেরস্থরা। মরুক ওরা। ওদের আমি সহ্য করতে পারি না। গরীবের ছেলেরা দুধ খেতে পায় না, মায়ের শুক্‌নো মাই চোষে। ওরা চায়ে দুধ খায়।[২৭]

'পিঁজরাপোল' গল্পের বাসেদ এবং 'থুতু' গল্পের মনসুর এই দুটি চরিত্রের মধ্যে আমরা মিল প্রত্যক্ষ করি। মনসুর যেমন খাদ্যের সাথে থুতুর জীবাণু মিশ্রণের মাধ্যমে শোষক-শ্রেণির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়, বাসেদও তেমন কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত গরুর দুধ পান করিয়ে শোষক শ্রেণিকে ধ্বংস করতে চেয়েছে। কিন্তু মনসুর ও

Dhaka University Institutional Repository

বাসেদ উভয়েই প্রতিবাদ ও প্রতিশোধের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছানোর পূর্বেই নিজের অবস্থান থেকে বিচ্যুত হতে বাধ্য হয়। কিন্তু তারপরেও উভয় গল্পে বঞ্চিত মানুষের প্রতিবাদের রূপ চিত্রিত হয়েছে সার্থকভাবে।

পিঁজরাপোল (১৩৫৮)[২৮] গ্রন্থের 'কাঁথা' গল্পে বস্ত্রসমস্যার মর্মস্পর্শী চিত্র ফুটে উঠেছে। অভাবের সংসারে সামান্য শীতবস্ত্র কিংবা কাঁথা বালিশ জোটান কি যে সমস্যা, তা ভুক্ত ভোগীরাই জানেন। দরিদ্র কৃষক লতিফের এক মাত্র ছেলে মানু বাজারের থলি জড়িয়ে শীত নিবারণ করে। বস্ত্রের অভাবে তার স্ত্রী কাঁথা জড়িয়ে বসে থাকে একমাত্র শাড়ী রৌদ্রে শুকাতে দিয়ে। লতিফের বাবার আমলের একটি কাঁথা ছিল। তার বাবা খাদেম আলি যক্ষা-রোগী ছিলেন। লতিফের স্ত্রী বরু-বিবি শ্বশুরের ব্যবহৃত কাঁথাটি ছেলেকে ব্যবহার করতে দিতে নারাজ। একদিন মাঠ থেকে এসে লতিফ দেখে বরু-বিবি পুরাতন কাঁথাটি সেলাইয়ের উদ্দেশ্যে খুলে তার মধ্যে একটি নতুন শাড়ি আবিষ্কার করে। নতুন শাড়ি পেয়েও বরু-বিবি কান্নাকাটি করে। কারণ ছেলের জন্য কাঁথা সেলাই করতে গিয়ে প্রাপ্ত শাড়ি সে কি করে পরবে ভেবে পায় না। অথচ তারও লজ্জা নিবারণের জন্য আরেকটি শাড়ির প্রয়োজন। বরু-বিবির কথার মাধ্যমে বস্ত্র সমস্যার করুণ চিত্র ফুটে উঠেছে। গল্পের ভাষায়:

> মানুর তরে খুইল্‌ছিলাম। ওর কাঁথা বানামু। শক্ত ছিলো কাপড়খান্। নিজের কামে লাগাইলাম। একডা পুলা। হে'ও থলি গায়ে দি' রাত কাটায়। আমারে মা কও?[২৯]

বরু-বিবির উক্তির মাধ্যমে গল্পকার সন্তানের জন্য দরিদ্র মায়ের অন্তর্যন্ত্রণাকে ফুটিয়ে তুলেছেন। এই অপরিমেয় দুঃখচিত্রের গল্পটি চিত্তাকর্ষক ও শিল্পনিপুণ। গ্রামের দরিদ্র মানুষের বস্ত্র সমস্যার করুণচিত্র এ গল্পে ফুটে উঠেছে সার্থকভাবে।

জুনু আপা ও অন্যান্য গল্পের (১৩৫৮) 'নতুন জন্ম' গল্পে জেলে ফরাজ আলী ও তৎপুত্র আক্কাসের বস্ত্রসমস্যার একটি নগ্ন চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। ঠাণ্ডা ঝড়ো হাওয়া ও বৃষ্টির মধ্যে গোমতী নদীতে মাছ ধরে দুই পিতা-পুত্র ঘরে ফিরে স্বস্তি পায়নি। জোয়ারের পানিতে জলমগ্ন ঘর ছেড়ে তারা বাঁধে আশ্রয় নেয়। আক্কাস-এর পরণের বস্ত্রটি শুকনো থাকলেও উদোম গায়ে সে কাঁপতে থাকে। ফরাজ আলীর পরিধেয় বস্ত্র ভিজে গেলে কাঁথা জড়িয়ে লজ্জা নিবারণ করে। ছেলেকে কাঁপতে দেখে বিবস্ত্র ফরাজ আলী আক্কাসকে কাঁথার মধ্যে টেনে নেয়। নিজের অসহায়ত্ব এবং লজ্জা ঢাকার জন্য বলে:

> সরম না করস। আঁই তোয়ার পোলা ন, বা-জান?[৩০]

Dhaka University Institutional Repository

ফরাজ আলীর সস্নেহপূর্ণ উক্তিটির মধ্যে প্রবল আত্মবেদনার স্পর্শ পাওয়া যায়। বিবস্ত্র পিতার কাঁথার মধ্যে পুত্র ঢুকতে যেন লজ্জা অনুভব না করে, এ জন্য সে পুত্রের কাছে নিজেই পুত্র হতে চেয়েছে।

জুনু আপা ও অন্যান্য গল্প গ্রন্থে গ্রাম নদীর পটভূমিকায় নরনারীর সুখ, দুঃখ, প্রেম, বিচ্ছেদ, সঙ্কট, সংঘাত এবং তাদের প্রাতিস্বিক অস্তিত্ব সংগ্রামের গৌরবময় জীবনাভিজ্ঞতা শিল্পরূপ লাভ করেছে। 'জুনু আপা' শওকত ওসমানের প্রথম বয়সের রচনা। একজন প্রাণোজ্জ্বল তরুণীকে একজন সংসার অনভিজ্ঞ কিশোর যেভাবে পর্যবেক্ষণ করেছে তারই অভিব্যক্তি প্রকাশিত হয়েছে এ গল্পে। বিভুতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়-এর 'পথের পাঁচালি'র অপু যেমন সংসারকে, প্রকৃতিকে তার নিজের গ্রাম নদী তীর লতাপাতায় ঘেরা চিরচেনা জগৎকে অপার বিস্ময়ে দেখত তেমনি 'জুনু আপা' গল্পের কথক সেলিমও নিজের পরিবেশ ও পরিজনকে দেখেছে এবং আবিষ্কার করতে চেয়েছে তাদের রহস্য। 'জুনু আপা' গল্পে গল্পের কথক সেলিমের বাড়িতেই থাকত জুনু আপা। তার দূর সম্পর্কীয়া খালাত বোন হত সে। সেলিমেরই চাচাতো ভাই জসীমের সাথে তার সম্পর্ক হয়েছিল। কিন্তু চাচি অন্যত্র ছেলেকে বিয়ে দিলে মোটা অঙ্কের যৌতুক পাবে, তাই জুনুর সঙ্গে জসীমের বিয়েতে সায় দেয়নি। তার বাধা ও বিরোধিতা অবশেষে দুজনকে পৃথক করে দেয়। অন্যত্র বিয়ে হলেও দুশ্চরিত্র স্বামীকে জুনু নিজেই তালাক দেয়। খালা-খালুর কটু-কথা সহ্য করতে না পেরে একদিন সে বাড়ি থেকে উধাও হয়ে যায়। তারপর সাত বছর নানা চড়াই-উৎরাই পার হয়ে এক প্রৌঢ় লোক মালেক সাহেবের সঙ্গে এক ভগ্ন রাজপ্রাসাদে তার সন্ধান পাওয়া গেল :

> বিজন অরণ্য মনে হয় গ্রাম। আশ-পাশে কোন বস্তি নেই। মাঠের পর মাঠ, বক্ষ-জোড়া ক্ষুদ্র বন-সহ ধূ ধু করছে। নির্ব্বাসিতের জীবন জুনু-আপার। এই জানালায় দাঁড়িয়ে জুনু-আপা হয়ত কত চোখের পানি ফেলে। কেউ সাক্ষী থাকেনা তার। বন্ধ্যা, ধূসর মরু-জীবন। অথচ এই জীবনে কত কিছুইনা বিকাশের সম্ভাবনা ছিল।[৩১]

নারী হৃদয়ের অকথিত বাণী নিয়ে যে গল্পটি সর্বাপেক্ষা পাঠককে আকর্ষণ করে তা হল 'জুনু আপা'। 'গথের পাঁচালি' ছাড়া 'জুনু আপা' চরিত্রে কিছু মিল পাওয়া যায় শরৎচন্দ্রের *শ্রীকান্ত'র* অন্নদা দিদির সঙ্গে। ঘটনার ব্যাখ্যায় এই মিল নিরূপ:

> শ্রীকান্ত ছিল ইন্দ্রনাথের একমাত্র সহচর। ইন্দ্রের সঙ্গে রাত্রে নৌকায় চড়ে নানা জায়গায় যেতে হোত। এই রকম নৈশ ভ্রমণে এসেই অন্নদা দিদিকে দেখতে পেয়েছিল। অন্নদা দিদি ছিলেন প্রকৃতপক্ষে সতীসাধ্বী রমণী। কিন্তু ঘটনাক্রমে তাঁকে গৃহত্যাগ করতে হয়েছিল। অথচ তিনি স্বামীর সঙ্গেই গিয়েছিলেন। কিন্তু সবাই জানল অন্নদা কুলত্যাগ করেছে। স্বামী শাহজী মুসলমান। সুতরাং তিনি ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন।[৩২]

Dhaka University Institutional Repository

জুনু আপার জীবনেও এই একই ধরণের রহস্য লক্ষ করি। জুনু আপার শেষ পরিণতি লক্ষ করার জন্য শ্রীকান্তের ভূমিকায় যেন গল্পের কথক অবতীর্ণ হন। জুনু আপা বাড়ী থেকে নিরুদ্দেশ হবার বহু বৎসর অতিক্রান্ত হওয়ার পর গল্পকথক সেলিম জুনু আপার কাছ থেকে একটি চিঠি পেয়েছিল। সেলিম তখন গ্রাম্য স্কুলের শিক্ষক। সেলিম ঠিকানা মিলিয়ে জুনু আপার বাড়ীতে এল। গল্পকথকের ভাষায়:

> এই তোমার নতুন বাড়ী, জুনু আপা? চারিদিকে চোখ মেলে চাই। ভিটার উপর উঠ্‌তে পৈঠা অতিক্রম করতে হয়। দুর্ব্বা- ঘাসে ঢাকা। মাথার উপর হুমড়ি-খাওয়া ছোট ছোট গাছ। সাপের ভয় পদে পদে। কয়েক পা এগিয়ে এসে ভাঙ্গা দেওড়ীর ফটক পেয়েছিলাম। এদিকের থাম ভাঙ্গা; তার উপর হাজার জংলা লতার গাছ। আর একদিকের অবস্থা সেইরূপ। শুধু দুটো থাম। উপরে তোরণের কোন চিহ্ন নেই। পথই পথ চেনায়। একটু অগ্রসর হোয়ে দেখেছিলাম, একটা ছোট কোঠা বাড়ী। জীর্ণ, পুরাতন; ক্ষয়ের প্রত্যেকটা উপসর্গ করুণ হোয়ে ফুটেছে। দোতালা বাড়ীটা। নীচে চাতালের আশেপাশে জঙলা দুটো লোহার খুঁটির মাঝখানে একটা বাঁশের বেড়া। ফটকও সেটা।[৩৩]

জুনু আপার এই অদ্ভুত বাড়ীর সঙ্গে 'শ্রীকান্তের' অন্নদা দিদির পর্ণকুটিরের মিল আছে। মা-বাবা থাকা সত্ত্বেও লোকালয় থেকে দূরে সাপুড়ে মুসলমান স্বামীর সঙ্গে সংসার পাততে হয়েছিল অন্নদা দিদিকে। জুনু আপার দুর্গম জঙ্গলে বাস অন্নদা দিদিকে মনে করিয়ে দেয়। বর্তমান স্বামীর কাছে জুনু আপা শেষ পর্যন্ত একটা সত্যিকার আশ্রয় পেয়েছিল। জমিদারের উত্তরাধিকারী হয়েও তিনি ছিলেন দয়ালু মানুষ। যার কারণে প্রজাদের সমস্ত খাজনা তিনি মওকুফ করে দিতেন। জুনু আপার স্বামী মালেক সাহেবের বদান্যতার পরিচয় পেয়ে তাকে সেলিমের খুব পছন্দ হয়েছিল এবং জাগতিক জীবনের সমস্ত সুখ বঞ্চিত জুনু আপা অবশেষে অরণ্যচারিণী হলেন।

'শ্রীকান্তের' অন্নদা দিদি এবং 'জুনু আপা' গল্পের জুনু আপা দু'জনেই নিজেদের বিবেকের কাছে নিষ্পাপ ছিলেন। কিন্তু দু'জনকেই আত্মীয় পরিজন পরিচিত লোকালয় ত্যাগ করতে হয়েছিল। অন্যদিকে সমাজের কাছেও তারা ছিলেন নিন্দিতা। কিন্তু দু'জনই তাদের ভাগ্যকে দোষারূপ করেননি। গভীর রহস্যে ভরা এই দুই নারী চরিত্র অঙ্কনে লেখকদ্বয় সার্থকতার পরিচয় দিয়েছেন।

ব্যক্তির স্বপ্ন ও বিনষ্টির কল্পময় অনুভবে জুনু আপা গল্পটি বেদনাবহ হলেও ব্যক্তির অনমনীয় শক্তির উদ্বোধনে 'নতুন জন্ম' গল্পটি বিশিষ্ট। নদী মানবসভ্যতার বিকাশে প্রাণদায়িনী বা গতির প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। তবে, এর ধ্বংসযজ্ঞ বা ভাঙনলীলাও মনুষ্য জীবনে সুদূরপ্রসারী। তাই, নদীকে নারীর

Dhaka University Institutional Repository

সাথেও তুলনা করা হয়। নদী কাউকে নতুন আশাভরা জীবন দান করে, আবার নদীর সাথে সংগ্রামে হেরে গিয়ে কেউ হয় বাস্তুহারা। *জুনু আপা ও অন্যান্য গল্প* গ্রন্থের 'নতুন জন্ম' গল্পটিতে দেখা যায়–দূরন্ত দুর্বিনীতা গোমতী নদীর সঙ্গে ফরাজ আলী ও তৎপুত্র আক্কাস আলীর অন্তরঙ্গ আত্মীয়তা গড়ে উঠে। পিতা-পুত্র দু'জনে মিলে নদীতে মাছ ধরে জীবন অতিবাহিত করে। কিন্তু নদী তার স্বভারের দোষে মাঝে মাঝে ক্ষেপে যায়। কখনো কখনো বন্যায় ভাসিয়ে নেয় তার দুই তীর। কখনো ঝড়ে বিপর্যস্ত করে তোলে জনজীবন। ফরাজ আলী ও তার পুত্র আক্কাস গোমতীর রুদ্র মূর্তির সাথে সংগ্রাম করে জীবন অতিবাহিত করে। ফরাজ আলীর এই আত্মীয়তার সম্বন্ধকে কোন মূল্য না দিয়ে গোমতী তার স্বভাবজাত ভঙ্গিতে অসহায় পিতা-পুত্রের ভিটে প্লাবিত করে। এ অবস্থায় প্রতিবেশী ব্যক্তিটি যখন ফরাজকে বলে :

চলেন মিয়া বাই, চইলা যাই এহান থেইক্যা, তখন ফরাজ আলী নির্বিকারে গোমতীর দিকে ইঙ্গিত করে বলে:

> যামু কোথা? এই হালীর লগে বড় পীরিত, আর কোথাও মন যায় না।[৩৪]

'নতুন জন্ম' গল্পের ফরাজ আলী চরিত্রটি নদী বিধৌত সংগ্রামশীল মানুষের আশাবাদী অস্তিত্বের প্রতীক। গোমতীর তীব্র প্লাবনকে উপেক্ষা করে একদিন ফরাজ আলী প্রথমে বাঁধে আশ্রয় নেয়। নতুন জীবনের অন্বেষায় শহরে যাবে বলে সে অপেক্ষা করে বাঁধের ওপর নতুন ভোরের প্রতীক্ষায়। জীবন সম্পর্কে এই আশাবাদী চৈতন্য এই পর্বের গল্পে উচ্চকিত হয়ে উঠেছে।

'সাদা ইমারত' গল্পে হাসিনা নাম্নী এক স্বামী পরিত্যক্তা নারীর মর্মন্তুদ চিত্র ফুটে উঠেছে। ব্যাধির কারণে স্বামী তাকে পরিত্যাগ করলে বিত্তহীন বাবা কালুর বাড়িতে তাকে আশ্রয় নিতে হয়। তার বাবা কালু মাঝে মাঝে চুরি করত লোকের বাড়িতে। হাসিনা বাবাকে এ সব কাজের জন্য ঘৃণা করত। একদিন কলা চুরির কাজে কালু হাসিনাকে সংগে নিয়ে যায়, কিন্তু পথে মারাত্মক খেজুরের কাঁটা পায়ে বিদ্ধ হলে হাসিনা সাদা ইমারতের হাসপাতালে অবস্থান নেয়। কাঁটার যন্ত্রণা দূরীভূত হলেও তার গায়ে বসন্ত বের হয়। ডাক্তার বসন্ত রোগীকে হাসপাতালে রাখতে অসম্মত হয়ে তাকে বাড়ি পাঠিয়ে দেন। বাড়িতেই বিনা চিকিৎসায় হাসিনার মৃত্যু হয়। হাসিনার সমাজ পরিবার তাকে শুধু আশ্রয়চ্যুতই করেনি, বেঁচে থাকার শেষতম অধিকার থেকেও বঞ্চিত করেছে। লেখকের ভাষ্য:

> শ্বেত মর্মরের দৈত্যপুরী। কারা বিচরণ করে তার প্রাঙ্গনে? তালপাতা দাওয়া মাটির ঘরে যারা মাস, বর্ষ, অনন্ত কাটায়, তাদের চোখে প্রাসাদের অঙ্গন কেমন করিয়া প্রতিভাত হয়।[৩৫]

Dhaka University Institutional Repository

উপরিউক্ত গল্পে দারিদ্র্যের কষাঘাত একজন নারীর জীবনকে কিভাবে সংকটাপন্ন করে তোলে এবং তাকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয় তার চিত্র দেখতে পাই। লেখক এ গল্পে নারীর বেদনাময় অবমাননাকর প্রতিচ্ছবি তুলে ধরেছেন সার্থকভাবে।

ধন-সম্পদের অসমবন্টন ও শোষন-বঞ্চনা অভাব দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ। আমাদের দেশে যুগ যুগ ধরে সামন্তবাদী শোষণ থেকে বর্তমানে পুঁজিবাদী শোষণের নানা খাদ-খোঁড়ল প্রতীয়মান। শওকত ওসমান তাঁর সমকালীন জীবনপ্রবাহ থেকে শোষণবঞ্চনা ও অত্যাচারের নানাচিত্র অঙ্কন করেছেন তাঁর ছোটগল্পে। সমাজের নিম্ন পেশাজীবীরা কিভাবে মৌলিক চাহিদা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, লেখক ব্যাপারটি গভীরভাবে অনুধাবন করেছিলেন বলেই তাঁর সৃষ্টিকর্মে সত্যের বলিষ্ঠতা প্রকাশে সক্ষম হয়েছেন।

শওকত ওসমান তাঁর *সাবেক কাহিনী* (১৯৫৩)[৩৬] গল্পগ্রন্থে সমাজ সমস্যার কয়েকটি চিত্র উদঘাটন করেছেন। সামাজিক ও প্রাকৃতিক বৈরিতার বিরুদ্ধে জাগ্রত নর-নারীর গভীর প্রতিক্রিয়া ও অস্তিত্ব সচেতনতা *সাবেক কাহিনী* গ্রন্থের অন্যতম লক্ষণ। গ্রাম জীবনের শঠতা, প্রতারণা, ধর্মের নামে ভন্ডামি, দুর্ভিক্ষ, শোষণ জমিদারের হৃদয়হীনতা এই গ্রন্থে নানা মাত্রায় চিত্রিত হয়েছে। শোষণ নির্ভর সমাজের আভ্যন্তরীণ বৈষম্য এবং প্রান্তিক উন্মুলিত গ্রামীণ মানুষের ক্ষীণ অস্তিত্বের রূপায়ণে লেখকের মানবজীবনবীক্ষা ও সমাজ পর্যবেক্ষণশক্তি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

সমাজ অভিজ্ঞ শওকত ওসমান তাঁর ছোটগল্পে নিপীড়ক ও নিপীড়িতদের বহুমাত্রিক চিত্র উন্মোচণ করেছেন। ইতিহাস পর্যালোচনায় আমরা দেখতে পাই 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' (১৭৯৩) ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে ব্রিটিশ ঔপনিবেশ শক্তি এদেশে নতুন জমিদারতন্ত্রের সৃষ্টি করে। সমাজসচেতন গল্পকার শওকত ওসমান তাঁর *সাবেক কাহিনী* গল্পগ্রন্থের 'বকেয়া' গল্পে জমিদারতন্ত্রের নিষ্পেষণের মর্মান্তিক কাহিনি তুলে ধরেছেন। দুই সনের খাজনা বাকি পড়ায় জমিদারের সাবেক পেয়াদা পাঁচু জমিদারের নিষ্ঠুর অত্যাচারে তার পৈতৃক ভিটা থেকে নির্বাসিত হয়। অন্যদিকে বিনা চিকিৎসায় অনাহারে পাঁচুর মেয়ে টুনিও মারা যায়। মেয়ের নির্মম মৃত্যুতে পাঁচু ভেঙ্গে পড়ে। কিন্তু সে রাতের আধারে তার মেয়ের মৃতদেহ জমিদারের পুকুরে কলার ভেলায় ভাসিয়ে দেয়। টুনির মৃত্যুর জন্য যে জমিদার দায়ী, সে পুকুরে ভাসমান টুনির মৃতদেহকে সরস্বতীর আশীর্বাদ হিসেবে গ্রহণ করে এবং তিনশত টাকা খরচ করে তার সৎকারের ব্যবস্থা করে। কুড়ি টাকা খাজনা বাকি পড়ায় যে জমিদার তার পেয়াদা পাঁচুকে বাস্তুভিটা থেকে উচ্ছেদ করে, সেই আবার টুনির মৃতদেহকে সরস্বতীর আশীর্বাদ ভেবে তিনশত টাকা খরচ করে সৎকার করতে কার্পণ্য করে না। লেখকের ভাষায়:

Dhaka University Institutional Repository

সেদিন সকালে দেখা গেল জমিদার বাবুর খাস পুস্করিণীতে একটা কলার ভেলা ভাসিতেছে, তারই উপর একটা ছোট্ট মেয়ে শায়িত। হাতে তার পদ্মের মৃণাল একটি ফুটন্ত পদ্ম। কলার ভেলাটি যেন রূপের আলোয় ঝলমল করিতেছে। তীর হইতে সকলে দেখিল, সেই শিশু মূর্তি। গৌরতনু সাদা কাপড়ে ঢাকা। চোখ দু'টা এখনও খোলা, সমস্ত আকাশের নীল যেন তারকার পটে সঞ্চিত। অটুট দীপ্তি চারিদিকে তবু মুখটা ফ্যাকাশে, বড় করুণ মনে হয় আঁখি-পল্লব-ছোঁয়া স্তিমিত দৃষ্টিটুকু। জমিদার বাবু এই দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন। জমিদার বাড়ীর পুরোহিত বলিলেন : মা সরস্বতীর ছলনা। কার ভাগ্যে কোন জমিদারের ভাগ্যে এমন ঘটে, দেখ্ছো না মার হাতের পদ্মের মৃণালটা এখনও তাজা। মায়ের শরীরের রঙের মত পদ্মের মৃণালের রঙ। জমিদার বাবু গলার উড়ানি জড়াইয়া বার বার মাকে প্রণাম করিলেন। ভক্তিগদগদ হৃদয়। তাই দুই চক্ষুর অশ্রু উপচিয়া পড়িল।[৩৭]

এ গল্পে জমিদারতন্ত্রের শোষণনীতি এবং ভণ্ডামিকে প্রতীকের অন্তরালে প্রত্যক্ষ করি। বস্তুত এ গল্পে জমিদারের অত্যাচারে পাঁচু পেয়াদার আবাসভূমি থেকে উৎখাত এবং টুনির জীবনাবসানের চিত্র প্রতিবিম্বিত হয়েছে।

'তুচ্ছ স্মৃতি' (*সাবেক কাহিনী*) গল্পে বাৎসল্য ও করুণ রসের সমন্বয় ঘটেছে। গল্পে দেখা যায় আহাদ মিয়া তরমুজ ক্ষেতে এসে পুরানো দিনের স্মৃতিচারণ করে। তার মেয়ে জাহানারা গত বছর মারা যায়। কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে সে তরমুজ খেতে চেয়েছিল। অভাব-অনটনের সংসারে জাহানারার বাড়তি কোন চাহিদা ছিল না। শুধু মৃত্যুর পূর্বে তার বাবার কাছে তরমুজ খাবার বায়না করেছিল যা মেটানো দরিদ্র বাবার পক্ষে সম্ভব হয়নি। এই না পারার কষ্ট জাহানারার মৃত্যুর পরও তার বাবার মনে রয়ে গিয়েছিল। এ গল্প স্বভাবতই বিভুতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুঁইমাচা'-কে স্মরণ করিয়ে দেয়। 'পুঁইমাচা' গল্পে সহায়হরিও তার সংসার অনভিজ্ঞা মেয়ে ক্ষেন্তির জন্য কাতর ছিলেন। জাহানারা ও ক্ষেন্তি দু'জনই বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছিল। ক্ষেন্তি শ্বশুরবাড়ীতে এবং জাহানারা নিজের বাড়ীতে রোগাক্রান্ত হয় এবং মৃত্যুবরণ করে। কিন্তু তাদের স্মৃতিকে জাগ্রত রেখেছিল তরমুজ ক্ষেত ও পুঁইমাচা। লেখকের ভাষায় জাহানারা ও তার বাবার উক্তি:

জ্বরের ঘোরেই সে বলেছিল, আব্বা, একটু তরমুজ দাও।

-তরমুজ যে খেতে নেই, মা। কবরেজ বারণ করেছে।

-না আমাকে তরমুজ দাও- তরমুজ দাও-

চীৎকার ফেটে পড়ছিল দীর্ণ খড়োঘরের দাওয়া ছাড়িয়ে প্রাঙ্গণের সীমানার বাইরে।

ঝুটা অজুহাত খুঁজে পেয়েছিল পীড়িত পিতৃ হৃদয় : এত রৌদ্রে মাঠে যেতে নেই।

-যেতে আবার নেই। মায়া থাকলে বুঝি রোদ মানে। পাকা গিন্নীর ঠোঁট।

কচি ওষ্ঠের সেই শেষ মুখর গুঞ্জরণ।[৩৮]

Dhaka University Institutional Repository

'তুচ্ছ স্মৃতি' ও 'পুঁইমাচা'-এ দুটি গল্পেই আছে অত্যন্ত সাধারণ জীবনের ছবি। "কিন্তু গল্পগুলো অবিনশ্বর জীবনের স্মারকরূপে উপস্থাপিত। দুটি গল্পেরই উপসংহার মানবজীবনের বাস্তব কারুণ্য থেকে উৎসারিত। পিতৃহৃদয়ে সন্তান হারানোর ব্যথা সর্বজনীন দুঃখ হয়ে দেখা দিয়েছে। গল্পের সাফল্যও এইখানে।"[৩৯]

ভাত-কাপড়ের সমস্যার পর চিকিৎসা প্রসঙ্গ আছে তাঁর গল্পে। এটাও মানুষের মৌলিক চাহিদার অন্যতম। কবি জসীম উদ্‌দীন তাঁর বিখ্যাত 'পল্লীজননী' কবিতায় গ্রামীণ জননীর রোগার্ত ছেলেটির চিকিৎসাহীনতার কথা বলেছেন। তবে রসুলপুর গ্রামের আসমানীর পেটে পিলেই রয়েছে এবং প্রতিদিন জ্বর আসে। ঔষধ কেনার টাকা নেই সে খবর তিনি দিয়েছেন:

> পেটটি তাহার দুলছে পিলেয়, নিতুই যে জ্বর তার,
> বৈদ্য ডেকে ঔষধ করে পয়সা নাহি আর।[৪০]

আবহমান বাংলার গ্রামীণ দারিদ্র্যের মধ্যে চিকিৎসা সমস্যা প্রবল ছিল। শওকত ওসমানের *সাবেক কাহিনী* গ্রন্থের 'প্রতীক্ষা' গল্পে নিম্নবিত্ত চাষি বাকের ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে ফির-অভাবে ডাক্তার দেখাতে পারেনি। মাসের পর মাস বিছানায় শুয়ে থেকে তার দুর্ভোগ বেড়েছে। গ্রামের পীর মখদুম-এর কাছে আট বছর যাবৎ একমাত্র অবলম্বন তিন বিঘা জমি ৬০ টাকায় বন্ধক ছিল। তাঁর অন্তিম ইচ্ছা পীরের মুরিদ হয়েই সে মারা যাবে। মৃত্যুর পরে পীর সাহেব অবশ্য বাকেরের কবর জিয়ারত করেছিল।

প্রস্তর ফলক গ্রন্থের 'প্রতিবেশী' গল্পে ওয়াহেদ আলি যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হয়ে বিনা চিকিৎসায় নিঃসঙ্গভাবে মারা গেছে। চাকুরি না করলে গ্রামে স্ত্রী পুত্র-পরিজনের কাছে টাকা পাঠানো যাবে না। অথচ চাকুরির স্থলে রোগের কথা জানাজানি হলে চাকুরি যাবারও সম্ভাবনা ছিল। ফলে একদিন ঘরে কাশতে কাশতে দম বন্ধ হয়ে সে মারা গেছে। নিম্নবিত্ত চাষির মতই নিম্নবিত্ত চাকুরিজীবীরাও এ রকম নানা মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে পারে না।

বাংলার দুর্ভিক্ষচিত্র শওকত ওসমানের ছোটগল্পে নানাভাবে প্রকটিত হয়েছে। শওকত ওসমান দুর্ভিক্ষ নিয়ে লিখেছেন *ডিগবাজী*[৪১] গ্রন্থের 'একশ বছর পরে', *প্রস্তর ফলক* গ্রন্থের 'আজব জীবিকা', *নেত্রপথ* গ্রন্থের 'ব্ল্যাকআউট'। 'একশ বছর পরে' গল্পে শওকত ওসমান 'পঞ্চাশের মন্বন্তরের' প্রসঙ্গ এনেছেন। গল্পবুড়ি

Dhaka University Institutional Repository

দেয়াশিনী মারফত ছোট ছোট বাচ্চাদের কাছে পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষের কারণ ও দুর্ভিক্ষের হোতাদের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে:

> একশ' বছর বাংলাদেশে চোরের সংখ্যা বেড়ে গিয়েছিল। তখন চোরের দল শুধু চুরি-ই করত না, তার জন্য তারা রায়-বাহাদুর, খান বাহাদুর উপাধি পেত । তখনকার যুগের খেতাব আরো ছিল স্যার, নাইট ইত্যাদি।[৪২]

দেয়াশিনী আরও বলেছে:

> (তখন) হাজারে একজন পেটপুরে খেত। ন'শ' নিরানব্বই জন কোন রকমে এক-আধবেলা খেয়ে বাঁচত। যারা পেট পুরে খেত, সব খাবার জমা হোত তাদের ভাঁড়ারে। বাকী কেউ পেত না। কুকুরের পেছনে তারা যা খরচ করত, মানুষের জন্য তাও জুটত না।[৪৩]

দেয়াশিনী পঞ্চাশের সেই ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের বর্ণনা করেছে শিশু কিশোরদের কাছে। দুর্ভিক্ষের ছবি একেঁছেন সেই যুগের শিল্পীরা। তাতে দেখা যাবে:

> কুকুর আর মানুষ ডাস্টবিনে একসঙ্গে খাচ্ছে। ময়লার দোকানের পাতা চাটছে কেউ। আর চোরের দল, যাকে বলবে জানোয়ারের দল, হাজার লাখ টাকা খেয়ে-দেয়ে ওড়াচ্ছে।[৪৪]

শওকত ওসমান কৌশলে ১৪৬০ সালের বঙ্গাব্দের শ্রাবণের সন্ধ্যায় দেয়াশিনীর মুখে গল্প আরম্ভ করেছেন। বিষয় গম্ভীর হলেও বর্ণনার মধ্যে সহজতা প্রতীয়মান। দুর্ভিক্ষের সময় ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর লোকজন অনেক সময় নদী কি দহে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করত। এ রকম একটি দহের উপরে ব্রীজ পাহারা দেয়ার চাকুরি পেয়েছিল নফিস। 'আজব জীবিকা' গল্পে ১৩৫০ এর দুর্ভিক্ষের প্রেক্ষিতে লেখক এরূপ একটি বিষয়ের অবতারণা করেছেন। গল্পের শহরগামী কথক দেড় বছরের একটি শিশুসহ এক প্রসূতির আত্মহত্যা করার ব্যর্থ মহড়াও প্রত্যক্ষ করেছেন। পাহারাদার নফিস তাকে বাঁচাতে সক্ষম হয়েছিল। *নেত্রপথ*-এর 'ব্ল্যাকআউট' এ বর্ণিত হয়েছে এক অষ্টাদশীর করুণ চিত্র। ১৩৫০ এর ভয়াল দুর্ভিক্ষে যখন দলে দলে লোক মারা যাচ্ছে-গ্রাম থেকে ফ্যানের জন্য আর্তচিৎকারে মানুষ ছুটে আসছে শহরে, এ সময় একদিন সন্ধ্যালগ্নে এক অষ্টাদশী যুবতী গল্পের কথকের কাছে সাহায্য চায়। কথক পকেট থেকে একটি টাকা বের করে দিলে যুবতী ঋণ শোধের উপায় খুঁজতে থাকে। সে তো ভিখিরিনী নয়। তাই সে সাহেবের ওজর আপত্তি না শুনেই বাসায় যেতে চায়। সাহেবের ইজ্জতের ভয় থাকলেও আজ তার ইজ্জতের ভয় নেই। প্রস্তাব দিয়ে যুবতী মেয়েটি আঁচলে মুখ ঢেকে কাঁদতে থাকে। এ গল্পে শওকত ওসমানের দেখা পঞ্চাশের মন্বন্তরের প্রত্যক্ষ ছবি ফুটে উঠেছে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রাইজ ও অন্যান্য গল্প গ্রন্থের 'আকালের গল্পে' বালক সয়ীদ এর করুণ চিত্র পাওয়া যায়। দুর্ভিক্ষের সময় মায়ের কাছে খাবার চেয়ে সে মার খেত। তার ছোট বোন রাহেলাও দুধ পেত না। একদিন বাড়ি থেকে সয়ীদ পালিয়ে গাড়োয়ানদের খড়ের গাদার উপর বসে শহরে যাচ্ছিল। সয়ীদের মনে ভেসে উঠে:

> রাহেলা কাঁদে, যেহেতু মা দুধ দিতে পারে না। মাও না খেয়ে থাকে। তাই তার বুকে আর দুধ কোথা থেকে আসবে।[৪৫]

অভাব, দারিদ্র্য ও বিপর্যস্ত অর্থনীতির ছায়ায় মুহ্যমান মানুষের কাহিনি ফুটে উঠেছে *প্রস্তর ফলক* গ্রন্থের' 'বর্ণামৃত' ও 'গন্তব্য', *উভশৃঙ্গ* গ্রন্থের 'স্বগতোক্তি' ও *এবং তিন মির্জা* গ্রন্থের 'শেষ আগে শুরু হয়' গল্পে।

'বর্ণামৃত' গল্পে একজন চিত্রশিল্পী হাসিব চিত্রকর্মকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে কিভাবে পিরালি ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে, তার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। চিত্রশিল্প ছেড়ে কেবল পেটে-ভাতে টিকে থাকবার জন্য হাসিব একদিন শহরের আস্তানা থেকে উধাও হয়েছিল। এক সময়ের হাসিবের পার্টনার ও বন্ধু গল্পের কথক মফঃস্বলে গিয়ে 'হাকিম গোলাম আরহাম মাজেন্দারান দেওবন্দী' সাইন বোর্ড দেখে সেখান থেকে মাথায় কুল্লা লাগান, পাগড়ি পরিহিত শ্মশ্রুমণ্ডিত হাসিবকে আবিষ্কার করেন এবং বিভ্রান্ত পথ থেকে বুঝিয়ে তাকে পুনরায় শিল্পের জগতে নিয়ে আসেন। *প্রস্তর ফলক* গ্রন্থের অপর গল্প 'গন্তব্যে' কবি-সাংবাদিক মাবুদ চৌধুরীর অলঙ্কার বন্ধক রাখার কাহিনি বিবৃত হয়েছে। মাবুদ চৌধুরী প্রকৃতিবিলাসী হলেও পেটের ক্ষুধা নিবারণের নিমিত্ত তাকে সখের অলঙ্কার বন্ধক রাখতে হয়েছে।

উভশৃঙ্গ গ্রন্থের 'স্বগতোক্তি' গল্পে কিশোর মতলব আলী ওরফে মতুর মধ্যে দারিদ্র্যবোধ ও দুঃখচিন্তা লক্ষ করা যায়। মতু নবীন অফিসার সাদেক চৌধুরীর বাড়িতে ফায়-ফরমায়েস খাটে। তার মা সন্দ্বীপের তুফানে মারা গেছে। ঘুমের ঘোরে মায়ের স্মৃতি কিংবা বড় হয়ে বাবাকে কামাই করে খাওয়ানোর স্বপ্ন দেখে মতু। সাদেক চৌধুরী ও তার মা মতুর মুখে এসব কথা শুনে তার উপর দয়ার্দ্র হয়ে পড়ে। যারা দারিদ্র্যের মধ্যে বেড়ে ওঠে, তাদের মধ্যে দুঃখচিন্তা প্রবল হয়। শওকত ওসমান এখানে মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন। গল্প থেকে উদ্ধৃতি:

> ...বা-জান দোয়া করেন, জল্‌দি জল্‌দি বড় হৈয়া যাই...আবার ফিইরা আসুম। আমি আপনেরে রোজগার কইরা খাওয়ামু...কাঁদেন না বা-জান...সাব দশ টিয়া বেতন ধরছেন...বাড়াইয়া দেবেন...আমি কামে ফাঁকি দিই না...দইজ্জা,

Dhaka University Institutional Repository

ও দইজ্জা মারে নিলি, আমারে নিলি না ক্যান...কাঁদেন না বা-জান...আপনের কাঁদনে আমার কাঁদন আসে...মরদ পোলা শহরৎ যাওন লাগে...আমি আপনেরে খাওয়ামু...আহি বাবা, বারোড়ায় ইষ্টিমার... ।[৪৬]

উপরিউক্ত উদ্ধৃতিাংশে প্রত্যক্ষ করি মতুর দারিদ্র্যচিন্তাটি তার স্বপ্নের মধ্যেও ক্রিয়াশীল ছিল।

শওকত ওসমান মৌলিক অধিকার বঞ্চিত দারিদ্র্যপীড়িত শিশুদের জীবনজিজ্ঞাসার চিত্র অঙ্কণ করেছেন *উভশৃঙ্গ* গল্পগ্রন্থের 'নেমক-হালাল' গল্পে। "জীবন পথশিশুদের ছিন্নমূল না করলেও জীবিকা তাদের সভ্য সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ছিন্নমূল আখ্যা দিয়েছে। নিরাপত্তাহীন-ঐক্যহীন-মমতাহীন-অসুন্দরের উৎসব যেন এ-ছিন্নমূল শিশুদের জীবনে সত্য হয়ে ওঠে।"[৪৭] এইসব দরিদ্র ভবঘুরে শিশুরা তাদের পেটের ক্ষুধা মেটানোর জন্য ভিন্ন ভিন্ন পথ অবলম্বন করে। তারা যানবাহনে ভ্রমণরত যাত্রীদের খাবারের উচ্ছিষ্টাংশ, ডাবের খোলা, মিষ্টির ঠোঙ্গার মধ্যে খাদ্যের সন্ধান করে। অথচ এই অসহায় শিশুরা যাত্রীদের কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য দূরের কথা, গালমন্দ ছাড়া আর কিছুই পায় না। এই পরিস্থিতিতে তাদের শিক্ষালাভ করা অসম্ভব প্রতীয়মান হয়। তাদের উক্তিতে গল্প থেকে জানা যায়:

সাব,আমাগো এহানে ইস্কুল নাই, সব মাদরসা। অর্থাৎ মাদ্রাসা।...
মাদ্রাসা যাস না কেন?
–পাডাবো কোন হালা?
–তোর বাপ নাই?
–হে হালা থাইকলেই বা কী। খাওয়ানোর পারে না, হে হালা মাদরাসা পা-ডাইবো?[৪৮]

'নেমক-হালাল' গল্পে শিশুদের এ-গালি যেন গোটা সমাজ ব্যবস্থার উপর নিক্ষিপ্ত হয়েছে। প্রবহমান সমাজস্রোতে ভেসে চলা এই দরিদ্র শিশুরা যে খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান-শিক্ষা এবং চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত তা শওকত ওসমান এ গল্পে সার্থকভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

এবং তিন মির্জা[৪৯] গ্রন্থের 'শেষ আগে শুরু হয়' গল্পে গ্রামের দরিদ্র কৃষকসন্তান আসাদ ও তার পরিবারের দুঃখময় কাহিনি বিবৃত হয়েছে। গ্রামের ছেলে আসাদ পিতার জমি বন্ধক রেখে সাড়ে তিনশ টাকা ঘুষ প্রদান করে মোটর চালানোর লাইসেন্স পেয়েছিল। কিন্তু আসাদের সমস্ত স্বপ্ন-সম্ভাবনা অচিরেই বিপন্ন হয়। ইঞ্জিনিয়ার মিনহাজ সাহেবের কার চালাতে গিয়ে সড়ক দুর্ঘটনায় সে নিহত হয়। এই গল্পে একদিকে যেমন জমি বন্ধকের প্রসঙ্গ রয়েছে, তেমনি ধনীর প্রাচুর্য ও আভিজাত্যের জৌলুসের বর্ণনা রয়েছে। ছেলের মৃত্যুর খবর পেয়ে পিতার আহাজারি করুণ ও মর্মস্পর্শী। সে বলেছে:

Dhaka University Institutional Repository

জমিন বন্ধক দিলাম পোলার 'লাইসেনের' লাইগ্যা। ও মাবুদ-আমার জমিন গেল, আমার পোলারেও তুমি লইলা...ও আল্লারে।[৫০]

একমাত্র ছেলের উপরে নির্ভর করে পিতা জীবন-জীবিকার পথ স্বচ্ছল করার স্বপ্ন দেখেছিলেন। ছেলের মৃত্যুতে পিতার জীবনের অপরিমেয় অসহায়ত্ব ফুটে উঠেছে তার উক্তিতে।

শওকত ওসমানের আর্থ-সামাজিক চেতনাস্নাত গল্পগুলোতে বাঙালির অভাব-দারিদ্র্যের পরিপ্রেক্ষিত খুব বলিষ্ঠ ও আন্তর্প্রেরণায় নির্মিত। সর্বোপরি বাঙালির দারিদ্র্যের নানা বৈচিত্র্যমণ্ডিত চিত্র অঙ্কনে শওকত ওসমানের পারঙ্গমতা অনস্বীকার্য।

শওকত ওসমান তাঁর ছোটগল্পে সমাজের অন্য একটি কদর্য রূপ অর্থাৎ ধর্মের নামে ভণ্ডামি, ধর্ম নিয়ে অযথা বাড়াবাড়ি, শোষণের মাধ্যম হিসেবে ধর্মের ব্যবহার প্রভৃতি প্রতিফলিত করেছেন। ভণ্ড ধার্মিক সেজে ইহলৌকিক ফায়দা লাভের জন্য সমাজে কিছু কিছু লোক সবসময় হীনকাজে লিপ্ত থাকে। বিশেষত রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এ দেশে মানুষকে ধোকা দেবার জন্য নিরবচ্ছিন্ন ধর্মকে ব্যবহার করা হয়েছে। ব্রিটিশ, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ পর্বে রাজনৈতিক শ্লোগানে বরাবরই ধর্মের লেবাস পরান হয়েছে। একজন লেখক বলেছেন:

তিনি দেখেছেন (শওকত ওসমান) মুসলিম ধর্মীয় রাজনীতির সাথে সাম্রাজ্যবাদী আতাঁত ও পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা। ধর্মীয় রাষ্ট্র পাকিস্তানে জাতিগত শোষণ ও ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালী জাতীয়তাবাদের বিকাশও ঘটেছে তাঁর চোখের সম্মুখে।[৫১]

রাজনীতির সঙ্গে ধর্মের ব্যবহার সম্পর্কে শওকত ওসমান সর্বদা সজাগ ছিলেন। *সাবেক কাহিনী* গ্রন্থের 'মো'জেজা' গল্পে ভোট পাওয়ার জন্য মোস্তফা খান নামে একজন উকিল দাড়ি রেখে নিজেকে পরহেজগার ব্যক্তি হিসেবে প্রতিপন্ন করার জন্য চেষ্টিত। অন্যদিকে শওকত ওসমান বাঙালির দারিদ্র্য চিত্রণে মৌলিক চাহিদার অভাব ছাড়াও নানা অনুসঙ্গ ফুটিয়ে তুলেছেন। ক্ষুধা মানুষের আদিম প্রবৃত্তি। খাদ্যসমস্যাকে প্রধান চাহিদা হিসেবে শনাক্ত করা যায়। ক্ষুধা ও খাদ্য সমস্যা নিয়ে লেখা শওকত ওসমানের *সাবেক কাহিনী* গ্রন্থের (১৯৫৩) 'দীর্নপত্র' গল্পটি। এ গল্পে অন্ধ ভিখিরি জমিরের মর্মস্পর্শী কাহিনি বর্ণনা করেছেন লেখক। জমির অন্ধ হলেও গ্রামের মহিলাদের ফায়-ফরমায়েস খেটে পেটের আহার জোটাত। এক বিধবা মহিলার জন্য টাকা ধার করার জন্যে অন্য গ্রামে গিয়ে ঝড়ের কবলে পড়ে মৃত্যুবরণ করে।

Dhaka University Institutional Repository

অন্যদিকে *সাবেক কাহিনী* গ্রন্থের 'সে কিরূপে স্বর্গে গেল' গল্পে দেখান হয়েছে যারা অধিকার বঞ্চিত অন্যের গ্রাসাচ্ছাদনের শিকার তারাই মিথ্যা আশার কুহক মনের মধ্যে লালন করে ব্যর্থতার হাহাকার নিয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়। বর্গাচাষী আবেদালি মৌলবির ওয়াজ শুনে স্বর্গের স্বপ্নেই বিভোর ছিল। মনের ভেতরে স্বর্গের সুখ ও কল্পনায় আল্লাহর কাছে চাওয়ার তার সিদ্ধান্ত স্থির হয়েছিল :

> খড়ো-ঘর একখানা সম্মুখে গাছ-পালার ছায়া-ঢাকা ছোট উঠান। সামান্য বিঘে ছয় জমি। দু'টো হালের বলদ। আর আল্লা যদি খুব মেহেরবান হন, একটা গাই-গরু– সঙ্গে বাছুর। নিকটে সরু নদী।[৫২]

কিন্তু বর্গাচাষী আবেদালির স্বপ্নপূরণ হয়নি। পরিণত বয়সে বর্গাচাষি থেকে সে নিঃস্বতম পর্যায়ে পৌঁছায় এবং শেষ পর্যন্ত ভগ্নোদ্যম ভগ্নস্বাস্থ্যে মৃত্যু হলে আবেদালিকে স্ত্রীর শাড়ি দিয়ে দাফন করা হয়। এখানে দেখা যায় যারা অধিকার বঞ্চিত, অন্যের আগ্রাসাচ্ছাদনের শিকার তারাই মিথ্যা আশার কুহক মনের মধ্যে লালন করে ব্যর্থতার হাহাকার নিয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়। সমাজের এই দিক লেখক প্রকাশ করেছেন সার্থকভাবে। এছাড়া *সাবেক কাহিনী* গ্রন্থের 'তিন পাপী', 'খোওয়াব', 'দেনা', 'বিবেক' ইত্যাদি গল্পেও শওকত ওসমান গ্রামের বঞ্চিত নিরন্ন, জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে নিরন্তর সংগ্রামরত মানুষকে তুলে ধরেছেন। সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ প্রায় নির্বিচারে এক শ্রেণির লোকের অত্যাচার সহ্য করে যায়। তাদের না আছে দাবির জোর, না আছে অধিকারের প্রশ্ন। এরা সমাজের যূপকাষ্ঠে বলি হয় নির্বিবাদে। ধনীর কোপানলে পুড়ে মরে নির্বিচারে।

জুনু আপা ও অন্যান্য গল্প গ্রন্থের 'গেঁহু' গল্পটি হিন্দীভাষী এক মজুর পরিবারের কাহিনি নিয়ে লিখিত। মানুষের জন্ম-মৃত্যুর এক নিদারুণ উপলব্দি এ রকম পরিবারসমূহের মানবেতর জীবনাচরণের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায়। সেই অভিজ্ঞতার কিছু নমুনা তুলে ধরা যায়:

> স্পষ্ট দেখা যায় বগীর অভ্যন্তর। একটা গেরস্থর সংসার রীতি-মত। এইটুকু জায়গা। তবু সান্নিধ্যের কি অপরূপ মহিমা! এককোণে হাঁড়ি-কুড়ি, পায়খানার লোটা, রান্নার অন্যান্য আসবাব: উঠোন-চুলো, লক্ড়ী, ন্যাক্ড়া, ফ্যান-গালা গামলা, কয়েকটা বাঁশের পাৎলা চুপড়ী। অন্য কোণে কয়লা এবং এই জাতীয় ইতর স্তুপের বোঝা। একটা ছাগল বাঁধা রয়েছে দুই কোণের মাঝখানে। কয়লার উপর জমেছে ছাগলের লাদী।[৫৩]

এছাড়া 'গেঁহু' গল্পে নিম্নবিত্তের খাদ্য সমস্যার করুণ চিত্র এঁকে লেখক শোষকদের বিরুদ্ধে তাঁর তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন গল্পের নায়কের মাধ্যমে। গল্পে বৃদ্ধা মা যখন ছেলেকে ভৎসনা করে বলে, তুমি কেমন মরদ গম আনতে পারো না? এর জবাবে ছেলে বলে:

Dhaka University Institutional Repository

ঠিক কহা, মায়ি, মরদামি উহাঁ দেখানা চাহিয়ে, যো মেরা গেঁহু ছিন লিয়া। যো হাম্‌কো ইস্ তরহ কা জানোয়ার বানায়া।। উঁহি, উঁহি।[৫৪]

এ গল্পে শোষকদের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা প্রকাশের মাধ্যমে লেখকের সমাজ ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়, বোঝা যায় নিম্নবিত্তের দুঃখ–কষ্ট সমাজের অনাচার, শিল্পী শওকত ওসমানকে প্রবলভাবে নাড়া দিত।

শ্রেণিবিভক্ত সমাজে ধনী-নির্ধনের সামাজিক অবস্থান যেমন একরূপ হয় না, তেমনি শ্রেণিসংগ্রামের নানা কাঁটা এখানে নিবদ্ধ। শওকত ওসমান তাঁর গল্পসাহিত্যে এই শ্রেণিচেতনার নানা অনুষঙ্গ ধারণ করার চেষ্টা করেছেন। একজন সমালোচক বলেছেন:

তাঁর গল্পে সামাজিক মানুষের শ্রেণিগত বৈষম্য সম্পর্কে সচেতনতা খুব বেশি লক্ষ করা যায়। তাঁর গল্পে স্বার্থান্ধ ধনী, পথভ্রষ্ট সমাজ হিতৈষী, ভণ্ড মোল্লা ইত্যাদির প্রতি যেমন বিদ্রূপ বর্ষণ করার প্রবনতা লক্ষিত হয়, সঙ্গে সঙ্গে যে সমাজব্যবস্থা এদের অস্তিত্ব সম্ভব করে তুলেছে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ভাব লক্ষ করা যায়।[৫৫]

দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার শ্রেণিবিভক্ত সমাজের একটি প্রধান মন্দচিত্র। *নেত্রপথ* গ্রন্থের 'পুরস্কার', *ছোটদের নানাগল্প*-এর 'দুটীনোট', *প্রাইজ ও অন্যান্য গল্প* গ্রন্থের 'প্রাইজ' ইত্যাদিতে শ্রেণিসংগ্রাম ও শ্রেণিবৈষম্যের চিত্র ধরা পড়েছে। 'পুরস্কার' গল্পে একটি মোষকে আক্রমণ করে একটি বাঘ। কিন্তু বন থেকে অনেকগুলো মোষ এসে বাঘটিকে একসঙ্গে আক্রমণ করে। এতে বাঘটি আক্রমণ-প্রতি আক্রমণের মুখে মারা যায়। এখানে দেখান হয়েছে, দুর্বলের সংখ্যা বেশি হলে সবল যতই শক্তিশালী হোক না কেন, তার পরাজয় ঘটবেই। *ছোটদের নানা গল্প* গ্রন্থের 'দুটীনোট' গল্পে কাজের ছেলে আমিরের উপর গৃহস্বামী মজিদ সাহেবের অত্যাচারের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। সাজেদ ও আমির কিশোর দুই ভাই গ্রাম থেকে এসে একটি ফ্ল্যাট বাড়ির দুই সাহেবের বাসায় কাজ করে। রাত্রে দু'ভাই ঘুমায় এক জায়গায়। সম্বল বলতে একটি স্যুটকেস ও কিছু খেলনা। একদিন সাজেদ বাজারে গিয়ে খেলনা একশ টাকার চারটি নোট দু'পয়সা দিয়ে কিনে এনে স্যুটকেসে রাখে। আমির এ খবর জানে না। একদিন মজিদ সাহেবের একশ টাকা বিছানার তলা থেকে হারিয়ে যায়। স্যুটকেস থেকে কড়কড়ে নোটগুলো বের হবার পর হান্টার দিয়ে আমিরকে বেদম প্রহার করেন মজিদ সাহেব। নিজে ব্যাংকের চাকুরে হয়েও কেবল প্রভূত্বসুলভ ক্ষমতার জন্য নিরপরাধ বালকটিকে তিনি পেটালেন। বাড়ির ঝি-চাকরদের উপর সন্দেহবশতঃ মনিবের অত্যাচার বাঙালি সমাজে নতুন নয়।

Dhaka University Institutional Repository

'প্রাইজ' গল্পের বিষয়টি যেমন চমৎকার, তেমনই শ্রেণিবৈষম্যের বিষোৎগার লেখক শৈল্পিক নৈপূণ্যে পরিবেশন করেছেন। একটি পার্কে সমাজের বিত্তশালী মহিলারা শিশু-কিশোরদের মধ্যে 'যেমন খুশি তেমন সাজো' বা ফ্যান্সি ড্রেসের আয়োজন করেছেন। এতে গণ্যমান্য অনেক ঘরের ছেলে মেয়েরা অংশ নিয়েছে। এদের মধ্যে ছিন্নমূল জীর্ণবস্ত্র পরিহিত বালক ইজাদ ঢুকে পড়ে। উদ্যোক্তা ও বিচারকদের সবাই তাকে সম্ভ্রান্ত ঘরের বালকই মনে করে। অনেকের ধারণা ফিরোজাবানু নামের এক ধনী মহিলার সন্তান ইজাদ। ছেলেকে ফেন্সি ড্রেসে পাঠিয়ে উনি আসতে দেরি করছেন। সবারই ধারণা ভিখিরিবেশী এই বালকটিই প্রথম পুরস্কার পাবে। কিন্তু ফিরোজাবানুর আগমনে যখন আসল ব্যাপারটি ফাঁস হয়ে গেল, তখন ইজাদের অনধিকার প্রবেশের জন্য শাস্তি শুরু হল। উদ্যোক্তাদের মধ্যে করিমা তালুকদার 'তবেরে শুয়োরের বাচ্চা তুই যে এখানে ঢুকেছিস' বলে ইজাদের গালে চড় মারল। রোজেনা মল্লিক বললেন:

> ছি:একদম স্ট্রিট বেগার। তোমরা ভাবলে পেইন্ট করেছে রঙ দিয়ে। হারামজাদার গায়ে কত রকমের আবর্জনা।[৫৬]

রেবা সরকার দেদার চড়ালেন। মিসেস খন্দকার হাইহিল তুলে পিঠে মারলেন লাথি। ধরাশায়ী হয়ে ইজাদ কয়েকটা লাথি খেয়ে প্রাণপণে দৌঁড়াতে লাগল। তার মনে হলো:

> শত শত রাক্ষুসী যেন হাত বাড়িয়ে বাড়িয়ে তাকে ধরতে আসছে।[৫৭]

এখানে শ্রেণিচেতনা গভীর প্রতীতী নিয়ে উদ্ভাসিত। ধনীর ছেলে-মেয়েরা ফ্যান্সি ড্রেসে ভিখিরি সাজতে পারে, কিন্তু প্রকৃত অর্থে ভিখিরিরা তাদের নাগালের মধ্যে এলে অশোভন ঠেকে। ভিখিরিপনা একদিকে যেমন জীবিকার উপায়, অন্যদিকে ধনীর বিলাসিতা-আনন্দের উপকরণ:

> ভদ্রলোকদের সমস্ত অবস্থানটাই হচ্ছে শ্রমশোষণের উপর প্রতিষ্ঠিত। তিনিই ভদ্রলোক, যিনি দৈহিক পরিশ্রম করেন না, অর্থাৎ অপরের শ্রম অপহরণ করেন।[৫৮]

শওকত ওসমান আমলাতান্ত্রিক শোষণের একটি প্রকৃষ্ট বিবরণ দিয়েছেন *নেত্রপথ* গ্রন্থের 'আপনি ও তুমি' গল্পে। জেলাবোর্ডের সুপারিন্টেনডেন্ট ও একজন পিয়ন যাচ্ছিল বাসে চড়ে গ্রামে। পরস্পর পরিচয় ছিল না। সুপারিন্টেনডেন্ট ও পিয়ন ভিন্ন ভিন্ন শাখায় চাকুরি করে। পরস্পর পরিচয়ের পরেই সুপার সাহেব পিয়নকে 'তুই' সম্বোধনের দৌরাত্মে নিজের মাল রাস্তায় বহনের উপায় খুঁজে পায়। অন্যদিকে স্যারের উপকার করতে পারলে ধন্য হবে ভেবে পিয়নটা সুপারের ট্রাঙ্ক পাহারার কাজে মনোনিবেশ করে। শোষক সুযোগ পেলেই তার সহজাত স্বভাবের ব্যবহার করে :

> উপর ও নিচে, ধনীতে ও দরিদ্রে, বঞ্চনাকারী ও বঞ্চিতে যে ভাগাভাগি সেটাই হচ্ছে আসল বিভাজন।[৫৯]

Dhaka University Institutional Repository

নেত্রপথ গ্রন্থের 'হিংসাধার' গল্পে শ্রেণিবৈষম্যের একটি চমৎকার বিষয় প্রকটিত হয়েছে। গল্পের কথক পালিশমিস্ত্রী। অল্প পুঁজিতে দু'চারজন সহকারী নিয়ে ঠিকাদারি করে। কাজের পরে বিল পায়। একদিন এক মালিকের বাড়িতে বিলের জন্য ধর্ণা দিল মিস্ত্রী। তার সহকারীর মায়ের অসুখ, টাকা ভীষণ দরকার। মালিক জানিয়ে দিলেন টাকা দিতে সপ্তাহ খানেক দেরি হবে। মিস্ত্রীর পীড়াপীড়িতে বললেন:

> মিস্ত্রী তোমরা মানুষের মানমর্যাদা বোঝ না, ছোটলোক কারো গায়ে লেখা থাকে না।[৬০]

মিস্ত্রী বিফল মনোরথ হয়ে ফিরতেই বৃষ্টি এল। মিস্ত্রী একটি বাড়ির কার্নিশের নিচে মাথা গুঁজে দাঁড়াল। সেখান থেকে কিছু দূরে তার চোখে পড়ল-একটি দোতলা বাড়ির সাজান কামরা-কাঁচের জানালা। হঠাৎ তার চোখে পড়ল বড় বড় লোমওয়ালা কুকুর একটা চেয়ারে শুয়ে বাইরে তাকাচ্ছে। দুই থাবার মধ্যে ভর দিয়ে মাথাটা উঁচু করে আছে প্রাণীটা। কুকুরের নিশ্চিন্তে বৃষ্টি নিরীক্ষণের দৃশ্য দেখে পালিশ মিস্ত্রী ঐ ধরণের নিশ্চিন্ত চেয়ারে পৌঁছার জন্য মানুষ হয়েও নিজের অযোগ্যতা বুঝতে পারে। একটা মৃদু হিংসা হয় তার কুকুরের উপর। এখানে এক শ্রেণির ধনৈশ্বর্যে গড়ে ওঠা ভণ্ডামি ও অন্য আরেক শ্রেণির অসহায়ত্ব লেখক প্রতিপন্ন করেছেন। সৈয়দ মুজতবা আলীর 'পাদটীকা' গল্পে লাটসাহেবের তিন ঠ্যাং এর একটি কুকুরের খরচ মাসে পঁচাত্তর টাকা আর আটজন পোষ্যের সংসারের নির্বাহক পণ্ডিত মশাইয়ের মাসিক বেতন পঁচিশ টাকা দেখানো হয়েছে। কুকুরের সাথে মানুষের তুলনায় অধস্তনতা প্রদর্শনে শ্রেণিবৈষম্যের অমানবিক নিষ্ঠুরতারই প্রকাশ ঘটেছে।

ভণ্ড সমাজপতির চিত্র ফুটে উঠেছে *মনিব ও তাহার কুকুর* গ্রন্থের 'গোয়েন্দা কাহিনীর খসড়া' গল্পে। এখানে মফঃস্বল শহরে সমাজসেবক আলী খান, যিনি দশ বারোটি প্রতিষ্ঠানের সভাপতি, বিত্তশালী পুরুষ। তিনি ছাত্রজীবনে এক কেরানির বাড়িতে থেকে লেখাপড়া করেছেন। কেরানির স্ত্রীর বাক্স ভেঙ্গে গহনা চুরি এবং তার কন্যাকে হত্যা করেছিলেন। কেরানিপত্নী ঝি-এর কাজ করে জীবিকা নির্বাহের সময় একদিন আলী খানকে হত্যা করে প্রতিশোধ নেয়। বর্তমান সমাজে এরকম মুখোশধারী অনেক ভণ্ড সমাজপতির পরিচয় পাওয়া যায়।

সমাজদেহের কলুষতা ও অবক্ষয়ের চিত্রে বিভিন্ন নেশা ও নিষিদ্ধ জীবনাচারণের প্রসঙ্গ এসেছে শওকত ওসমানের গল্পে। *পিঁজরাপোল* গ্রন্থের 'দাতব্য চিকিৎসালয়ের ইতিহাস' গল্পের মধ্যে বর্ণিত হয়েছে চোরাচালানী জলীল তরফদার, পুলিন সাহাদের কথা। তরুণ ডেপুটি মুস্তাফিজ বাধা দিয়েছিল। চোরাচালানী

Dhaka University Institutional Repository

জলীলকে জেলে পাঠিয়েছিল-কিন্তু অদৃশ্য শক্তির প্রভাবে তার জেলে থাকতে হয়নি। বরং বদলি হতে হয়েছে মুস্তাফিজকে। সত্যের উপর অসত্যের জয় সাময়িক হলেও এটাই বাস্তব অবস্থা। *প্রস্তর ফলক* গ্রন্থের 'দীক্ষায়ণ' গল্পে হাজির পুত্র হবিব খান ও তার ইয়ার শফিউল্লার মদ্যপান ও মাতলামির বর্ণনা রয়েছে। *উপলক্ষ্য* গ্রন্থের 'পত্নী ও উপপত্নী' গল্পে দুই মাতাল ওয়াজের ও তসকীনের মদ খেয়ে স্ত্রী বাজি রাখার বর্ণনা পাওয়া যায়। জুয়া খেলার পরিণতি দেখান হয়েছে *উভশৃঙ্গ* গ্রন্থের 'ফ্লাশ' গল্পে। জুয়া খেলে ফতুর হলে জুয়াড়ি ইঞ্জিনিয়ার খাদেমালির স্ত্রী সাজেদা কন্ট্রাক্টর নাজিমের সঙ্গে এবং জুয়াড়ি অধ্যাপক বাসেতের স্ত্রী হাফেজা ব্যবসায়ী-স্বামীর জুয়ার পার্টনার কোবাদের সঙ্গে চলে যায়। সমাজের উচ্চস্তরের মানুষের জন্য এহেন অপমান মৃত্যুর সামিল।

এক ভণ্ড দাতার পরিচয় মেলে *উভশৃঙ্গ* গ্রন্থের 'দানসত্র' গল্পে। ধনী কোটিপতি কালাম মজুমদার অভিনব প্রক্রিয়ায় দান করতে গিয়ে বহুলোকের প্রাণহানি ঘটায়। বিভিন্ন জাতের বেড়া দিয়ে এক মাঠের মধ্যে দান প্রদাণের ব্যবস্থা করেছিল মজুমদার। এক পয়সা থেকে হাজার টাকার নোট নিতে হলে ভিখিরিদের শক্ত কাঠের বেড়া ডিঙ্গিয়ে ঘেরার মধ্যে প্রবেশ করে দান নিতে হবে। দান গ্রহণ শুরু হলে ভীড়ের জন্য বেড়ার ঘষায় রক্তাক্ত হয়ে অনেক ভিখিরি মারা গেল। বাস্তবত বাংলাদেশে দানের ক্ষেত্রে এরূপ ভণ্ডামি লক্ষ করা গেছে। এরূপ একটি ঘটনা ঘটেছিল ১৯৬০ এর দশকে এক বিড়ি ফ্যাক্টরিতে। দান নিতে গিয়ে তিনজন ভিখিরি মারা যায়। "১৯৯০ এ চট্টগ্রামের এই একই ফ্যাক্টরিতে যাকাতের টাকা নিতে গিয়ে ৩৬ জন ভিখিরির প্রাণহানি ঘটে। আহত হয় অনেকে।"[৬১] শওকত ওসমান কোটিপতি কালাম মজুমদারের মাধ্যমে এরূপ হঠকারী দাতার চিত্র তুলে ধরেছেন 'দানসত্র' গল্পে।

মফঃস্বল শহরের মহল্লা পলিটিক্সে বিয়ের আসর থেকে অপমানিত হয়ে জামাই উঠে গেছে *এবং তিন মির্জা* গ্রন্থের 'ফয়সালা' গল্পে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা বিধবা মলিহা বেগম, মেয়ে আলেফার বিয়ে ঠিক করেছিল সওদাগর অফিসের অফিসার আকিল কাজেমীর সঙ্গে। অথচ মহল্লার কিছু লোক সামান্য বিধবার মেয়ের অফিসারের সঙ্গে বিয়ে হওয়াটা মেনে নেয়নি। তাই বিয়ের দিনে সামান্য ব্যাপার নিয়ে গণ্ডগোল বাধিয়ে পাত্রপক্ষকে মহল্লা ত্যাগে বাধ্য করে। গরীব বিধবার উপর মহল্লার সর্দারের রোষ হৃদয়হীন ও নিষ্ঠুরতাপূর্ণ। এ রকম একটি ঘটনা দেখা যায় রবীন্দ্রনাথের 'যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ' নামক গল্পটিতে। এগুলো ছাড়াও *উপলক্ষ্য* গ্রন্থের 'গ্রাম্য' গল্পে ভিক্ষুকের প্রতারণা ও *উভশৃঙ্গ* গ্রন্থের 'জাতক কাহিনী' গল্পে মানবশিশুর শোচনীয় পরিণতির কথা বর্ণিত হয়েছে। সকালে জীবিত সদ্যোজাত একটি শিশুকে রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখে বহু লোকের সমাগম হয়। কিন্তু বেওয়ারিশ শিশুটিকে কেউ নিয়ে গেলনা। যথারীতি রাত্রি এল। পরদিন শিশুটির ছেঁড়া খোঁড়া অংশ

Dhaka University Institutional Repository

টুকরো টুকরো অবস্থায় দেখা গেল। এই অমানবিক দৃশ্যের অবতারণা বর্তমান যুগসভ্যতায় আমাদের সমাজ পরিবেশেই হয়ে থাকে।

এদেশের সমাজব্যবস্থায় ধর্মীয় গোঁড়ামির একটি পরিস্কার চিত্র পাওয়া যায় *পুরাতন খঞ্জর* গ্রন্থের 'শিয়া সুন্নীর পূর্বপুরুষ' গল্পে। এ গল্পে জৈন ধর্মাবলম্বীদের শিয়া সুন্নীর পূর্বপুরুষ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ইসলামে দেখা যায় শিয়া সুন্নী মতাবলম্বীদের মধ্যে পরস্পর অহি-নকুল সম্পর্ক। জৈন ধর্মের দিগম্বর শ্বেতাম্বরদের মধ্যে শিয়া সুন্নীর মতোই বিরূপ সম্পর্ক বিদ্যমান।

এক দিগম্বর জৈন রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় তার সংগে দেখা হয় অপর এক উলঙ্গ শ্বেতাম্বরের। তবে তার গায়ের ২০/২৫ জায়গায় তালি লাগানো। দিগম্বর উলঙ্গ শ্বেতাম্বরকে দেখে সঙ্গীই ভেবেছিল, দিগম্বরের কাছে যখন ব্যাপারটি স্পষ্ট হলো যে, অপরজন শ্বেতাম্বর এবং শ্বেতাম্বর যখন বুঝতে পারল অন্যজন দিগম্বর, তখনই তারা পরস্পরের প্রতি বিদ্বিষ্ট হয়ে উঠল।

আবার ধর্মের দোহাই দিয়ে মানুষকে নানাভাবে প্রতারিত ও শোষণ করা হয়েছে সমাজের নানা স্তরে, যা শওকত ওসমানের ছোটগল্পে লক্ষ করা যায়। *সাবেক কাহিনী* গ্রন্থের 'খোওয়াব' গল্পে একজন ভণ্ডপীরের ধর্ম নিয়ে ছিনিমিনি খেলার কাহিনি পাওয়া যায়। এখানে পীর হরকতুল্লা একজন মুরিদের স্ত্রী রাবেয়াকে ইদ্দতকালীন সময় অতিবাহিত হওয়ার আগে বিয়ে করেছিল। মুরিদ ঝোঁকের মাথায় স্ত্রীকে তালাক দিয়ে ফেলে। ইসলামের নিয়ম হচ্ছে বায়ান তালাকের পর আবার পরপুরুষের সহবাস শেষে ইদ্দতকাল বাদ নতুন নেকাহ্‌র ব্যবস্থা করা যাবে। এই পীর মুরিদের স্ত্রী রাবেয়াকে এভাবে নেকাহ্ করে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে আর ডিভোর্স করেনি। একদিন দুঃস্বপ্নের সময় গলাটিপে রাবেয়াকে সে হত্যা করল। যে পীর মুরিদের কাছে জাগতিকতার অসারতা প্রমাণের জন্য বেহেস্তের হুর-পরীদের গল্প করত-লোভ দেখাত, সেই পীর নারীর প্রতি লোভাতুর হয়ে এরূপ হীনকর্ম সম্পাদন করল। বর্তমানে আমাদের সমাজেও এহেন ভণ্ড পীরের কুকীর্তি-কাহিনি নানা সময় নানা পরিসরে শোনা যায়।

> হুজুর। হারামজাদা চুট্টা। রাবেয়া আমার শরীয়ৎ মোতাবেক আমার– অন্ধকারে এক জোড়া বাঘের চোখ জ্বলে উঠল, সগুফ এগিয়ে আস্‌ছে। শ্বাপদ। চীৎকারে জাগ্‌লেন হুজুর। আরো এক রাত্রি। শয়তান-কে দেখলেন হুজুর। সুকুমার বালক মেঝের উপর মার্ব্বেল খেলছে। ...
>
> দাঁত মুখ খিঁচিয়ে তিনি একহাতে শয়তানের গলা টিপে ধরলেন। পাশবিক শক্তির চরমতম ভর তাঁর কাঁধের উপর। শয়তানের প্রাণ ওষ্ঠাগত। আর্তনাদ উঠল ঘরে।...

Dhaka University Institutional Repository

রাবেয়ার জিব বেরিয়ে গেছে। নিঃস্পন্দ মুখগহ্বর থেকে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত ঝরছে।[৬২]

নির্বাচিত গ্রন্থের 'দুই শরীক' গল্পে দরিদ্র মৌলভি রজব আলী সংসার চালাতে অপারগ হয়ে মাজার আর মসজিদের নামে দোহাই দিয়ে চাঁদা ওঠায়। এই ঘৃণ্য কাজে সহায়তা নেয় পুত্র মাজেদের। এজন্য রজব মৌলভি তার ছেলে মাজেদকে তাদের মসজিদ মাজারের ধর্মীয় উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলেছে:

এই ব্যাটা হুন। এই অইতেছেগ্যা সব থন বড় মসজিদ, প্যাড হালা প্যাড। আগে বুঝি নাই, ভুল কইরাছি।[৬৩]

পেটের জন্য যে ধর্মীয় লেবাস বা ভড়ং রজব মৌলভির কথায় তা স্পষ্ট।

"সমাজের গভীরে স্থায়ী সংস্কার তথা কুসংস্কারের বাস্তব চিত্রণ, ধর্মীয় অন্ধত্ব তথা সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক চিন্তার অস্থি খুঁড়ে তোলার চেষ্টা, ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষার প্রয়োজনে প্রতিবাদী ভূমিকা গ্রহণের দুঃসাহসী চিত্রণ এবং সর্বোপরি মানবিক চেতনার প্রকাশ ঘটানো শওকত ওসমানের কথাসাহিত্যের উদ্দেশ্য।"[৬৪] আর্থ-সামাজিক জীবনঅন্বেষা শওকত ওসমানের মধ্যে বরাবর গভীর ও সত্যময় দীপ্তি নিয়ে বিচ্ছুরিত হয়েছে। জীবন ও সমাজের সূক্ষ্মদ্রষ্টা হিসেবে গ্রাম ও শহরের আবেষ্টনী থেকে কথাসাহিত্যে তিনি যে মাটি ও মানুষের প্রতিচ্ছবি একেঁছেন, তা নিরতিশয় বাস্তবমণ্ডিত, চেতনাদর্শী ও শিল্পনিপুণ।

পরিশেষে বলা যায়, কথাশিল্পী শওকত ওসমানের সাহিত্যিক মন আবর্তিত হয়েছে এদেশের প্রকৃতি, সমাজ, জীবন ও তার পরিপার্শ্বকে ঘিরে। ফলে স্বদেশের সংস্কৃতি, আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবেশ সুস্পষ্টভাবে চিত্রিত হয়েছে তাঁর গল্পে। সমাজ ও রাজনীতিসচেতন গল্পকার হিসেবে তিনি সমসময়ের নানামাত্রিক জটিলতাকে অতি সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করে তাঁর গল্পে তুলে ধরেছেন। বিপুল অভিজ্ঞতা, গভীর জীবনবোধ, সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তির সমবায়ে তিনি তৈরি করেছেন তাঁর গল্পের ভুবন। সুদীর্ঘ জীবন পথের বিভিন্ন সময়ে অর্জিত অভিজ্ঞতার সাহায্যে সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশের বাস্তব সমস্যা সুদৃঢ়ভাবে বিন্যস্ত তাঁর গল্পে। মূলত তাঁর ছোটগল্পগুলো সময়, সমাজ ও দেশকালের পরিবর্তনের সঙ্গে প্রবহমাণ। ফলে তাঁর গল্পে যুগ-জীবন, যুগ-মানস ও সমাজের বিচিত্র প্রকাশ লক্ষ করা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসূত্র

১. শওকত ওসমান, *রাহনামা ২: অন্য রণপ্রান্তর ও ভূবন চত্বরে*, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ৩৭২।

২. ড. মো. আব্দুর রশীদ, *শওকত ওসমানের ছোটগল্প : সমকাল, জীবনবৈচিত্র্য ও শিল্পরূপ*, দিকদর্শন প্রকাশনী লি., বাংলাবাজার, ঢাকা, ২০১৫, পৃ. ২৭।

৩. আজহার ইসলাম। *বাংলাদেশের ছোটগল্প :বিষয়-ভাবনা স্বরূপ ও শিল্পমূল্য*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯ , পৃ. ১০৫।

৪. ড. মো. আব্দুর রশীদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮।

৫. ড. মো. আব্দুর রশীদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮।

৬. সৈয়দ আবুল মকসুদ। *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর জীবন ও সাহিত্য*, গতিধারা,ঢাকা, ১৯৮১, পৃ. ৩০।

৭. শওকত ওসমান, *রাহনামা ১ : ছেলেবেলা ও কৈশোর কোলাহল*, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ৯৮।

৮. হুমায়ুন আজাদ, 'শওকত ওসমান কথাসাহিত্যের পথিকৃৎ'; *ব্যক্তি ও সাহিত্যিক শওকত ওসমান* (সম্পা. বুলবন ওসমান), দীপ্তি প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ৯৩।

৯. সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়, পূর্ব পাকিস্তানের কথাসাহিত্য, বরেন্দ্র সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, বার্ষিক সংকলন, রাজশাহী, ১৩৬৭, পৃ. ১৭০।

Dhaka University Institutional Repository

১০. কবীর চৌধুরী, *পতঙ্গ পিঞ্জর*, উত্তরাধিকার, ১১শ বর্ষ, দশম-দ্বাদশ সংখ্যা, অক্টোবর-ডিসেম্বর, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ. ১৭৯।

১১. গোলাম মুরশিদ, *হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি*, অবসর, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ৯৯।

১২. গোলাম মুরশিদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৪-১২৫।

১৩. সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১*, তয় খণ্ড, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ২০।

১৪. সিরাজুল ইসলাম, *বাংলাপিডিয়া ৪র্থ খণ্ড*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ৩৮৪।

১৫. রফিকুল ইসলাম, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম*, ঐতিহ্য, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ৩০।

১৬. রফিকুল ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০।

১৭. মুহম্মদ আব্দুর রহিম ও অন্যান্য, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ২০০৫, পৃ. ৩৩৭।

১৮. ড. মো. আব্দুর রশীদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৫।

১৯. শওকত ওসমান, *শওকত ওসমান গল্পসমগ্র*, (সম্পাদনা বুলবন ওসমান), সময় প্রকাশন, বাংলা বাজার, ঢাকা, ২০০৩, 'দাতব্য চিকিৎসালয়ের ইতিহাস', পৃ. ১১৩।

২০. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'ভাগাড়', পৃ. ১৮৪।

২১. ড. মো. আব্দুর রশীদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৬।

২২. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'থুতু', পৃ. ৮৭।

২৩. খালেদা হানুম, *বাংলাদেশের ছোটগল্প* ১৯৪৭-১৯৭০, এ্যাডর্ন পাবলিকেশন্স, চট্টগ্রাম, ১৯৯৭, পৃ. ৮৪।

২৪. খালেদা হানুম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৪।

২৫. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'পিঁজরাপোল', পৃ. ৯৫।

২৬. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০১।

২৭. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০১।

২৮. *পিঁজরাপোল* গল্পগ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় 'নওরোজ লাইব্রেরী' কলকাতা থেকে অগ্রহায়ণ, ১৩৫৮ (১৯৫১) সালে, এই গ্রন্থেও গল্প সংখ্যা ছয়টি। এগুলো হচ্ছে: 'থুতু', 'ইলেম', 'পিঁজরাপোল', 'দাতব্য চিকিৎসালয়ের ইতিহাস', 'কাঁথা', 'আলিম মুয়াজ্জিন'।

২৯. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'কাঁথা', পৃ. ১১৯।

৩০. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'নতুন জন্ম', পৃ. ১৫৮।

Dhaka University Institutional Repository

৩১. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'জুনু আপা', পৃ. ১৩৯।

৩২. খালেদা হানুম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৫।

৩৩. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'জুনু আপা', পৃ. ১৩৭।

৩৪. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'নতুন জন্ম', পৃ. ১৫৪।

৩৫. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'সাদা ইমারত', পৃ. ১৪৩।

৩৬. শওকত ওসমানের *সাবেক কাহিনী* গল্পগ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় ওয়ার্সী বুক সেন্টার, ঢাকা, জানুয়ারী ১৯৫৩ সালে। গ্রন্থটির রচনাকাল ১৯৩৯–৪৩ সাল। এখানে মোট ১২টি গল্প স্থান পেয়েছে। এগুলো হচ্ছে: 'মোজেজা', 'বকেয়া', 'ভাগাড়', 'তিন পাপী', 'সে কিরূপে স্বর্গে গেল', 'হুকুম নড়ে না', 'খোওয়াব', 'দীর্ণপত্র', 'প্রতীক্ষা', ' তুচ্ছ স্মৃতি', 'দেনা' ও 'বিবেক'।

৩৭. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'বকেয়া', পৃ. ১৮৩-১৮৪।

৩৮. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'তুচ্ছ স্মৃতি', পৃ. ২১২।

৩৯. খালেদা হানুম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৯।

৪০. জসীম উদ্দীন, *আসমানী*, 'এক পয়সার বাঁশী', পৃ. ২৩।

৪১. *ডিগবাজী*, ওয়ার্সী বুক সেন্টার, ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়। প্রথম প্রকাশ কালের উল্লেখ নেই। ১০ম সংখ্যা, জানুয়ারি ১৯৫৫ সালে মাহবুবুল আলম ' নতুন দশটি বই' শীর্ষক আলোচনায় 'ডিগবাজী' সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন। এতে ধারণা হয় বইটি ১৯৫৪ কিংবা তৎপূর্বে রচিত। এখানে মোট ছয়টি গল্প স্থান পেয়েছে : 'গরিলা', 'দুই বন্ধু', 'ডিগবাজী', 'জুলুম', 'পার্ক'ও 'একশ বছর পরে'।

৪২. শওকত ওসমান, 'একশ বছর পরে', *ডিগবাজী*, ওয়ার্সী বুক সেন্টার, ঢাকা, পৃ. ৪৯।

৪৩. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫১-৫২।

৪৪. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৩।

৪৫. শওকত ওসমান, 'আকালের গল্প', *প্রাইজ ও অন্যান্য গল্প*, কথাকলি, ঢাকা, ১৯৬৯, পৃ. ৭৬।

৪৬. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'স্বগতোক্তি', (*উভশৃঙ্গ*), পৃ. ৪২৩।

৪৭. ড. মো. আব্দুর রশীদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৫।

৪৮. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'নেমক হালাল', (*উভশৃঙ্গ*), পৃ. ৪৬৮।

৪৯. শওকত ওসমানের *এবং তিন মির্জা* গল্পগ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় বর্ণবিচিত্রা, ঢাকা থেকে অক্টোবর ১৯৮৬ সালে। এখানে সংকলিত গল্পের সংখ্যা ছয়। এগুলো হচ্ছে : 'তিন মির্জা', 'ফয়সালা', 'শেষ আগে শুরু হয়', 'দম্পতি', 'ন্যায় অন্যায়' ও 'দ্বিতীয় অভিসার'।

Dhaka University Institutional Repository

৫০. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'শেষ আগে শুরু হয়', পৃ. ৫৩৯।

৫১. জুলফিকার মতিন, 'শওকত ওসমান ও আমাদের অর্জন'. সরকার আশরাফ (সম্পাদিত), 'নিসর্গ' (শওকত ওসমান সংখ্যা), ষষ্ঠ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, বাণী প্রকাশনী, বগুড়া, পৃ. ৬৭।

৫২. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'সে কিরূপে স্বর্গে গেল' (*সাবেক কাহিনী)*, পৃ. ১৮৮।

৫৩. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'গেঁহু' (*জুনু আপা ও অন্যান্য গল্প*), পৃ. ১৫৮।

৫৪. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৫।

৫৫. সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়, 'পূর্বপাকিস্তানের কথাসাহিত্য', 'বরেন্দ্র সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা', রাজশাহী, বার্ষিক সম্মেলন, ১৩৬৭, পৃ. ১৭০।

৫৬. শওকত ওসমান, 'প্রাইজ' *(প্রাইজ ও অন্যান্য গল্প)*, পৃ. ১৮।

৫৭. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০।

৫৮. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, 'স্বাধীনতা ও সংস্কৃতি', ডানা প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ. ৩৩।

৫৯. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬০।

৬০. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'হিংসাধার' *(নেত্রপথ)*, পৃ. ৩০৫।

৬১. সংবাদ, ঢাকা, ১৬ই মে, ১৯৯০।

৬২. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'খোওয়াব' *(সাবেক কাহিনী)*, পৃ. ১৯৬-১৯৭।

৬৩. শওকত ওসমান, 'দুই শরীক', *নির্বাচিত গল্প*, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৮৬, পৃ. ১১১।

৬৪. আহমদ রফিক, নাগরিক মননশীলতায় ধীমান, সরকার আশরাফ (সম্পাদিত), পৃ. ৮০।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শওকত ওসমানের ছোটগল্পে নগরজীবন

বাংলা সাহিত্যে নগরজীবন ও সংস্কৃতির প্রভাব আধুনিক যুগের ফসল। অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলার যে নগর সভ্যতার চালচিত্র পরিলক্ষিত হয় তাকে সূচনা পর্ব বলা যায়। আধুনিক বাংলাসাহিত্যের উদ্ভব ও বিকাশে গ্রামভিত্তিক জীবন ও সংস্কৃতি যেভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল, সে তুলনায় নগরজীবন ও সংস্কৃতি কম প্রভাব বিস্তার করেছিল। অবশ্য এজন্য আমাদের শিক্ষা-দীক্ষা ও ভৌগলিক পরিবেশ অনেকাংশে দায়ী। বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রধান দুই কেন্দ্র কলকাতা ও ঢাকা। যদিও ঢাকা শহর আগে প্রতিষ্ঠিত ছিল, তবু শিল্প-সাহিত্যের বিকাশে কলকাতা বেশী অগ্রবর্তী ছিল। "ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার নবজাগরণ ও ইংরেজ শাসক বেনিয়ার সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য-চাকরি কিংবা দালালি সূত্রে যুক্ত নাগরিক মধ্যবিত্তশ্রেণির বিকাশ কলকাতাতেই হয়েছিল।"[১] পূর্ববাংলার যেসব সাহিত্যিকেরা তিরিশ বা চল্লিশের দশক থেকে মুক্তজীবন চেতনা নিয়ে সাহিত্যচর্চা করেছেন, তাঁদের অধিকাংশই কর্মসূত্রে কলকাতার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

১৯৪৭ সালে ধর্মভিত্তিক জাতীয়তার ভিত্তিতে ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়ে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হয়। পূর্ববাংলা যুক্ত হয় পাকিস্তানের অংশে। বাঙালি মুসলিম সম্প্রদায়ের অধিকাংশ সাহিত্যিক, কর্মজীবীরা স্বেচ্ছায় নতুন কর্মস্থান ঢাকায় বদলি হয়ে চলে আসেন। "তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানের রাজধানী ঢাকাকে ঘিরে নতুন উদ্দীপনায় ব্যবসা-বাণিজ্য-চাকরি থেকে সাহিত্য-সংস্কৃতিচর্চা প্রাণ পায়। পত্র-

Dhaka University Institutional Repository

পত্রিকা-প্রকাশনা সংস্থা গড়ে ওঠে। ধীরে ধীরে পূর্ববাংলার বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্তের নগর সংস্কৃতির বিকাশ হতে থাকে।"[২] বাঙালি মুসলমান সম্প্রদায় এভাবে রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতির নানা ক্ষেত্রে অধিকার সচেতন হয়ে ওঠে। আর তাই পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে জীবনবোধের অভিঘাত বাংলাদেশের নগরজীবনকে প্রভাবিত করে। এ সম্পর্কে আমিনুর রহমান সুলতান মন্তব্য করেন:

> ভাষা আন্দোলন, সামরিক আইন বিরোধী আন্দোলন, স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন সর্বোপরি ঊনসত্তরের গণআন্দোলন নাগরিক জীবনকে উতুঙ্গে নিয়ে যায়। ফলে সাহিত্যে নগরজীবনের প্রতিভাস অনিবার্য হয়ে পড়ে।[৩]

১৯৭১ সালে এদেশের স্বাধীকার আন্দোলন রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা তথা মুক্তিআন্দোলনে রূপ নেয়– এবং রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে বাংলাদেশ নামক নতুন রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে। স্বাধীনতা যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে স্বাধীন বাংলাদেশের নগরজীবনের নানা রূপ-রূপান্তর, নতুন জীবন-চেনা নগরের সমাজ জীবনের ভেতরের নানা অসঙ্গতি ও আশাভঙ্গের বীভৎস রূপ ব্যঞ্জয় হয়ে ওঠে।

প্রাকব্রিটিশ যুগে বাংলাদেশ ছিল গ্রামভিত্তিক। গ্রামীণ সমাজ ছিল সামন্ততান্ত্রিক। সমাজের মানুষ শাসকশ্রেণি থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল। এ সম্পর্ক আনোয়ারুল ইসলাম মন্তব্য করেন:

> বাংলাদেশের সামাজিক কাঠামো ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের সামাজিক কাঠামো থেকে কিছুটা স্বতন্ত্র ছিল। মুঘল যুগে বাংলার শাসকশ্রেণি ছিল বহিরাগত; এরা কেন্দ্রীয় শাসনের প্রতিভু হিসেবে এদেশে আসতো কেন্দ্রের শোষণ ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার জন্যে, ভূমি রাজস্ব আদায়ের জন্যে। উৎপাদনের সাথে এদের কোন যোগাযোগ ছিল না। সুতরাং উৎপাদন-উপকরণের উন্নতি বিধানেও এদের মাথা ব্যথা ছিল না। নির্দিষ্ট রাজস্ব আদায়ের অতিরিক্ত এদের আর কিছু করণীয় ছিল না।[৪]

সমাজকাঠামো সামন্ততান্ত্রিক হলেও মুঘল যুগে বাংলাদেশে একটি মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণির উদ্ভব হয়েছিল– এই সামন্ত শোষণের বহিৎপ্রকাশ হিসেবে। আর এই মধ্যসত্বভোগী থেকে পরবর্তীকালে জন্ম নেয় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির। প্রাক মুঘল যুগে ঢাকা শহরের অস্তিত্ব ছিল না। "সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ইসলাম খান চিশ্‌তি মুঘল সুবা বাংলার রাজধানী রাজমহল থেকে ঢাকা স্থানান্তরিত করেন। বাংলার ক্ষমতাসীন মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের (১৬০৬-১৬২৭) নামানুসারে ঢাকার নামকরণ করেন জাহাঙ্গীর নগর।"[৫] নাম পরিবর্তিত হয়ে জাহাঙ্গীর নগর নাম রাখার পরও ঢাকা নামটি জনপ্রিয় থেকে যায়। প্রায় এক শতাব্দী পর্যন্ত রাজধানী থাকার কারণে ঢাকা গুরুত্বপূর্ণ নগরীতে রূপান্তরিত হয় এবং শহরের সম্প্রসারণ ঘটে। বাংলাদেশের

Dhaka University Institutional Repository

নগরবাসীদের জীবন ও সাহিত্যের ক্রমবিকাশ অর্থাৎ বাংলাদেশের নগর জীবনভিত্তিক সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে ঢাকা শহরের ঐতিহ্য সম্পর্কে জানতে হবে– তা নিম্নরূপ:

> সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে ১৬০৮ খ্রী. সুবাদার ইসলাম খান রাজমহল হইতে ঢাকায় তৎকালিন প্রাদেশিক রাজধানী স্থানান্তর করেন। ঢাকার পরিবর্তিত নাম জাহাঙ্গীর নগর সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচলিত হয় নাই। মোঘলদের প্রাদেশিক রাজধানী এখানে স্থাপিত হইবার বহু পূর্ব হইতেই ঢাকা শহরের অস্তিত্ব ছিল (ঢাকা নামেই): বাংলার স্বাধীন সুলতানী আমলের মসজিদ (যথা বিনত বিবি মসজিদ, ১৪৫৭) আজও ঢাকায় বর্তমান। মোঘলদের প্রাদেশিক রাজধানী ঢাকায় থাকে ১৬০৮ হইতে ১৬৩৯ খ্রী. পর্যন্ত, মাঝখানে সুবাদার শাহজাদা শুজা ১৬৩৯ হইতে ১৬৫৯ খ্রী. পর্যন্ত রাজধানী রাজমহলে পুনরায় স্থাপিত রাখেন; তৎপর আবার রাজধানী ১৬৬০ হইতে ১৭১৭ খ্রী. পর্যন্ত ঢাকায় থাকার পর উহা পরিশেষে মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত হয়।[৬]

১৯৪৭ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী হিসেবে ঢাকা শহরের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায় এবং ভারত ও পূর্ববাংলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মানুষ ঢাকায় আসতে থাকে বসবাসের উদ্দেশ্যে। এ বিষয়ে কাজী আনোয়ারুল হক বলেন:

> পূর্ব বাংলার নতুন সরকারকে ঢাকায় প্রাদেশিক সদর দপ্তর প্রতিষ্ঠা করতে বেশ কষ্ট করতে হয়েছে। বঙ্গ-ভঙ্গের সময় তৈরি করা সরকারী ভবনগুলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ছিল। ইডেন মহিলা কলেজের জন্য নব নির্মিত ভবন এবং হোস্টেলসমূহই একমাত্র সরকারী অফিসের উপযোগী, এই কলেজের ভবনগুলো নেয়া হয়। কিছু ব্যক্তিগত বাড়িও এজন্যে নেয়া হয়। স্থান সংকুলানের সমস্যাটি অনেক দিন ধরেই বিদ্যমান ছিল। কিন্তু স্বাধীনতার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ জাতীয়তাবাদের চেতনার জন্য সকলেই বেশ সহযোগী মনোভাব পোষণ করতেন।[৭]

ঢাকা মোগল আমল থেকে একটি সমৃদ্ধ নগরী ছিল এবং পরবর্তীতে বৃটিশ ও পাকিস্তান আমলে ঢাকার পাশাপাশি বাংলাদেশের অন্যান্য নগর-শহরের সম্প্রসারণ ঘটতে থাকে। ১৯৪৭ সালে পূর্ব বাংলার রাজধানী হিসেবে ঢাকার যে গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়– তা ষাটের দশকে এসে আরও সম্প্রসারিত হয় এবং স্বাধীন বাংলাদেশের রাজধানী হিসেবে এর জনপ্রিয়তা আরও বৃদ্ধি পায়। শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে সব মানুষের পদচারণায় ঢাকা প্রাণচঞ্চল নগরীর রূপ লাভ করে এবং সর্বত্র নাগরিক জীবনের ছোঁয়া লাগে। সেইসাথে কোলাহলময় প্রাণচঞ্চল শহরের মানুষের জীবনধারা নিয়ে শিল্পী, সাহিত্যিকেরা নতুন নতুন সাহিত্যকর্ম সৃষ্টিতে মনোনিবেশ করে। যদিও "চল্লিশের দশক থেকেই এদের কেউ কেউ সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় চর্চা করে আসছিলেন। সাতচল্লিশ পরবর্তী ঢাকা কেন্দ্রিক সাহিত্য পাঠে আমরা লাভ করি তৎকালীন বাংলাদেশের মানুষের জীবন ও পরিবেশ; যেখানে গ্রামের মত শহরকেও তুলে ধরা হয়েছে বেশ আন্তরিকভাবে। বাংলাদেশের গ্রাম জীবনভিত্তিক সাহিত্যে যেমন আমরা গ্রাম ও গ্রামের মানুষের পরিচয় পাই,

Dhaka University Institutional Repository

তেমনি শহরকে উপজীব্য করে লেখা সাহিত্যেও রয়েছে শহুরে মানুষের নিত্যদিনের জীবন সংগ্রাম ও ধাপে ধাপে গড়ে ওঠা শহরের ইতিকথা। সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মতো আমাদের তৎকালীন ছোটগল্পেও স্থান পেয়েছে সমসাময়িক শহরবাসী মানুষের জীবনের বিভিন্ন দিক।"[৮]

সময়ের সাথে সাথে মানুষের জীবন-জীবিকাও পরিবর্তিত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলার নগর সভ্যতার যে উন্মেষ ঘটেছে তা ছিল ঊনিশ শতকে বাংলায় নবসৃষ্টির অর্থাৎ নতুন চেতনার ফল। মধ্যবিত্ত শ্রেণির জীবনযাপন গ্রামীণ গোষ্ঠী জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বদলে যায় এবং সৃষ্টি হয় স্বয়ংসম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন শাহরিক সমাজ। এ সম্পর্কে ড. উমা মাজি মন্তব্য করেন:

> গ্রামীন সমাজে অধিবাসীদের মধ্যে যে ব্যক্তিগত পাস্পরিক সম্পর্ক ছিল তা শহরে জীবনে রইল না। কৃষির স্থলে ব্যবসা-বাণিজ্য ও বুদ্ধিবৃত্তির উপর নির্ভরশীলতা দেখা গেল। জীবিকা ক্ষেত্রে এলো বৈচিত্র্য। অর্থনৈতিক জীবনে ঘটল প্রসার। শহুরে মানুষ ধীরে ধীরে গ্রাম থেকে সরে এলো। শিথিল হলো গোষ্ঠীগত বন্ধন ও দায়িত্ব, ট্রাডিশন ও ধর্ম বিশ্বাস শিথিল হল, নৈতিক জীবনাদর্শ শিথিল হল। তার পরিবর্তে এলো শহুরে জীবনের হৃদয়হীন অমানবিক প্রবল ভাবের বোধ। নাগরিক বৃত্তির সঙ্গে শিথিলনীাতি ভোগ প্রবৃত্তির যোগ ঘটল। শহুরে জীবনযাত্রার গতিবেগ ও তীব্রতা মানুষকে তার পূর্বতন সংস্কার-আশ্রয় থেকে বিচ্ছিন্ন করে ভাসিয়ে নিয়ে গেল আত্মানুপরায়ণতার পথে।[৯]

নগরজীবন ও সংস্কৃতির অন্যতম উপাদান হচ্ছে রাজনৈতিক চেতনা– যা পাকিস্তান সৃষ্টির পর নাগরিক মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে প্রথম জাগ্রত হয়। নগরকেন্দ্রিক অর্থনৈতিক বিকাশ সাধিত হওয়ার সাথে সাথে গ্রাম থেকে মানুষ নগরে ছুটে এসেছে সামান্য অর্থের আশায়, কেউ রিকসা চালিয়েছে কেউ শ্রমিকের চাকরি করেছে, আবার কেউবা দালালি করেছে। আর এই প্রবণতা স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে প্রবল আকার ধারণ করেছিল। কারণ দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক আন্দোলন এবং মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষের মুক্তি এলেও অর্থনৈতিক মুক্তি আসেনি। রাজনৈতিক ও সমাজনীতির দিক থেকে বিড়ম্বনা স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশ অদ্ভুত এক আধারে তলিয়ে যেতে থাকে। গ্রামীন মানুষ কাজের সন্ধানে সামান্য অর্থ উপার্জনের জন্য নগরের দিকে ছুটে আসে। কিন্তু মধ্যবিত্ত শ্রেণি নাগরিক দুর্ভোগের শিকার হয়, তারা তাদের মানবতা, নৈতিকতার বিশ্বাস ক্রমান্বয়ে হারিয়ে ফেলে। আর এসব শুভ-অশুভের বোধ ও প্রভাব নগরজীবন ও সংস্কৃতিতে প্রভাব বিস্তার করে।

পঞ্চাশ-ষাট দশকের ছোটগল্পে আমাদের নগর জীবন ও শহুরে মানুষের জীবন কিভাবে রূপায়িত হয়েছে তা তুলে ধরার জন্যে শওকত ওসমানের পাকিস্তান কালপর্ব অর্থাৎ পঞ্চাশ-ষাট দশকের ছোটগল্পগুলোর পর্যালোচনা আবশ্যক। এ-পর্বের গল্প গ্রন্থগুলোর মধ্যে– *প্রস্তর ফলক* ৯১৯৬৪), *উপলক্ষ্য* (১৯৬৫), *নেত্রপথ*

Dhaka University Institutional Repository

(১৯৬৮), *উভশৃঙ্গ* (১৯৬৮) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এ-পর্বের গল্পগুলোতে নগরজীবনে মানব মনের বিচিত্র অনুভূতি ও খেয়ালের প্রকাশ ঘটেছে। তাছাড়া মানুষের সুকুমার বৃত্তিগুলোর সদর্থক ও খারাপ প্রবৃত্তির নানা প্রসঙ্গ নিয়ে লিখেছেন অনেক গল্প। শওকত ওসমানের একাধিক গল্পে দেখা যায় নাগরিক জীবনের নানা কু-প্রভাব পারিবারিক জীবনে প্রভাব বিস্তার করেছে।

প্রস্তর ফলক গ্রন্থের 'উভসঙ্গী' গল্পে নগরজীবনে নরনারীর বিচিত্র সম্পর্কের চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। ধনসম্পদ ও প্রাচুর্যের মধ্যে থেকেও মানুষ দাম্পত্য জীবনে অসুখী হয়ে ওঠে– যা গল্পকার 'উভসঙ্গী' গল্পে চিত্রিত করেছেন। পারিবারিক জীবনে স্বামী–স্ত্রীর সদ্ভাব যেমন সুখী সংসার রচনার প্রধান উপায়, তেমনই স্বামী-স্ত্রীর কোন্দল–কলহ সাংসারিক বিপর্যয়ও নিয়ে আসে। *প্রস্তর ফলক* গ্রন্থের 'উভসঙ্গী' গল্পে ধনাঢ্য ব্যক্তির গৃহকর্ত্রী কুহেলী স্বামীর লাম্পট্য ও বিশ্বাসঘাতকতায় দগ্ধ হয়েছে। স্কুল জীবনের বান্ধবী সেহেলী বান্ধবীর বাড়িতে বেড়াতে এলে কুহেলী স্বামীর দোষ ঢেকে রেখে নানারূপ প্রশংসা করে। বান্ধবীর বিদায়ের পরে ক্ষোভে দুঃখে কুহেলী স্বামী ওবায়েদ সম্পর্কে স্বগতোক্তি করেছে:

> ট্যুর। তোকে মিথ্যা বলেছি, সেহেলী। ট্যুর–লুচ্চাটা মাগী নিয়ে ডাক বাংলোয় ফূর্তি করতে গেছে। দুটো শাড়ি নিয়ে গেছে নিশীথ সঙ্গিনীকে উপহার দেয়ার জন্য।[১০]

উল্লেখ্য যে, কুহেলী তার স্বামী ওবায়েদের গৃহে অনুপস্থিতির কারণ হিসেবে ট্যুরের কথা বলেছিল। এখানে নগর জীবনে মানুষের চারিত্রিক কদর্যতার চিত্র প্রকাশিত হয়েছে।

আবার ক্ষুধার জন্য দেহদানের চিত্র পাওয়া যায় *প্রস্তর ফলক* গ্রন্থের (১৯৬৪) 'উদবৃত্ত' গল্পটিতে। দরিদ্র বিত্তহীন গ্রামীণ চাষি পরিবারের মেয়ে আমিরণ শহরে এসে পতিতাবৃত্তি করে বাড়িতে গরিব বাবা–মায়ের কাছে টাকা পাঠায়। তার বাবা জানে মেয়ে শহরে সাহেবের বাসায় কাজ করে। অথচ সমাজের সুখের মদিরা সেবীদের সন্তুষ্ট করে জোটাতে হয় আমিরণের মুখের আহার। দারিদ্র্য আর ক্ষুধার জন্যই আমিরণের বাবা মেয়েকে আল্লাহ্‌র হাতে সমর্পণ করে স্বস্তি পেয়েছিল:

> বিদ্যাশে আল্লা যেন তরে দ্যাহে...।[১১]

Dhaka University Institutional Repository

বাবার এ প্রার্থনা যেন আমিরণের জীবনে বিপরীত ফল নিয়ে আসে, আর এখানে আমিরণ চরিত্রটির ট্রাজেডি। আমিরণের প্রাত্যহিক দিনযাপনের মধ্যে সুশৃঙ্খল ব্যস্ততা থাকলেও মনোজগতে সে ছিল বড় অসহায়। গল্পের ভাষায়:

> বাড়ী-ভাড়া, বাড়ীওলি আর গুণ্ডাদের খাঁই মিটিয়ে কটা টাকা আর থাকে? খামাখা আন্দেশা বা-জানের। আমাকে দেখার লোকের অভাব হয় না। সা'ব বাবু দালাল, কন্ট্রাক্টার, যাচনদার, বহু আছে আমার অভিভাবক।[১২]

মূলত আমিরণ শহরজীবনের গ্লানি ভুলতেই গ্রামে আসেন। গ্রামে বাবা-মা, প্রতিবেশীরা তাকে সমাদরের সাথে আশ্রয় দিলেও তিনি মনের দিক থেকে নিরাশ্রয় হয়ে পড়েন। এ-গল্পে আমিরণ সে-সব নারীদের প্রতিনিধি, যারা দুর্ভিক্ষে সংসার এবং সামাজিক মর্যাদা হারিয়েছেন। এ সম্পর্কে রফিকউল্লাহ খান বলেন:

> অভাব কিংবা দারিদ্র্য কেবল একটি তথ্য মাত্র, কিন্তু খাদ্যাভাব একটি বাস্তবতা। মানুষের নীতি, নৈতিকতা, আদর্শবোধ, দাম্পত্যপ্রেম, বাৎসল্য– সকল কিছুই এর কাছে তাৎপর্যহীন।[১৩]

জুনু আপা ও অন্যান্য গল্প গ্রন্থের 'দুই চোখ কানা' গল্পে আধুনিক নগরজীবনের কারখানার মালিকরা কিভাবে শ্রমিক শোষণের অভিনব কৌশল অবলম্বন করে, সে চিত্র সার্থকভাবে লেখক এঁকেছেন। এ গল্পে দেখা যায় কারখানার মালিক স্বল্পশিক্ষিত এক মুনসিকে গোমস্তার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। মালিকের কাছে বিশ্বাসভাজন ও ভাল হবার মানসে শ্রমিকদের উপর সে নানাভাবে অত্যাচার করত। কেউ কেউ তার দৌরাত্ম্যে চাকরি ছেড়ে চলে যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্যবসায় যখন স্ফীতি ঘটল, মালিক মুনসির অদক্ষতার কথা বিবেচনা করে তাকে রেহাই দেয়ার কথা বললেন। বুড়ো বয়সে ছেলে মেয়েদের অশেষ দুর্গতির কথা মনে করে মুনসি কাঁদতে থাকে। পুরান শ্রমিক রহিম গোমস্তা মুনসির এ অবস্থা দেখে বলে:

> সব জায়েগা হামলোগ হ্যাঁয় আত্তর রহেঙ্গে, আলবৎ আলবৎ হামলোগ যো আপনা মেহনত সে খাতে পিতে আত্তর কুই নেহি রহেগা।[১৪]

উভশৃঙ্গ গ্রন্থের 'সৌদামিনী মালো' গল্পে মিশন হাসপাতালের নার্স সৌদামিনী মালোর সম্পত্তি ব্রাদার জন কর্তৃক কিভাবে অপহৃত হয়েছিল, তার বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। স্বামী জগদীশ মালোর মৃত্যুর পর নিঃসন্তান বিধবা সৌদামিনী তার সম্পত্তির মালিক হয়। স্বদেশী কর্মী মনোরঞ্জন মালোর নজর যায় তার কাকাত ভাই জগদীশের সম্পত্তির উপরে। তাই সে সৌদামিনীর পোষ্যপুত্র হরিদাসকে ব্রাহ্মণের ছেলে বলে সমাজে প্রচার করে। শূদ্রের ঘরে ব্রাহ্মণের ছেলে পোষা অন্যায়। হিন্দু সমাজ সৌদামিনীর উপরে বেঁকে বসে।

Dhaka University Institutional Repository

সে মিশন হাসপাতালের ব্রাদার জনকে ডেকে খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত হয়। এদিকে হরিদাস যে মুসলমানের সন্তান সেটাও প্রচার করে দেয় সৌদামিনী। দ্বাদশবর্ষী হরিদাস এটা জেনে বাড়ি থেকে উধাও হয়। সৌদামিনী মিশনের নামে লিখে দেয় বিষয় সম্পত্তি, শেষে পাগল অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর আগে সৌদামিনী প্রায় কাঁদত আর চিৎকার দিত:

> ...আমাকে ছেড়ে পালিয়ে গেল...। হে যীশু, ও হরি, হে আল্লা, আমার যবন হরিদাসকে ফিরিয়ে দে, ফিরিয়ে দে।[১৫]

অতঃপর ব্রাদার জন নিলামে বিক্রি করে দেয় সৌদামিনীর সম্পত্তি। যুদ্ধের সময় এই ব্রাদার জন কেরোসিন ব্ল্যাক করতে গিয়ে ধরা পড়ে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েছিল। এই গল্পে মিশনের ব্রাদার নামাঙ্কিত জনের চরিত্র এবং স্বদেশী কর্মী মনোরঞ্জনের চরিত্র স্বার্থান্ধ পঙ্কিলতা পূর্ণরূপে চিত্রিত হয়েছে।

নেত্রপথ গল্পগ্রন্থের 'নেত্রপথ' গল্পে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে সামাজিক সংস্কার নারীর স্বাভাবিক জীবনপ্রবাহ, নারীর স্বাধীনতাকে কিভাবে বিঘ্নিত করেছে তার চিত্র গল্পকার উপস্থাপন করেছেন। "ধর্মীয় বিধিনিষেধ এবং পুরুষের বেঁধে দেওয়া রীতিনীতি রক্ষার্থে গরুর গাড়ির ছাউনিকে কাপড় দিয়ে ঢেকে অনেকটা কবরের মতো আকার দেওয়া হয়েছে। রাস্তায় কাপড়ে আবৃত গাড়িতে তাদের কোনো ক্রন্দন ধ্বনি শোনা যায় না, এমনকি চুড়ির আওয়াজও কানে আসে না। কিন্তু মহল্লায় পৌঁছা মাত্রই তাদের রুদ্ধ আবেগ শালীনতার বেষ্টনী না মেনেই প্রকাশ পায়।"[১৬] মূলত 'নেত্রপথ' গল্পটিতে সামাজিক শৃঙ্খলে বন্দী নারীদের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা প্রতিধ্বনিত হয়েছে। গল্পের কথক গাড়োয়ানের মুখে ব্যাপারটা জানতে পেরে মন্তব্য করেছেন:

> আমাদের কণ্ঠ থেকে কান্না ছিনিয়ে তুলে নেওয়ার জন্যে কবে সড়কে সড়কে আত্মীয়রা অপেক্ষা করবে?
> আমরা কবে পথে কাঁদতে পারব?
> সেদিন কী আর কাঁদব?
> না।[১৭]

কথকের এই মন্তব্যের মধ্যে অবরোধবাসিনী নারীদের মুক্তিকামিতার প্রতিধ্বনি নিহিত আছে।

উপলক্ষ্য গ্রন্থের 'মোরগ-মুরগী' গল্পটিতে বহু বিবাহের কুফলের কথা বর্ণিত হয়েছে। গৃহকর্ত্রীর ছেলে না হওয়ার কারণে বিয়ের জন্য সে স্বামীকে পীড়াপীড়ি করে এবং নিজের মেয়েদেরও মুরগী নামে সম্বোধন করে। দ্বিতীয়বার স্বামীকে বিয়ে করানোর জন্য স্ত্রীর বলিষ্ঠ ভূমিকার জন্য অচিরেই স্বামী বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। এরপর মোরগের মতই যখন সে স্ত্রী যোগাড়ে ব্যাপৃত হয়ে পড়ে, তখন প্রথমা স্ত্রী সকল উচ্চবাচ্য বন্ধ করে

Dhaka University Institutional Repository

দিল। আসলে স্বামীর মালিকানাকে কোন নারীই বিভক্ত করতে চায় না, এটা মানব প্রকৃতি। কেবল অবস্থার শিকার হয়ে বাধ্য হয় তারা সতীনের ঘর করে।

বর্তমান যুগসভ্যতা ও পুঁজিতন্ত্র স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে অনেক সময় ফাটল সৃষ্টি করে। সামন্ত সমাজে মানুষের জীবন নিস্তরঙ্গই ছিল। পুঁজিবাদী মানসিকতা মানুষের স্বপ্ন সম্ভাবনাকে এত ব্যাপকতা দান করেছে যে, জীবনের বিস্তৃতি ও কর্মপ্রসারের জন্যে স্বামীরা অনেক সময় আজকাল স্ত্রীদের বেশী সময় দিতে পারে না। এতে পারিবারিক কলহ বৃদ্ধি পায়–যা নগরজীবনে অহরহ ঘটে। শওকত ওসমানের *এবং তিন মির্জা* গ্রন্থের 'দম্পতি' গল্পে এক ডাক্তার স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যকার সম্পর্কের কথা বর্ণিত হয়েছে। সাদেকার ডাক্তার স্বামী মোহসেন ডাক্তারিকে সেবা অর্থে গ্রহণ করেছিল। সময় অসময়ে রোগীর ডাকে হাসাপাতালে যাওয়াকে সাদেকা মেনে নিতে চায়নি। ফলে তাদের দাম্পত্য জীবনে মাঝে মধ্যে তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছে। শওকত ওসমান নগরজীবনে দম্পতিদের অসহিষ্ণু মনোভাবকে চমৎকারভাবে বিবৃত করেছেন। মধ্যবিত্ত সংসারের গৃহবধূদের সম্পর্কে একজন সমালোচকের উক্তি এ প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য:

> জন্মদিন, বিবাহ-বার্ষিকী, গেট-টুগেদার পার্টির স্বাদে জীবনকে ভরিয়ে তোলার আকাঙ্খায় মধ্যবিত্ত মহিলা উদগ্রীব। অর্থাৎ পুঁজিবাদী শ্রেণীর ঠাঁইগুলো পালনের অভিলাষ রয়েছে পুরোমাত্রায়...। ফলে ইচ্ছেগুলো ডানা মেলে মুক্ত বিহঙ্গের মত আকাশে উড়ে বেড়ায়। প্রার্থিত আশ্রয় না পেয়ে ফিরে আসে খাঁচার ভেতর। ঘরে ওঠে দীর্ঘশ্বাসের ঝড়। সংসার জীবনে নামে হতাশা।[১৮]

আবার নাগরিক জীবনে বিলম্বে বিবাহের কুফল বর্ণিত হয়েছে, *এবং তিন মির্জা* গ্রন্থের 'ন্যায়–অন্যায়' গল্পে। চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের আগে নিছক পুত্র লাভের জন্য বিপত্নীক মকসুদ আলী পনের বছরের এক গ্রাম্য তরুণীর সঙ্গে বিয়ের বন্দোবস্ত করলেন। অফিসের কেরানি শামসুল হুদা তরুণীর সর্বনাশ রোধে আপ্রাণ চেষ্টা করেও মকসুদ আলীকে নিবৃত্ত করতে পারল না। বছর তিনেক পর পুত্র জন্মের পর প্রৌঢ় মকসুদ আলীর শরীর স্বাস্থ্য ভেঙে গেল। তিনি হাসপাতালে আশ্রয় নিয়ে মৃত্যুর সাথে যুদ্ধ করতে লাগলেন। হাসাপাতালে দেখতে গেলে শামসুল হুদার কাছে মকসুদ আলী নিজের অপরাধ স্বীকার করলেন। শওকত ওসমান এ গল্পে বিলম্বে বিবাহের কুফল এবং আত্ম–সুখকামী পারিবারিক জীবন রচনার অন্যায় চিত্র অঙ্কন করেছেন।

দুই পরিবারের কোন্দলের চিত্র এবং এ কলহের শিকার পাঁচ বছরের মেয়ে জাহানারার স্মৃতি নিয়ে রচিত হয়েছে *সাবেক কাহিনী* গ্রন্থের 'তুচ্ছ স্মৃতি' গল্পটি। পাশের বাড়ির চাচির সঙ্গে মায়ের ঝগড়া হলে জাহানারা তাতে বাধ সাধত। এতে সে খেত মায়ের হাতে পিটুনী। একবার পান্তা ভাতে চাচির কাছে লবণ

Dhaka University Institutional Repository

চেয়ে সে মায়ের হাতে মার খেয়েছে। বসন্ত রোগে জাহানারা মারা গেলে পারিবারিক কোন্দলের নানা পর্যায়ের শিকার জাহানারার তুচ্ছ স্মৃতিগুলো তার বাবা-মাকে নাড়া দেয়। মেয়ে ইঁচড়ে পাকা বলে সবাই তাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করত। তাই বাবার কাছে তরমুজ খেতে চেয়েও সে তরমুজ পায়নি। বাবা আহাদ মিয়া তরমুজের ক্ষেতে গেলেই মেয়ের স্মৃতিতে ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। এই গল্পে পারিবারিক জীবনের অসহিষ্ণুতা এবং এতে করে সৃষ্ট দুঃখময় ঘটনাগুলো অনেক সময় মর্মপীড়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। *সাবেক কাহিনী* গ্রন্থের 'বিবেক' গল্পে দেখা যায় গ্রাম্য চাষি ও মাঝারি ব্যবসায়ী মিরাজ খাঁ কন্যা আলেফার বিয়ে দিয়েছিল ক্ষয়িষ্ণু এক বনেদী ঘরের ছেলে আরশেদের সঙ্গে। মিরাজ খাঁর টাকা পয়সা শেষ করে এবং তাকে নানাভাবে অপদস্ত করে আরশেদ বিবেকহীনতার পরিচয় দিলেও মৃত্যুর সময় শ্বশুর তাকেই সিন্দুকের চাবি দিয়ে যায়। জামাই করেছে একের পর এক অন্যায় শ্বশুরের সাথে– অন্যদিকে শ্বশুরও সব কিছু মেনে নিয়ে জামাইয়ের বংশীয় মর্যাদা রক্ষা করেছে। আসলে উভয়েই তারা বিবেকহীন। জামাই-শ্বশুরের চরিত্রে রবীন্দ্রনাথের কথারই প্রতিধ্বনি জড়িয়ে আছে:

> অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে
> তব ঘৃণা যেন তারে তৃণ সম দহে।[১৯]

শিক্ষা সমস্যা নাগরিক জীবনের একটি অন্যতম মৌলিক সমস্যা। শওকত ওসমান নিজে আজীবন শিক্ষকতার পেশায় নিযুক্ত ছিলেন। ফলে চলমান শিক্ষার হালহকিকত তাঁর গল্প, সাহিত্যে কিছুটা প্রভাব বিস্তার করেছে। প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতিতে প্রহসনের মধ্যে ছাত্র–ছাত্রীদের শিক্ষাদান করা হয়। রবীন্দ্রনাথ এ পদ্ধতিকে সমর্থন করেননি। তাঁর গল্পগুচ্ছের 'গিন্নী' গল্পে অত্যাচারী শিক্ষক শিবনাথ পন্ডিতের কথা বর্ণিত হয়েছে। শওকত ওসমান তাঁর *ডিগবাজী* গল্পগ্রন্থের 'গরিলা' গল্পে ভয়ঙ্কর দৈহিক চেহারার একজন শিক্ষকের চরিত্র অঙ্কন করেছেন। শিবনাথ এবং গরিলার মধ্যকার মিলের চেয়ে অমিলই বেশি। শিবনাথ পণ্ডিত অত্যাচারী, কচি কচি ছেলেদের বিকৃত নামকরণ করে তাদের মানসিক পীড়ন করতে ভালবাসেন। কিন্তু গরিলা মানসিক দিক থেকে ভাল। বরং ছেলেদের কাছ থেকেই যন্ত্রণা পেতেন তিনি। তার বিশালাকৃতির দেহ বলেই ছেলেরা তার নাম গরিলা দিয়েছিল। ক্লাসের দুষ্টু বালকদের মধ্যে অন্যতম মন্টু, মাষ্টার গরিলাকে নানাভাবে অপমানিত করেছে। কিন্তু স্কুলে টেস্ট পরীক্ষায় মন্টু অংকে ফেল করলে হেডমাস্টার মন্টুর কাকুতি মিনতিতেও যখন ফাইনাল পরীক্ষা দেওয়ার অনুমতি দেয়নি, তখন গরিলা মাস্টার তার পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করে পিতৃপ্রতিম শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন। এই গল্পে শিক্ষকদের অপমান ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করার প্রসঙ্গটাও হাস্য-রসাত্মক হলেও চিত্রটা অবক্ষয়িত শিক্ষার পরিবেশের কথাই নির্দেশ করে।

Dhaka University Institutional Repository

শ্রেণিবিভক্ত সমাজে ধনী নির্ধনের সামাজিক অবস্থান যেমন একরূপ হয়না, তেমনই শ্রেণিসংগ্রামের নানা কাঁটা এখানে নিবদ্ধ। শওকত ওসমান তাঁর গল্প সাহিত্যে এই শ্রেণিচেতনার নানা অনুষঙ্গ ধারণ করার চেষ্টা করেছেন। একজন সমালোচক বলেছেন:

> গরীব মানুষ দ্বন্দ্বে যাবে সে সাহস কোথায়? যুগযুগান্তের মার খাওয়া মানুষ সে মান্য করতে শিখেছে, বিদ্রোহ করতে না শিখে বিদ্রোহ যে করেনি তা নয়, কিন্তু বিদ্রোহ সফল হয়নি দেখে ভাবতে প্ররোচিত হয়েছে যে, ভক্তিতেই মোক্ষ আছে, তর্কে কেবল বিড়ম্বনা।[২০]

"শ্রেণিবৈষম্যের কারণে আত্মীয়তা বিপন্ন হয়-জননীত্ব ম্লান হয়। এ প্রসঙ্গের স্ফূর্তি ঘটেছে 'ব্যবধান' গল্পে।"[২১] এ গল্পে লেখক রাশেদী নামক এক গ্রাম্য কৃষক তরুণের মর্মস্পর্শী কাহিনী বর্ণনা করেছেন। মামীর সঙ্গেই ছিল রাশেদীর রক্তের সম্পর্ক। বুদ্ধি হবার পর থেকে যাকে সে মাতৃজ্ঞান করছে সে তার আসল মা নয়, সে ছিল ফুফু। তার মামীই হচ্ছে আসল মা। ফুফু নিঃসন্তান বলে শ্বশুরের অনুরোধে মামী তার ননদকে ছয়মাসের বাচ্চা দিয়েছিল। এই হলোই রাশেদী। অভাবের দুর্বিপাকে পড়ে তার সেই জন্মদায়িনী মায়ের কথা মনে হয়। আপন মা হয়েও যিনি মামী মা তিনি নুরীবিবি বৃদ্ধ হয়েছেন। রাশেদীর এক ভাই ডেপুটি, আরেক ভাই বড় ব্যবসায়ী। বিরাট বাড়ি। এ রকম শান শওকত গ্রামে সে চোখে দেখেনি। চাকরের হাতে খবর পাঠালে বহুদিন পর মায়ের অপথ্য স্নেহের ধারায় সিক্ত হল রাশেদী। নুরীবিবি অনেক কান্নাকাটির পর আশ্বস্ত হলেন এবং সন্তানকে নানাভাবে আদর আপ্যায়নের ব্যবস্থা করলেন। নাতি শমসের নাতনী মনুজার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। রাশেদীর সঙ্গে বাড়ির লোকজন কেমন যেন ব্যবধান রেখে কথা বলে। তাদের সম্ভ্রম, আদব-কায়দা সে আর কতটুকু হেফজ করেছে। নুরীবিবি রাশেদীর জন্য বড় বউ এর কাছে চল্লিশটি টাকা চেয়ে ব্যর্থ হয়।

নুরীবিবি ছেলে রাশেদীকে জানায় এ বাড়িতে সেও পরবাসীর মত। ছেলে মেয়েরা উপরে থাকে। বৃদ্ধা নিচে। বাড়িতে তার কোন আধিপত্য নেই। হাত খরচা বলেও সে কিছু পায় না। বৌ-রা হাত তোলা যা দেয়, কোন রকমে তাতে জীবন রক্ষা পায়। পুত্রদের এ সব ঐশ্বর্যের কেউই সে নয়। ছেলেগুলোকে ভেড়া করে রেখেছে দুই বউ। দাদীর মন খারাপ দেখে নাতি শমসের চল্লিশ টাকা প্রদান করার জন্য মাকে অনুরোধ করে। বাবার প্রমোশনের সময় বাড়িতে কমিশনার আসবে। অশিক্ষিত চাচাকে দেখলে তারা খারাপ ভাববেন। বড় বউ শাশুড়ির হাতে চল্লিশ টাকা গুঁজে দিলে রাগে অভিমানে বৃদ্ধা তা মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। সেদিন রাত্রে বৃদ্ধার ঘরে আলোও জ্বলল না-কেউ তার খবরও নিল না।

Dhaka University Institutional Repository

এদিকে দহলিজে সন্ধ্যা পর্যন্ত বসে থেকে রাশেদী অন্ধকারের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ে। ক্ষুধার্ত শরীর, ভোরে ঘুম ভাঙল। একজন চাকরের হাতে নিজের বিদায় বার্তা পৌঁছে দেয়ার অনুরোধ করে সে দ্রুত দহলিজ থেকে বেরিয়ে যায়। সামনে দশ ক্রোশ পথ। মনে হল সে একাকী নয়। তার দু'পাশে দুজন সহযাত্রী। একজন জান্নাত বাসিনী মা, আর একজন ইহলোকবাসিনী জননী। এ-গল্পে সামাজিক ব্যবধান সার্থকভাবে তুলে ধরেছেন লেখক। এখানে জননীর স্নেহধারাও বিপন্ন হয়েছে বৈষম্যের কারণে। ঐশ্বর্যের পাহাড়ে বাস করেও জননী রাশেদীর মত কপর্দকহীন। এখানে শ্রেণি ব্যবধান রাশেদীকে জননীর স্নেহ থেকেও বঞ্চিত করেছে।

শওকত ওসমানের কিছু কিছু গল্পে নির্যাতিতের প্রতিবাদ ও বিদ্রূপ লক্ষ করা যায়। *উভশৃঙ্গ* গ্রন্থের 'নেমক হালাল' গল্পে প্রথম শ্রেণির ট্রেনের এক যাত্রীর কাছে ভিক্ষা চেয়ে ছিন্নমূল বালক সলিম, রহিম, ফতু নিরাশ হয়। অধিকন্তু ভদ্রলোক তাদের এক ঝলক গালিগালাজ করেন। রৌদ্রদগ্ধ ছেলেদের করুণ অবস্থা দেখে ভদ্রলোককে তাঁর স্ত্রী কয়েকটি পয়সা দিতে অনুরোধ করেন। তাতেও ভদ্রলোক আপত্তি করে বলেন যে, এরা অলস হয়ে যাবে।

আবার ভদ্রলোক যখন ডাব খেয়ে খোল বাইরে ফেলে তখন তারা শাঁসের জন্য খোল তুলে নেয়। কিন্তু কচি ডাবের ভিতর শাঁস না থাকায় বালকেরা রেগে কামরার মধ্যে ডাবের খোল ফেলে দিয়ে বলে:

> সালাম সাব। নোত্তাহালি ডাব নাইরকেলের দ্যাশ। আপনের ডাব আপনেই লয়া যান। সফরের কামে লাইগব।[২২]

শওকত ওসমানের সাহিত্যে শ্রেণিদ্বন্দ্ব ও শ্রেণিচেতনার প্রতিবিম্বন তাঁর সমাজবাদী সাহিত্যচেতনারই বহিঃপ্রকাশ। পরশ পাথরের মত পুঁজিবাদ যেটা স্পর্শ করে সেটা পরিণত হয় পণ্যে, যেখানে অবস্থান নেয়, সেখানে তৈরি হয় শ্রেণি। তাই দেখা যায়:

> গ্রাম থেকে শহরে এসে যে ছেলে ফার্স্ট হয়েছে, সেকেন্ড হয়েছে, বড় চাকুরি পেয়েছে অথবা বিলেত গেছে তার উন্নতিতে তার গ্রামের দূরে থাক তার বাপ মায়েরও যে মস্ত সুবিধা হয়েছে তা বোধ হয় নয়। সেও হারিয়ে গেছে শহরের অনেক মানুষের মধ্যে। তার গ্রাম বদলায়নি। বদলাক ওটা সে চায়ও না। তার স্বার্থ ও গ্রামের দরিদ্র মানুষের স্বার্থ অভিন্ন নয়, বরঞ্চ বৈরি একে অপরের।[২৩]

এ কারণে *মনিব ও তাহার কুকুর* গ্রন্থের 'গ্রহচ্যুত' গল্পের মিরাজ সরকার গ্রাম থেকে শহরে এসে লেখাপড়া শিখে চাকুরি-ব্যবসায় অগাধ সম্পত্তির মালিক হয়ে গ্রামে যাননি। রাখেননি দরিদ্র আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে সংশ্রব। তাই তিরিশ/বত্রিশ বছর পরে গ্রামে গিয়ে অপমানিত হয়েছে মিরাজ সরকার। শহরে অভিজাত পরিবেশে বেড়ে ওঠা তাঁর পুত্র-কন্যার সামনে যখন তারই সম্পত্তির অধিকার বঞ্চিত চাচাতো বোন বদ্ধপাগলী

Dhaka University Institutional Repository

হেলেনা বেগম উলঙ্গ হয়ে নাচানাচি শুরু করেছে-তখনই স্বজনদের সঙ্গে সখের ছবি তোলার আয়োজন ভণ্ডুল হয়ে গেছে। এটা হচ্ছে উঁচু শ্রেণির বিরুদ্ধে নিচুশ্রেণীর অভিনব প্রতিবাদ। মিরাজ সরকার গ্রামে বিলম্ব না করে শহরে চলে যায়।

উঁচুশ্রেণির বিরুদ্ধে নিচুশ্রেণির প্রতিবাদই দেখাননি শওকত ওসমান, সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশদের বিরুদ্ধেও দুঃস্থ-দরিদ্র মানুষের অভিনব প্রতিবাদের কথা লিখেছেন। ফাদার জোহানেস এর কথা বিবৃত হয়েছে *পিঁজরাপোল* গ্রন্থের 'থুতু' গল্পে। যে ফাদার এদেশের মানুষের জন্য টেকনিক্যাল ইন্সটিটিউট, কিন্ডার গার্টেন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন-সেবা করেছেন অজস্র মানুষের জন্য, সে ফাদারের বাবুর্চি মনসুর নিজে যক্ষ্মারোগী হয়ে মনিবের খাবারে থুতু মিশিয়েছে এবং প্রতিশোধ গ্রহণের বিকৃত পন্থা অবলম্বন করেছে। মনসুর 'থুতু' মিশানোর কারণ হিসেবে বলেছে:

> মেরা বহেন কো আপনে দেখা। বেগায়ের খানা মেরা দেশকা বহুৎ আদমী-মেরা-মা...।[২৪]

যে খানার অভাবে তার বোন মরেছে, মা মরেছে-মরেছে দেশের বহু লোক-সে খানা শাসক ও শোষকগোষ্ঠীর দোসর ফাদারের জন্য পরিবেশন করতে কুণ্ঠিত হয়েছে মনসুর। শওকত ওসমান এভাবে "শ্রেণিবিভক্ত সমাজে শ্রেণিসংঘাতের নানা পর্যায় পর্যন্ত অত্যন্ত সার্থকতার সঙ্গে তাঁর ছোটগল্পে রূপায়িত করেছেন। কখনও এগুলো মুক্তিকামী মানুষের প্রতিবাদ হিসেবে বিবৃত হয়েছে-কখনও বা হয়েছে অনুপ্রেরণার আধার।"[২৫]

শওকত ওসমান তাঁর গল্পে সামাজিক অবক্ষয়ের নানাচিত্র তুলে ধরেছেন। সমাজের উঁচুস্তরের মানুষ থেকে নিম্নশ্রেণির পেশাজীবী পর্যন্ত যারা অপরাধ-অপকর্ম সংঘটনে সংযুক্ত, তাদের প্রতিচ্ছবি পাওয়া যাবে তাঁর গল্পে। সামাজিক অবক্ষয়ের চিত্রে প্রথমেই বলতে হয় ঘুষ ও দুর্নীতির কথা। শওকত ওসমানের এই সমস্যার একটি গল্প হচ্ছে 'ইলেম'। গল্পটিতে দিন মজুর জহির মিয়ার কাছ থেকে পুলিশের ৫ টাকা ঘুষ নেয়ার চিত্র আছে। সারাদিন কাজ করে জহির মিয়া বাড়ি ফিরছিল সাম্পানে চড়ে। কাস্টম্‌স এর লোকজন লঞ্চ নিয়ে গিয়ে সাম্পান তল্লাশি করে দু'আনা ওজনের আফিম পায়। জহির মিয়া নিজে নিজে আফিম সেবন করে, কারণ ঔষধ খেয়ে রোগ ভাল না হওয়ায়– তার এই আফিম সেবন। পুলিশের লোকজন তাকে থানায় নিয়ে যাওয়ার হুমকি দেয়। শেষ পর্যন্ত পাঁচ টাকা ঘুষ দিয়ে রক্ষা। এ-গল্পে নগরবাসী শিক্ষিত সমাজের কদর্য মানসিকতার চিত্র গল্পকার সার্থকভাবে উপস্থাপন করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

পাশ্চাত্য সভ্যতার আলোকে অপসংস্কৃতির জোয়ারে ভেসে যাওয়া জীবনের চিত্র উপলক্ষ্য গ্রন্থের 'পত্নী-উপপত্নী' গল্পটি। মানব মনের আসক্তির স্পৃহা অনেক সময় আত্মক্ষয়ী জীবনবাসনায় রূপ নেয়– এই বাস্তব সত্য আমরা আমরা মি. ওজায়ের এবং মি. তস্‌কীন চরিত্র থেকে অনুধাবন করতে পারি। গল্পের কাহিনি সূত্রে জানা যায়– মদ্যশালায় মি. ওজায়ের এবং মি. তস্‌কীন বেশী মদ খাওয়া নিয়ে বাজি ধরেন। বেশী মদ খেয়ে যে মারা যাবে তার স্ত্রীকে জীবিত ব্যক্তি বিয়ে করবে– একথাও বাজির অন্তর্ভূক্ত ছিল। গল্প শেষে দেখা যায়, মি. ওয়াজের অতিরিক্ত মদ পানে মৃত্যুবরণ করলে মি. তস্‌কীন মিসেস ওজায়েরকে বিয়ে করতে উপস্থিত হয়। সে সময়ে মিসেস ওজায়ের-এর বক্তব্যে দাম্পত্য জীবনের শৈথিল্যের রূপটি প্রকাশ পেয়েছে– যা মানুষকে ধ্বংসের মুখোমুখি নিয়ে যায়। গল্পকারের ভাষায়:

> –আমাকে বিয়ে করেই ওজায়ের বেঘোরে মারা গেল। এখন ভেবে দ্যাখো তুমি আমাকে বিয়ে করবে কি না?
>
> –নিশ্চয়ই করব। আমিও মরতে চাই।[২৬]

নেত্রপথ গ্রন্থের 'ব্ল্যাকআউট' গল্পে মন্বন্তরকালীন নাগরিক জীবনের চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। গল্পে দেখা যায়, নিরন্ন মানুষ গ্রাম থেকে শহরে আসে ভাতের আশায়, অথচ শুধু ভাত নয়-ভাতের ফ্যান প্রাপ্তি থেকেও তারা বঞ্চিত হয়। তাদের এ-আর্তনাদ নগরের বিত্তবান মানুষের কর্ণকুহরে প্রবেশ করতে ব্যর্থ হয়। পূর্বে যে-গ্রাম থেকে খাদ্যশস্য শহরে আসত, আজ সে-গ্রাম থেকে বুভুক্ষু মানুষের মিছিল শহরে এস বিভিন্ন স্থানে অনাহারে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করছিল। লেখক শওকত ওসমান নগর জীবনের ভয়াবহ ও বিভীষিকাময় পরিবেশ উপমা সহকারে উপস্থাপন করেছেন:

> মৃত্যু তখন কঙ্কাল-রূপে লাঠি হাতে ঘুরে বেড়াত, বেড়াত পথে-ঘাটে মাঠে শহরের ফুটপাতে অলিতে-গলিতে। হাহাকার করে বেড়াত চারদিকে। শুনতে পাওয়া যেত কেবল কান্নার রোল। তারপর তাও ধীরে ধীরে কমতে লাগল। কারণ, কাঁদার জন্যে গলা, গলা লাগে, তাগদ লাগে। তা ফুরিয়ে যাচ্ছে, কান্নাও কমে আসতে লাগল। ধুঁকে ধুঁকে যেটুকু কাঁদা যায়, তা-ই শেষ আশ্রয়।[২৭]

নাগরিক জীবনে মানুষের চরিত্রের ভণ্ডামি, নীচতা, লাম্পট্যের বর্ণনা পাওয়া যায় *নেত্রপথ* গ্রন্থের 'খরচ তেরিজ' গল্পে। এ-গল্পে গল্পকার মানুষের লালসাবৃত্তিগত ঐক্যের চিত্র উপস্থাপন করেছেন। মানুষের বাহ্যিক পোষাক-পরিচ্ছেদ, শিক্ষা বা সামাজিক বৈসাদৃশ্য সত্ত্বেও মানুষের কদর্য প্রবৃত্তিতাড়না একই। গল্পে দেখা যায়– অফিস পিওন ইলামদ্দি তার বড় সাহেবের সাথে ঝুলাডাঙ্গা নামক স্থানে বেড়াতে যান। সেখানে গিয়ে তিনি অনেক খুশি হন, কারণ সেখানে তার পূর্ব পরিচিত এক দেহপসারিনী বাস করেন। পিওনটি রাতের আঁধারে

Dhaka University Institutional Repository

সেই রমণীর ঘরে গিয়ে স্বপ্নাহতের মতোই ফিরে আসেন, কারণ সে ঘরে তখন তার বড় সাহেব অবস্থান করছেন। গল্প থেকে উদ্ধৃতি:

> আমার বুক ধড়কাতে লাইগল। দেহি, একটা ধলা ঠ্যাং!!! বেডী তো ভূত-কালা। হাদা ঠ্যাং কার? চোখ তাইড়া তাইড়া তাকাই।...বা'ইরে বা'ই, এ ঠ্যাং তো চেনা-চেনা লাগে। এই এক বছর কত মালিশ দিছি, কতবার দাবাইছি। এ তো আমার নয়া সাবের ঠ্যাং।[২৮]

নাগরিক জীবনে মানুষের চরিত্রের কদর্যতার দিক এ-গল্পে উপস্থাপিত হয়েছে।

নেত্রপথ গ্রন্থের 'জনারণ্যে' গল্পে দেখা যায়– একজন মানুষের চরিত্রের ভণ্ডামির কদর্য দিকটি অপর সৎ মানুষের মহৎ চরিত্রের প্রভাবে পরিবর্তিত হয়। কলুষিত চরিত্র মহৎ চরিত্রের প্রভাবে একসময় আলোর স্পর্শ পায়। কারণ মানুষের মন বিচিত্র এবং সংবেদনশীল, আর বিচিত্র পরিবেশে মানুষের এই সংবেদনশীল মন আরও সংবেদনশীল হয়ে ওঠে। গল্পের কথক বিভিন্ন অজুহাতে বাসের ভাড়া কম দেওয়ায় অভ্যস্ত ছিল। কিন্তু একদিন পাশের আসনে বসা এক গরিব লোককে বাসের ভাড়া ঠিকভাবে পরিশোধ করতে দেখে তার চৈতন্যোদয় ঘটে– যা গল্প থেকে উদ্ধৃত হল:

> আমার চোখ সহযাত্রীর দিকে। সে এক টাকা বের করে কন্ডাক্টরকে দিলে।
>
> –'কত রাখব?'
>
> –'চার আনা রাখেন।'
>
> –'কোথা থেকে আসছেন?'
>
> –'মালীবাগ থেকে।'
>
> কন্ডাক্টর তখন বললে, "আমি ভেবেছিলাম সেগুনবাগিচা কি আর কোথাও থেকে চড়েছেন।"
>
> 'না'। সহযাত্রী বারো আনা খুচরা পয়সা নিতে নিতে জবাব দিলে। এবার আমার পালা।
>
> আমি একটা সিকি কন্ডাক্টারের হাতে দিয়ে দিলাম।[২৯]

অন্যদিকে *উভশৃঙ্গ* গ্রন্থের 'জাতক কাহিনী' গল্পে নাগরিক জীবনের আরেকটি কদর্য দিক উন্মোচণ করেছেন শওকত ওসমান তাঁর গল্পের অবয়বে। সভ্যনামধারী মানুষের বিবেকবর্জিত আচরণ প্রত্যক্ষ করা যায় 'জাতক কাহিনী' গল্পে। গল্পে দেখা যায়– অজ্ঞাত দুই নর-নারীর পাপাচারের ফসল এক নবজাতক শিশু পার্কের পরিত্যক্ত স্থানে পড়ে ছিল। সদ্যোজাত শিশুটি অনেক মানুষ– পাপী-তাপী, নেককার-বদকার, বেকার, পাহারাওয়ালা সবার দৃষ্টিগোচর হলেও তার ক্রন্দনে দর্শনার্থীর আন্তরাত্মা কেঁপে ওঠেনি। এমনকি সদ্যোজাত

Dhaka University Institutional Repository

শিশুটিকে কেউ কোলেও তুলে নেয়নি। শিশুটি নক্সী কাঁথা জড়িয়ে নির্বিকার ঘুমাচ্ছিল। এক পর্যায়ে– "অঘ্রাণের রোদ লাগতে সে হাই তুলে মোচড় মেরে পা-টা সটান করলে যেন সকলের মুখে লাথি মারবে।"[৩০] মূলত গল্পকার শওকত ওসমান প্রতীকের আশ্রয়ে দেখিয়েছেন সদ্যোজাত শিশুটি এ-সভ্য সমাজ ও মানুষের মুখে পদচিহ্ন এঁকে করুণ পরিণতি বরণ করল। পৃথিবীর আলো দেখার পূর্বেই মানুষের নিষ্ঠুরতার কারণে তাকে চিরবিদায় নিতে হয়েছিল। গল্পের ভাষায়:

> সেদিন সূর্য অস্ত গিয়েছিল। কারণ, পরদিন আবার সকাল হোলো, তেমনই অঘ্রাণের সকাল। পার্কের ধারে আর পরিত্যক্ত গোটা শিশুটা ছিল না। পড়ে ছিল তার টুকরো ছেঁড়াখোঁড়া অংশ। কুকুরের কর্তব্য কুকুর সম্পন্ন করেছে।[৩১]

নগর জীবনের আরেক কদর্যরূপ দেখা যায় 'গিরগিটি' গল্পে। প্রতারণা করতে গিয়ে অগ্নিদগ্ধ হয়েছিল অসৎ ব্যবসায়ী আবুল কাসেম। ইনসিওরেন্স কোম্পানির কাছ থেকে টাকা আদায়ের লোভে অফিসে আগুন লাগিয়ে আবুল কাসেম নিজেই অগ্নিদগ্ধ হয়েছিল। তার পোড়া গা গিরগিটের শরীরের মত বলেই লোকেরা তাকে গিরগিটি বলে শনাক্ত করে। গল্প থেকে উদ্ধৃতি:

> ওর সমস্ত দেহ পোড়া। মাংস কোথাও সাদা, কোথাও লালচে। কোথাও আস্ত আছে সামান্য। ঝল্‌সে গেছে সমস্ত শরীর। শুধু মুখ আর গলাটা স্বাভাবিক। আবছা আলোয় এই চেহারা দেখে আমার বমি চাপান দিয়ে উঠল।...আগুন দেওয়ার পর ওর মনে পড়ে গেল, খাতা আয়রন সেফে রয়ে গেছে। সেফ তো আর পুড়বে না। তখন আবার ঢুকতে হোলো আগুনের মধ্যে। খাতা পুড়িয়ে দিলে ঠিক। কিন্তু নিজেও বেটা কাবাব হোয়ে যায়। অনেক দিন পরে গিরগিটিকে দেখলাম।[৩২]

অর্থনৈতিক বিপর্যয় ও দারিদ্র্য দগ্ধতা মানুষের সুকুমার বৃত্তির বিকাশ আর প্রত্যাশাকে দীর্ণ করে কতদূর হীন কাজে নামিয়ে দেয় তার পরিচয় আছে *ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী* গ্রন্থের 'কুটিলা ভবেৎ', 'শিবগঞ্জের মেলা' ও 'স্বৈরিণী' গল্পে। 'কুটিলা ভবেৎ' গল্পে দেখা যায়– একটি বিদেশী ফার্মের কর্মকর্তা সাজেদের সহপাঠিনী মাহেলা। সাজেদের অফিসে একদিন মাহেলা আসে মামাতো ভাইয়ের চাকরীর তদবির নিয়ে। সাজেদের তদবিরে তার চাকরিও হয়। এরপর মাহেলার আসা যাওয়া থেকে সাজেদ মাহেলার প্রতি দুর্বলতা অনুভব করে, যা এক সময় রূপ নেয় প্রেমাকর্ষণের। মাহেলার পারিবারিক অবস্থা ভাল ছিলনা। দাঙ্গার কবলে পড়ে মাহেলার দরিদ্র পরিবার নিরাপদ আশ্রয়ে চলে গেলে সাজেদের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে দশ বছর কেটে যায়। এই দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে একদিন উত্তরবঙ্গের ঈশ্বরদি এলাকায় ফার্মের ইন্সপেকশনে সাজেদকে যেতে হয়। স্টেশনে দেখা হয় মাহেলার সঙ্গে। সাজেদ তার জন্য প্রতীক্ষায় রত বলে মাহেলাকে জানায়। কিন্তু অসচ্ছল

Dhaka University Institutional Repository

সংসারের মেয়ে মাহেলা জীবন ও জীবিকা, সংসারের গ্লানির টানে নিজের পবিত্রতা রক্ষা করতে পারেনি। সাজেদ মাহেলার দৈহিক পবিত্রতাকে তুচ্ছ জ্ঞান করলেও মাহেলা বলেছে:

> কত তুচ্ছ প্রলোভনে আমি কতজনের শয্যায় দৌড়ে গেছি...কিন্তু তোমার কাছে না। তা আমি পারবনা।...আমার মনও বিকৃত হয়ে গেছে। তা নিয়ে আমি তোমাকে অপমান করতে পারব না। আমি তোমার কাছে যেতে চেয়েছিলাম, অনাঘ্রাত সৌরভের মত, বাতাসও যেখানে অপরিচিত।[৩৩]

অভাব কিভাবে নারীর সম্ভ্রম বিপন্ন করে নগর সভ্যতার এ-দিকটি 'কুটিলা ভবেৎ' গল্পে শওকত ওসমান সার্থকভাবে উপস্থাপন করেছেন।

অন্যদিকে 'স্বৈরিনী' গল্পে সত্তরোর্ধ সঙ্গতি সম্পন্ন গৃহস্থ কুবাদ চৌধুরীর উপপত্নী মায়মুনার বেদনাময় কাহিনী বিবৃত হয়েছে। মায়মুনা ঠাকুরিয়া গ্রামের কৃষক কন্যা। হাসেম নামক যুবকের সঙ্গে প্রেমে ব্যর্থ হয়ে অন্যত্র বিয়ে করলেও তার ঘর ভেঙ্গে যায়। আরম্ভ হয় মায়মুনার অন্ধকার জীবনের পথ চলা। কুবাদ চৌধুরী বারবনিতা পল্লী থেকে মায়মুনাকে সংগ্রহ করে এবং একটি মহল্লায় বাসা নিয়ে তাকে রাখবার ব্যবস্থা করে। মনে মনে স্ত্রীর মর্যাদা দিলেও সামাজিকভাবে স্বীকৃতি পায়নি মায়মুনা। এমনকি বড় স্ত্রীর বর্তমানে কুবাদ চৌধুরীর বাড়িতে যাওয়ার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা ছিল। কিন্তু স্বামীর মৃত্যুশর্য্যায় মায়মুনা স্বামীর কাছে ফিরে যায় এবং পরিণামে অপমানিত হয়। শওকত ওসমান মায়মুনা চরিত্রের মনোবেদনা প্রকাশ করেছেন সার্থকভাবে:

> আগন্তুক মায়মুনা বিবি পৌঁছেই রোগীর পায়ের কাছে মাথা রেখে বলেছিলেন, "তোমার সঙ্গে হলফ করেছিলাম এই বাড়ীতে কোন দিন আসব না। আজ কারার ভেঙেছি আমাকে মাফ করো।"[৩৪]

মায়মুনার অন্ধকার জীবনে আলোর হাতছানি থাকলেও প্রগাঢ় অন্ধকারের মধ্যেই তার অবস্থান থেকে গেছে। মায়মুনা চরিত্রের সামাজিক অবস্থা নিরূপণে অনীক মাহমুদ মন্তব্য করেন:

> মায়মুনা বারোয়ারি পল্লী থেকে হাত ফেরতের কবল থেকে রেহাই পেলেও সামাজিক মর্যাদা পায়নি। এমনকি মৃত্যুপথযাত্রী স্বামীর বাড়িতেও জোটেনি সামান্য স্বীকৃতি বা সম্মান। অর্থনৈতিক দুরবস্থা ও দারিদ্র্য একজন অসহায় নারীকে কীভাবে আষ্টে পৃষ্ঠে বাঁধতে পারে মায়মুনা তারই এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।[৩৫]

নাগরিক জীবনের আরেকটি দিক হল ধর্মান্ধতা। শওকত ওসমানের কথাসাহিত্যে ধর্মীয় জীবনের নানা চালচিত্র ধরা পড়েছে। বিশেষ করে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর 'লালসালু'র আবদুল মজিদের মত যারা ধর্মকে

Dhaka University Institutional Repository

ইহলৌকিক স্বার্থ চরিতার্থতার জন্য ব্যবহার করে, তাদের ভণ্ডামির মুখোশ খুলে দেয়া হয়েছে শওকতের কথাসাহিত্যে। লেখক বলেছেন:

> ধর্ম যখন দৈনন্দিন জীবনধারার সঙ্গে অঙ্গীভূত হয় না, তখন তা নিতান্ত বাহ্যিক খোলসের রূপ পায়। আর তা অন্তরের জিনিস হয় না।[৩৬]

তাছাড়া শওকত ওসমান বিশ্বাস করেন:

> ধর্ম জীবনকে প্রভাবান্বিত করে। কিন্তু তা কখনও জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে না। অর্থাৎ ধর্ম নিয়ন্ত্রকের জায়গা পায়না কোনদিন।[৩৭]

অথচ একটি অনুভূতি ও বিশ্বাস লালিত প্রসঙ্গ নিয়ে উপমহাদেশে সমাজ, রাজনীতি ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বারবার শোষণ-সন্ত্রাস চালান হয়েছে। ব্যক্তিগত অধিকার ও বিশ্বাসের বস্তু ধর্মকে সামাজিকীকরণের মাধ্যমে একটা শোষণদণ্ড হিসেবে ব্যবহারের জন্য শওকত ওসমান বরাবরই পোষাকসর্বস্ব ধার্মিকতার বিরোধী ছিলেন। ধর্মকে সামাজিক রীতিপদ্ধতির সঙ্গে একীভূত করার জন্য সমাজপতিরা অনেক সময় একে হীনস্বার্থে ব্যবহার করে। কাজী মোতাহার হোসেন বলেছেন:

> লোকের মনে ধর্মের নামে একটি মোহ আছে, সেটি স্বাভাবিক। কিন্তু ধর্মের পরিধি বাড়াইয়া সমাজ বিধিকে ধর্মের অন্তর্গত বলিয়া ধরিয়া লইয়া এই সমাজ বিধির প্রতি মোহ জন্মিয়া গেলে অনর্থক বাড়াবাড়ি ও জঞ্জাল বৃদ্ধি ভিন্ন কিছুই হয় না।[৩৮]

আর এই বাড়াবাড়িটা বেশি পরিমাণে দেখা যায় ধর্ম যখন সমাজমানসে বদ্ধমূল ও সংস্কারের বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়।

শওকত ওসমানের ছোটগল্পেও ধর্মের নামে ভণ্ডামি, ধর্ম নিয়ে অযথা বাড়াবাড়ি, শোষণের মাধ্যম হিসাবে ধর্মের ব্যবহার এবং ধর্মের কল্যাণকর দিকের কিছু চিত্র পাওয়া যায়। ভণ্ডধার্মিক সেজে ইহলৌকিক ফায়দা লাভের জন্য সমাজে কিছু কিছু লোক সর্বদা ব্যাপৃত থাকে। বিশেষত রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এ দেশে মানুষকে ধোকা দেবার জন্য ধর্মকে নিরবচ্ছিন্ন ব্যবহার করা হয়েছে। একজন লেখক বলেছেন:

> তিনি (শওকত ওসমান) দেখেছেন মুসলিম ধর্মীয় রাজনীতির সাথে সাম্রাজ্যবাদী আঁতাত ও পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা। ধর্মীয় রাষ্ট্র পাকিস্তানে জাতিগত শোষণ ও ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশও ঘটেছে তাঁর চোখের সম্মুখে।[৩৯]

Dhaka University Institutional Repository

নাগরিক জীবনে অধিকাংশ মানুষ নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ধর্মকে ব্যবহার করে। *সাবেক কাহিনী* গ্রন্থের 'মো'জেজা' গল্পে ভোট পাওয়ার জন্য মোস্তফা খান নামক একজন উকিল দাড়ি রেখে নিজেকে পরহেজগার ব্যক্তি হিসেবে প্রচার করে। একজন ভণ্ড মৌলানার কাছ থেকেও মোস্তফা খান সাগরেদ হিসেবে প্রশংসাপূর্ণ সার্টিফিকেট সংগ্রহ করে সাধারণ জনগণের মাঝে বিতরণ করে। অথচ সার্টিফিকেট প্রদানকারী ধর্ম ব্যবসায়ী মৌলানা হাসিব উদ্দিন ফকরুল মোহাদ্দেসিনের ইতিহাস ছিল ন্যক্কারজনক।

গল্প থেকে জানা যায়– একদিন এক মক্তবের মৌলভির কাছে যুবকবেশী হাসিব তোতলার ভানে এলেম চায়। সে মৌলভির হাত পা জড়িয়ে ধরে কান্নাকাটি করে। তার এলেমে নাকি হাসিবের তোতলামি ভাল হবে। মৌলভি রাজি হয়ে তার থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করল। তারপর হঠাৎ একদিন দেখা গেল তার তোতলামি ভাল হয়েছে। তার ভাষ্য মতে, জিবরাইল (আঃ) তাকে আশীর্বাদ করে গেছে। তারপর হাসিব নামাজ পড়াল, আজান দিল। গ্রামময় প্রচার হয়ে গেল তার অলৌকিকত্বের কথা। হাজার হাজার মানুষ এল নানা সমস্যার সমাধান কল্পে। বহু আয়-রোজগারের পর একদিন হাসিব আর মক্তবের মৌলভি উধাও হয়ে গেল গ্রাম থেকে। ফেলে যাওয়া একটি ট্যাংকের তলায় প্রাপ্ত ঠিকানা থেকে খবর নিয়ে জানা গেল, হাসিব উদ্দিন ফকরুল একজন টাইটেল পাস মৌলানা; তারই কাছ থেকে প্রশংসাবাণী যোগাড় করে মোস্তফা খান এলাকায় নির্বাচনী প্রচার করল। নিজে এলাকায় না গিয়ে নকল দাড়ি লাগানো ছবি এবং সার্টিফিকেট লোক মারফত পাঠিয়ে দিল। ধর্মের নামে ভেক ধারণ করে সাধারণ মানুষের চোখে ধূলো দেয়া সহজ বলেই এই পথ অবলম্বন করেন বর্তমান নগরসভ্যতার সমাজপতিরা।

মনিব ও তাহার কুকুর গ্রন্থের 'ধর্মের দোহাই জবর' গল্পে বৈষয়িক স্বার্থসিদ্ধির জন্য এক নেটিভ ইঞ্জিনিয়ার নাগ সাহেব একে একে তাঁর তিন কন্যাকে ম্যাজিস্ট্রেট এ্যান্টনী রিচার্ডসনের সন্তুষ্টির জন্য ব্যবহার করেছিলেন। বড় মেয়ে মানসীর সঙ্গে রিচার্ডসনের প্রণয় ও বিবাহ হয়। ম্যালেরিয়ায় মারা যায় মানসী। তারপর মেজ মেয়ে মাধবীর সঙ্গে হয় ম্যাজিস্ট্রেটের প্রণয়। নাগ সাহেব মাধবীর বিয়ের ব্যাপারটি সম্পন্ন করার জন্য ম্যাজিস্ট্রেটকে নিমন্ত্রণ দিয়ে বিষয়টি উপস্থাপন করেন। এ সময় রিচার্ডসন বলেন:

> আমি মাধবীকে ভালবাসি। তা-তে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু আমি স্বপ্নে দেখলাম মানসীকে (তার আত্মার উপর শান্তি বর্ষিত হোক)। সে আমাকে বললে, আমার ছোট বোন মালতীর ভেতর আমার রিবার্থ (পুনর্জন্ম) হয়েছে। আমার সব ওম্যান্‌হুড (নারীত্ব) নিয়ে এখন আমি আমার বোনের আত্মার ভেতর আছি। তুমি ওকে বিয়ে করো। আমার কথা

Dhaka University Institutional Repository

খেলাপ করো না। উপরি উপরি তিন দিন দেখলাম একই স্বপ্ন। স্বপ্নের ব্যাপারে পৃথিবীর সব ধর্ম এক। কারণ ভবিষ্যদ্বাণী দৈববাণী।[৪০]

ব্রিটিশদের কাছ থেকে সুবিধা আদায়ের জন্য এদেশীয় স্বার্থান্বেষী লোকজন মর্যাদাহীন কর্মকাণ্ডে বরাবরই লিপ্ত ছিল। নাগ সাহেব এ ধরনের হীন স্বার্থান্বেষী পদলেহী একটি চরিত্র।

উপলক্ষ্য গ্রন্থের 'যোগাযোগ' গল্পে দেখা যায়– ধর্ম রক্ষার চেয়ে ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা রক্ষা করার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। গল্প থেকে জানা যায়, অনেক সময় জীবিকার ক্ষেত্রে ধর্ম কর্ম মূখ্য ভুমিকা পালন করে না। মসজিদের ইমামের বেতন দিতে কষ্ট হচ্ছে গ্রামবাসীদের। একদিন এক মাতাল তাড়ি খেয়ে মসজিদের ছাদে উঠে আজান দিল। কণ্ঠ ভাল বলে গ্রামবাসীরা মাতালকেই ইমাম বানানোর সিদ্ধান্ত নেয়। এতে আসল ইমামের চাকরি চলে যায়। মাতাল লোকটি ইমাম হলেও য়খন সে জানতে পারে তার আজান দেওয়ার কারণে অন্য একটি পরিবার পথে বসেছে তখন সে সাবেক ইমামকে নিজ পদে ফিরিয়ে নিয়ে আসে। "ধর্মকে মুক্তবুদ্ধি ও স্বচ্ছ জীবনজিজ্ঞাসায় গ্রহণ না করে অন্ধ আবেগে যদি এর দিকে অনুরক্ত হওয়া যায়, তাহলে সেখান থেকে বড় কিছু প্রত্যাশা করা যায় না।"[৪১] জীবন জীবিকা যেখানে সমস্যা সংকুল ধর্মীয় চেতনা সেখানে প্রধান হয়ে ওঠে না। শওকত ওসমান বলেছেন:

এই দরিদ্র দেশে গত হাজার বছর ধরে এক মুঠো অন্ন, মাথা গোঁজার এক ফালি ঠাঁই যখন মানুষের কাছে পরম আরাধ্য বস্তু হয়ে রয়েছে, সেখানে নিছক আধ্যাত্মিকতা, সৌন্দর্য জ্ঞান ইত্যাদির বুলি পরিহাসের মত ঠেকতে পারে।[৪২]

এ কারণে ভাঁড়ামির মত ধর্মীয় গোঁড়ামিও একই রকম ক্ষতিকর জিনিস। *সাবেক কাহিনী* গ্রন্থের 'হুকুম নড়েনা' গল্পে ধর্মীয় গোঁড়ামির চিত্র প্রকটিত হয়েছে। নিঃসন্তান আজিম মল্লিক ১৩৫০ এর দুর্ভিক্ষের সময় শহর থেকে আসার পথে একজন 'দুঃস্থ' মহিলার কাছ থেকে একটি শিশু ২৫ টাকায় কিনে নেন। মেয়েটি তাঁর যত্নে ও তত্ত্বাবধানে বড় হয়। অতঃপর বিয়ের সময় মৌলভি বাবার নাম ছাড়া মেয়ের কলেমা পড়াতে অস্বীকৃতি জানায়। অথচ আজিম মল্লিক মেয়েটিকে কেনার সময় বাবার নাম জিজ্ঞাসা করেননি। হাদিসে পিতার নাম ছাড়া কলেমা পড়ানোর নিয়ম নেই বলে মৌলভি অপারগতা প্রকাশ করে। ধর্ম ইনসাফ আর মানবতার প্রকাশক হলেও আচারসর্বস্বতা ও কড়া শাস্ত্রীয় বিধান অনুকরণের জন্য অনেক সময় জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য ব্যাহত হয়। মানুষকে ঘৃণা করে মানবতার মৃত্যু ঘটিয়ে যারা ধার্মিকতার দোসরতা করে, নজরুল ইসলাম তাদের উদ্দেশ্যে বলেছেন:

মানুষেরে ঘৃণা করি,

Dhaka University Institutional Repository

ও' কারা কোরান, বেদ, বাইবেল চুম্বিছে মরি মরি।
...পূজিছে গ্রন্থ ভণ্ডের দল-মূর্খরা সব শোনো।
মানুষ এনেছে গ্রন্থ, গ্রন্থ আনেনি মানুষ কোনো।[৪৩]

ধর্মীয় গোঁড়ামির একটি পরিস্কার চিত্র পাওয়া যায় *পুরাতন খঞ্জর* গ্রন্থের 'শিয়া সুন্নীর পূর্বপুরুষ' গল্পে। এ গল্পে জৈন ধর্মালম্বীদের শিয়া সুন্নীর পূর্বপুরুষ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ইসলামে দেখা যায় শিয়া-নুন্নি মতাবলম্বীদের মধ্যে পরস্পর অহি-নকুল সম্পর্ক। ধর্মান্ধতা আপনপর বিবেচনা করে না। যে অন্ধকারের মধ্যে পৈশাচিকতা নিমগ্ন থাকে, ধর্মান্ধতা সেই কুশ্রীতাকে টেনে তুলে। প্রয়োজনে আপন জনের রক্তে হোলি খেলেও ধর্মান্ধ ব্যক্তি নিজের উদ্দেশ্য হাসিল করে।

শওকত ওসমান ইতিহাসের পরিসর থেকে এরূপ অভিব্যক্তিত্বের ছায়ায় রচনা করেছেন 'হন্তারক' গল্প। *হন্তারক* (১৯৯০) শীর্ষক গ্রন্থে সংকলিত একমাত্র গল্প 'হন্তারক' লেখা হয়েছে নাটকীয় ভঙ্গিতে। খোজা প্রহরী গেজু ও হিজুর কথোপকথনের মধ্য দিয়ে গল্পের শুরু। তারা মোগল হেরেমের পাহারাদার। রাজ বৈদ্য কর্তৃক তাদের খোজা বানানো হয়েছে। তারা হেরেমের নারীদের পাহারা কার্যে নিয়োজিত। বাস করেন গোলাম হাবেলীতে। তারা না পেয়েছে জীবনে মুক্তির আস্বাদ, না পেরেছে গোলাম হাবেলীর বাইরে যেথে। তাদের তাজমহল দেখার মত সুযোগও ঘটেনি। তবে গেজুর শৈশবে দেখা ইলিশবিলের কথা মনে পড়ে। বাংলাদেশের সিলেটের একটি নদীর নাম ইলিশবিল। জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনীতে লেখা আছে খোজা প্রহরী বানানোর জন্য এই জেলা থেকে বালক সংগৃহীত হত। লেখক এ গল্পে ভ্রাতৃহন্তা আওরঙ্গজীব ও দারাশুকোকে ছায়ামূর্তির ভেতরে এন তাঁদের কৃতকর্মের ফিরিস্তি প্রদান করেছেন। ১৬৫৯ সালে দারাকে হত্যা করা হয়। ১৭০৭ সালে মারা যান আওরঙ্গজীব। ঊনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে জীবনকীর্তির ধ্বংসাবশেষে এই দুই মোগল রাজপুরুষকে সামনে হাজির করে তাঁদের কর্মের সত্যতা প্রদর্শন করেছেন লেখক।

আওরঙ্গজীব ধর্ম ও ইসলামি জীবনবিধানে অভ্যস্ত ছিলেন। কিন্তু তিনিই সিংহাসনকে কন্টকমুক্ত করার জন্য মুরাদকে নিজ হাতে শরাব পান করান। বড় ভাই দারাকে হত্যা করেন। 'লা-ইলাহা' (আল্লাহ নেই) বলে দিল্লীর রাস্তায় চিৎকার করে বেড়ানোর দায়ে ফকির মারমাদকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলেন। এ গল্পে মোগল স্মৃতি বিজড়িত নানা জায়গায় উপস্থিত হয়ে এই দুই ভ্রাতৃছায়ামূর্তি তাদের কৃতকর্মের ভালোমন্দ পর্যালোচনা করেছেন। শেষ মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহ সিপাই বিদ্রোহের কারণে পরিবারের লোকজন নিয়ে হুমায়ুনের সমাধিসৌধের ভেতরে অবস্থান নেন। ইংরেজ গুপ্তচর বাহিনীর প্রধান উইলিয়াম স্টিফেন তা জানতে পেরে সিপাহী নিয়ে সমাধি ঘিরে ফেলেন এবং সম্রাটকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করেন। এই গোয়েন্দা অফিসার নিজ

Dhaka University Institutional Repository

হাতে সম্রাটের দুই পুত্রকে গুলি করে হত্যা করে। বাহাদুর শাহ কবিতা লিখতেন জেনে আওরঙ্গজীব তাঁকে বিদ্রূপ করেন। এরপর মানুষকে খোজা বানাবার হীনতম প্রচেষ্টার কথা বলা হয়েছে। মানুষকে হত্যা করে, মানুষের উপর জুলুম করে খোদার ঘর মসজিদ বানানোর প্রসঙ্গ এনে দারা বলেছেন যে, আওরঙ্গজীব লাহোরে যে মসজিদ বানিয়েছিলেন তাকে শিখ নেতা রঞ্জিত সিংহ বারুদখানা বানিয়েছিল। দারার তৈরি চকবাজার এখনো নরনারীদের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর চাহিদা মিটিয়ে চলেছে। অবশেষে তারা যমুনা নদীর তীরে একটি জায়গায় উপস্থিত হয়। সেখান থেকে গায়েবী আওয়াজ হয়, আমি জারজ, বেজন্মা, হারামজাদা, ভ্রাতৃঘাতী, নারীঘাতী, জননী-ভগিনী ধর্ষক, আমি অজাচারী, জঘন্য ঘৃণ্য-ঘৃণ্য, ঘৃণ্য ইত্যাদি। মহলে যেন কোন বেজন্মা হরামজাদা জন্মাতে না পারে, সে কারণে খোজা প্রথা প্রচলিত ছিল। কিন্তু ফতোয়ায়ে আলমগীরীর লেখক আওরঙ্গজীব এ ব্যাপারে কোন ফতোয় দিতে পারেননি। যে মুহূর্তে গায়েবী আওয়াজের তোড়ে আওরঙ্গজীব ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন ঠিক সেই মুহূর্তেই খোজা প্রহরীদ্বয় হিজু-গেজু জাগ্রত হয়ে উঠেছে এবং কথোপকথনে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। তাদের মধ্যে গেজুর ইলিশবিলের স্বপ্ন ও স্মৃতিময়তা ধরা পড়ে। ধর্মান্ধতা সুস্থচেতনার পরিপন্থী বলেই ইতিহাসের লৌহমানব আওরঙ্গজীবকে স্বজন-স্বজাতির হন্তারক হিসেবে চিহ্নিত হতে হয়েছে।

> মানুষের ইতিহাস শোষক-শাসকশ্রেণী সব সময়েই কোন না কোনভাবে ধর্মকে নিজেদের শ্রেণিস্বার্থে ব্যবহার করে এসেছে। এক একটি ধর্মের উত্থানের যুগে তৎকালীন আর্থ-সামাজিক কারণে ও পরিস্থিতিতে তাদের কিছু কিছু প্রগতিশীল ভূমিকা থাকলেও সেই ধর্ম যখন সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করে, তখন তাকে শোষক-শাসকশ্রেণি নিজেদের সার্থে ব্যবহারের চেষ্টা করে।[৪৪]

ধর্মের দোহাই দিয়ে মানুষকে নানাভাবে প্রতারিত ও শোষণ করা হয়েছে এমন বিষয়ের চিত্রণ শওকত ওসমানের ছোটগল্পে লক্ষ করা যায়।

ধর্মীয় সংস্কারের দোহাই দিয়ে সুবিধা লাভের দৃষ্টান্ত *উভশৃঙ্গ* গ্রন্থের 'শকুনের চোখ' গল্পটি। গল্পের কথক জ্বালানি সমস্যায় ভোগেন। অথচ একই জায়গায় চাকরি করে তাঁর প্রতিবেশীর কোন কাঠের খড়ির অভাব নেই। কথকের স্ত্রী কয়েকটি গাছের ডাল কাটার পরামর্শ দিয়েছিলেন। এতে গাছের কোন ক্ষতি হতনা। বিবেকের তাড়নায় কথক সেটা পারেননি। অথচ দেখা গেল বাড়ির পাশের শিমুল গাছটি কথকের প্রতিবেশী কেটে ফেলল। কাটার কারণ জিজ্ঞাসা করলে সে বলেছে:

> শকুনের চেহারা বড় খারাপ। একদম কুযাত্রা। ফজরে উঠলেই শকুনের মুখ চোখ দেখতে হতো। আগে ভাবলাম ডাল কাটলেই চলবে। কিন্তু অত বড় গাছে একটা ডাল কাটলে ত চলবেনা। এত বড় গাছে বারবার উঠে কাটার হাংগামা পোয়াবে কে? তার চেয়ে এটাই ভালো হলো না? আপনি কি বলেন?[৪৫]

Dhaka University Institutional Repository

নিজের জ্বালানির সমাধান কল্পে যে গাছটি কাটার মূখ্য উদ্দেশ্য সেটাকে একটা সংস্কারের উপর ছেড়ে দেয়া কপটতা ছাড়া কিছুই নয়। এ গ্রন্থের 'ষাঁড়' গল্পেও ধর্মের অজুহাতে ষাঁড়ের অত্যাচারকে মেনে নেয়ার কারণ বর্ণিত হয়েছে। হরিপদ বাবুর দোকানে ষাঁড় ঢুকে প্রতিদিন চাল-ডাল এটা ওটা নষ্ট করত। একদিন হরিপদ বন্ধুক দিয়ে ষাঁড়টাকে তাড়া করলে একটা বড় লোকের বাড়িতে গিয়ে ষাঁড়টা দাঁড়াল। ভদ্রলোকেরা জানাল যে, এটাকে মারলে বিপদ হবে। এটা তাদের বাবার নামে উৎসর্গিত। এরপর হরিপদ দোকান উঠিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। ধর্মের নামে অত্যাচার চালানো সমাজের উচ্চশ্রেণির একটি স্বাভাবিক প্রবণতা। হরিপদকে মুষিকবৎ বেকারের জীবন বেছে নিতে হয়েছে ধর্মীয় ষাঁড় ও তার প্রতিপালকদের অধর্মচারিতার জন্য।

অন্যদিকে *সাবেক কাহিনী* গ্রন্থের 'খোওয়ার' গল্পে একজন ভণ্ড পিরের ধর্ম নিয়ে ছিনিমিনি খেলার কাহিনী পাওয়া যায়। এখানে পির হরকতুল্লা একজন মুরিদের স্ত্রী রাবেয়াকে ইদ্দতকালীন সময় অতিবাহিত হওয়ার আগে বিয়ে করেছিল। মুরিদ ঝোঁকের মাথায় স্ত্রীকে তালাক দিয়ে ফেলে। ইসলামের নিয়ম হচ্ছে বায়ান তালাকের পর আবার পরপুরুষের সহবাস শেষে ইদ্দতকাল বাদ নতুন নেকাহর ব্যবস্থা করা যাবে। এই পীর মুরিদের স্ত্রী রাবেয়াকে এভাবে নেকাহ করে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে আর তালাক দেয়নি। একদিন দুঃস্বপ্নের সময় গলাটিপে রাবেয়াকে সে হত্যা করে। যে পীর মুরিদের কাছে জাগতিকতার অসারতা প্রমাণের জন্য বেহেস্তের হুর পরীদের গল্প করত, লোভ দেখাত, সেই পীর নারীর প্রতি লোভাতুর হয়ে এরূপ হীনকর্ম করতে দ্বিধাগ্রস্ত হয়নি। বর্তমান সমাজেও এহেন ভণ্ড পীরের কুকীর্তির কাহিনী নানা সময় নানা পরিসরে শোনা যায়।

এছাড়া *উভশৃঙ্গ* গ্রন্থের 'কিংবদন্তী' গল্পে ধর্মীয় কূপমন্ডুকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ লক্ষ করা যায়। নরবলি থেকে একটি বালিকাকে উদ্ধার করতে গিয়ে ভৃত্য তার পুরোহিতকে হত্যা করে। গল্পকারের ভাষায়:

> হঠাৎ হকচকিয়ে পুরোহিত জিজ্ঞাসা করে , "তুমি কে মা?"
> "মুর্খ তুই আমাকে কি করে চিনবি। তুই পুরোহিত নস, তুই জল্লাদ। তোর হাতে কত মৃত্যু হয়েছে তার ঠিক আছে! তুই কি করে আমাকে চিনবি?"
> "সে ত তোমার আদেশ মা।"
> "মুর্খ, মানুষ মেরে ধর্ম রক্ষা, আমার আদেশ?" খিলখিল হেসে উঠল বালিকা এবং বললে, "এমন শাস্ত্রে আগুন লাগিয়ে দিস্‌নি কেন?"...

Dhaka University Institutional Repository

বাগদী ভৃত্য তখন পাল্টা জবাব দেয়, "মৃত্যুর রাস্তা তৈরী করে তাকে তুই বলিস শাস্ত্র, ধর্ম? নরাধম। বহু দিনের ঝাল আজ ঝেড়ে নিই। দরিদ্রের কত সন্তান তুই বধ করেছিস। কিন্তু তোর সঙ্গে তর্ক বৃথা"– সে আর কথা বলে না। খড়্গ চলছে। পুরোহিতের দ্বিখণ্ডিত দেহ লুটিয়ে পড়ল।[৪৬]

অসত্য ধর্মীয় আচার মানুষের প্রকৃত মনুষত্বকে যেমন কেড়ে নেয়, ঠিক তেমনি শুদ্ধ ধর্মবোধ মানুষকে সৎ পথের সন্ধান দেয়– যা 'কিংবদন্তী' গল্পে উপস্থাপিত হয়েছে।

শওকত ওসমান ব্রিটিশ, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ– এ তিন কালপর্বের নাগরিক জীবনকে অর্থাৎ নগরবাসীর হাসি-কান্না, তাদের আবেগ-অনুভূতি, বিবেকের যাতনা, স্বার্থপরতা, ধর্মান্ধতা-সর্বোপরি মানবিকতার অনুভূতি পরিস্ফুটিত করেছেন তাঁর ছোটগল্পের নির্মাণশৈলীতে। শওকত ওসমান বাংলাভাগোত্তরকাল থেকে ছোটগল্পে সমাজ, রাষ্ট্র, ব্যক্তির সংকট এবং সমকালীন আন্দোলনের সমান্তরালে তাঁর জীবনভাবনা বিন্যস্ত করেছেন। তাঁর ব্রিটিশ কালপর্বের গল্পের উপাদান অর্থাৎ গ্রামজীবনমুখিতা, পাকিস্তান কালপর্বের নাগরিক জীবনের স্বরূপ-সন্ধানে বাঁক পরিবর্তন করেছে। এ পর্বের গল্পে নর-নারীর সম্পর্ক, মধ্যবিত্তের সংকট এবং মানবমনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার জটিল গ্রন্থি উন্মোচিত হয়েছে। আধুনিকতার ছোঁয়া এবং নাগরিকতার সংস্পর্শে চরিত্রগুলোর মধ্যে বিভিন্ন জটিলতা পরিলক্ষিত হয়। তিনি তাঁর ছোটগল্পে নাগরিক জীবনের নানা অসঙ্গতির চিত্রায়ণ করে উত্তরণের চেষ্টা করেছেন সর্বান্তকরণে।

তথ্যসূত্র

১. আমিনুর রহমান সুলতান, *বাংলাদেশের উপন্যাস: নগরজীবন ও নাগরিক চেতনা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৩, ভূমিকাংশ।

২. আমিনুর রহমান সুলতান, পূর্বোক্ত।

৩. আমিনুর রহমান সুলতান, পূর্বোক্ত।

৪. আনোয়ারুল ইসলাম, *বাংলাদেশ : সমাজ সংস্কৃতি সভ্যতা*, বাংলা একাডেমি, ১৯৭৭, ঢাকা, পৃ.৬৪।

Dhaka University Institutional Repository

৫. ড. আবদুল করিম, *মোঘল রাজধানী ঢাকা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ. ৭।

৬. বাংলা বিশ্বকোষ, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম সংস্করণ, ১৯৭৫, পৃ. ৬৭৪।

৭. কাজী আনোয়ারুল হক, *তিন পতাকার তলে*, ১৯৯২, পৃ. ১৫৯।

৮. মোহাম্মদ জাহিদ হোসেন, *বাংলাদেশের ছোটগল্প : জীবন ও সমাজ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ৯১।

৯. ড. উমা মাজি, *উনিশ শতকের প্রথম পাদে বঙ্গ সমাজ ও সাহিত্যে ভাব-সংঘর্ষ*, দেজ পাবলিশিং, ১৯৯৭, কলকাতা, পৃ. ১৪।

১০. শওকত ওসমান, *শওকত ওসমান গল্পসমগ্র* (সম্পা. বুলবন ওসমান), সময় প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৩, 'উভসঙ্গী' (*প্রস্তরফলক)*, পৃ. ২৩৬ ।

১১. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'উদ্‌বৃত্ত', পৃ. ২৪৬।

১২. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'উদ্‌বৃত্ত', পৃ. ২৪৬।

১৩. রফিকউল্লাহ খান, 'নবমাত্রিক চেতনায় উৎসমুখ' ; *সোমেন চন্দ্রের গল্প ও গল্পপাঠ* (সম্পা. আমিনুর রহমান সুলতান), ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ৪৫৪।

১৪. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'দুই চোখ কানা' (*জুনু আপা ও অন্যান্য গল্প)*, পৃ. ১৭০।

১৫. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'সৌদামিনী মালো' (*উভশৃঙ্গ*), পৃ. ৩৯৮।

১৬. ড. মো. আব্দুর রশীদ, *শওকত ওসমানের ছোটগল্প : সমকাল, জীবনবৈচিত্র্য ও শিল্পরূপ*, দিকদর্শন প্রকাশনী লি., বাংলাবাজার, ঢাকা, ২০১৫, পৃ. ১৯১।

১৭. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, '*নেত্রপথ*' (*নেত্রপথ)*, পৃ. ৩০৩।

১৮. নাজমা জেসমীন চৌধুরী, 'জীবিকার সন্ধানে নারী', 'বিচিত্রা', ঢাকা, ৮ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, জুলাই ১৯৭৯।

১৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'নৈবেদ্য', সত্তর সংখ্যক কবিতা দ্রষ্টব্য।

২০. সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১, তয় খণ্ড*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ৬৭।

২১. অনীক মাহমুদ, *বাংলা কথাসাহিত্যে শওকত ওসমান*, ইউরেকা বুক এজেন্সী, রাজশাহী, ১৯৯৫, পৃ. ১২৬।

২২. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত,'নেমক হালাল' (*উভশৃঙ্গ)*, পৃ. ১৮৪।

২৩. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬।

Dhaka University Institutional Repository

২৪. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, ' থুতু' *(পিঁজরাপোল)*, পৃ. ৮৭।

২৫. অনীক মাহমুদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৮।

২৬. শওকত ওসমান, *উপলক্ষ্য*, 'পত্নী-উপপত্নী', ওয়ার্সী বুক কর্পোরেশন, ঢাকা, ১৯৬৫, পৃ. ৩৬।

২৭. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'ব্ল্যাকআউট' *(নেত্রপথ)*, পৃ. ৩৫৪।

২৮. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'খরচ তেরিজ', পৃ. ৩৩৬।

২৯. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'জনারণ্যে' পৃ. ২৯৬।

৩০. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'জাতক কাহিনী' *(উভশৃঙ্গ)*, পৃ. ৪৩৯।

৩১. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'জাতক কাহিনী', পৃ. ৪৪০।

৩২. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'গিরগিট' *(নেত্রপথ)*, পৃ. ৩১০।

৩৩. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'কুটিলা ভবেৎ' *(ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী)*, পৃ. ৬৪৩।

৩৪. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'স্বৈরিণী', পৃ. ৬৮৫।

৩৫. অনীক মহমুদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৩।

৩৬. শওকত ওসমান, *ইতিহাসে বিস্তারিত*, তুরহান স্মৃতিলোক, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ. ১৭।

৩৭. শওকত ওসমান, *পূর্ণ স্বাধীনতা চূর্ণ স্বাধীনতা*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯০, পৃ. ৭৮।

৩৮. কাজী মোতাহার হোসেন, 'ধর্ম ও সমাজ', *সঞ্চরণ*, সেবা প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৬৯, পৃ. ১৭৫-১৭৬।

৩৯. জুলফিকার মতিন, 'শওকত ওসমান ও আমাদের অর্জন', সরকার আশরাফ (সম্পাদিত), *নিসর্গ*, বগুড়া, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১ম সংখ্যা (শওকত ওসমান সংখ্যা), ফাল্গুন, ১৩৯৭, পৃ. ৬৭।

৪০. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'ধর্মের দোহাই জবর', *মনিব ও তাহার কুকুর*, পৃ. ৭৬-৭৭।

৪১. অনীক মাহমুদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫২।

৪২. শওকত ওসমান, *ইতিহাসে বিস্তারিত*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯।

৪৩. নজরুল ইসলাম, 'মানুষ', *সাম্যবাদী*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩।

৪৪. বদরুদ্দীন উমর, *বাংলাদেশে ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার*, চিরায়ত প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৮৯, পৃ. ১০০।

৪৫. শওকত ওসমান, পূওর্বাক্ত, 'শকুনের চোখ', *উভশৃঙ্গ*, পৃ. ৪৩৮।

৪৬. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'কিংবদন্তী', পৃ. ৪২৭-৪২৮।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শওকত ওসমানের রাজনীতিচেতনা

রাজনীতি রাষ্ট্রীয় জীবনের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। কারণ, আর্থ-সামাজিক, ভূ-কাঠামো এমনকি সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলও রাজনীতি দ্বারা আলোড়িত হয়। শওকত ওসমান (১৯১৭-১৯৯৮) সাহিত্যশিল্পী হিসেবে পরিচিতি

Dhaka University Institutional Repository

পেলেও সমাজ-রাজনীতির অন্দর মহলে ছিল তাঁর অগাধ বিচরণ। তিনি সরাসরি রাজনীতি না করলেও এ বিষয়ে ছিলেন তীক্ষ্ণ দূরদৃষ্টিসম্পন্ন। "এ-উপমহাদেশের রাজনৈতিক উত্থান-পতন এবং আলোড়ন-বিলোড়নেরও অঙ্গাঙ্গী সহচরের ভূমিকা পালন করেছেন তিনি– কখনো রাজপথে সরাসরি নেমে এসে, কখনো নেপথ্যে থেকে, কখনো বা স্বসৃষ্ট রচনার ভেতর দিয়ে। তাই শওকত ওসমানের জীবন এবং আমাদের দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক ইতিহাস সমান্তরাল।"[১] তিনি ব্রিটিশ কালপর্ব, পাকিস্তান কালপর্ব এবং বাংলাদেশ কালপর্বের রাজনীতির প্রত্যক্ষদর্শী। তিনি গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন– "এই যুগে রাজনীতি ছাড়া সমাজ বদলানো সম্ভব নয়। কিন্তু সেই রাজনীতির ভিত্তি হবে ব্যাপক সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির, পেশার মানুষের স্বীকৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত।[২] একটি বিষয় অবশ্যই স্বীকার্য, আধুনিক যুগে রাজনীতি এক গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ এবং সমাজ ও রাষ্ট্রকাঠামোর প্রত্যেকটি স্তরই রাজনীতি দ্বারা আলোড়িত। তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা সম্পর্কে যতীন সরকারের মূল্যায়ন স্মরণযোগ্য:

> সাহিত্যিকের শিল্পদৃষ্টি ও মননশীলতা নিয়ে শওকত ওসমান গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, সাম্প্রদায়িকতা, সাম্রাজ্যবাদ, বাংলাদেশের ইতিহাস-ঐতিহ্য, মুসলিম বিশ্বের গতি-প্রকৃতি ইত্যাদি বিষয়ের অন্দরমহলে যে-ভাবে প্রবেশ করতে পারেন ও এসবের নাড়ি-নক্ষত্রের পরিচয় টেনে বের করতে পারেন আশ্চর্য কুশলতায়, সে রকমটি একজন পেশাদার রাজনীতিকের পক্ষে সম্ভব নয়,- এমন কি তিনি মার্কসবাদের প্রতি নিবেদিতচিত্ত হলেও না। দেশ-বিদেশের অনেক মার্কসবাদী পণ্ডিত, তাত্ত্বিক ও রাষ্ট্রনেতারাও যে নানা ধরণের প্রতিবন্ধের শিকার হয়ে অনেক অনর্থ ঘটান- সে সবের দৃষ্টান্ত তো আমাদের চোখের সামনেই আছে। দেশী-বিদেশী সে সব দৃষ্টান্ত থেকে শওকত ওসমান সঠিক শিক্ষাটি তুলে ধরে সচেতনতার বিস্তার ঘটাতে চেয়েছেন। এখানেই পেশাদার ইতিহাসবিদদের থেকে শওকত ওসমানের পার্থক্য।[৩]

শওকত ওসমানের ছোটগল্পে জীবন চলার পথের এবং জাতীয় জীবনের বিভিন্ন চিত্রের সন্নিবেশ ঘটেছে। মূলত তাঁর ছোটগল্পগুলো ব্রিটিশ, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ আমলের সামাজিক দায়বদ্ধতার ফসল। "তাঁর ছোটগল্পে তিন কালের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক বাস্তবতা বিদ্যমান। ফলে তিন কালের গল্পগুলো পৃথক পৃথক বৈশিষ্ট্য ধারণ করে আছে। গল্পগুলোতে রাজনৈতিক সচেতনতা, সমাজমনস্কতা, বস্তুবাদী ও যুক্তিবাদী দৃষ্টিকোণের সন্ধান পাওয়া যায়।"[৪]

বাংলা তথা ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসন (১৭৫৭-১৯৪৭) ছিল খুবই ঘটনাবহুল ও তাৎপর্যপূর্ণ। ব্রিটিশ সরকার ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধার্থে ১৭৯৩ সালে 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন এবং তাদের বশীভূত এ দেশীয় জমিদার শ্রেণির মাধ্যমে নানাভাবে এ দেশের জনগণকে শোষণ করেন। পলাশি যুদ্ধের একশ বছর পুর্তিতে ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ শোষণের বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদ সংঘটিত হয়। ১৮৫৮ সালে মহারানি ভিক্টোরিয়া এক ঘোষণার মাধ্যমে ভারতের শাসনভার নিজ হাতে তুলে

Dhaka University Institutional Repository

নেন এবং তা কার্যকর ছিল ১৯৪৭ সালের বাংলাভাগের পূর্ব পর্যন্ত। যদিও সিপাহি বিদ্রোহ কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে, তবুও একথা বলা যায় যে, এসময় থেকে ভারতবাসী ব্রিটিশ সরকারের কাছে তাদের ন্যায্য দাবি আদায়ের জন্য সংঘটিত হতে শেখে। যার পরিপ্রেক্ষিতে ১৮৮৫ সালে 'ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস' (Indian National Congress) প্রতিষ্ঠিত হয়। এর ফলে ভারতবর্ষের জনগণ সম্মিলিতভাবে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য 'ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের' মাধ্যমে আন্দোলন চালিয়ে যায়। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে 'ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস'-এর নিরপেক্ষতা প্রশ্নবিদ্ধ হলে সৈয়দ আহমদ খানের (১৮১৭-১৮৯৮) নেতৃত্বে মুসলমানদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আলীগড়ে আন্দোলন গড়ে ওঠে।

আলীগড় আন্দোলনের ফলে মুসলমানরা সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে সচেতন হয়ে ওঠে, যার ফলে ব্রিটিশ সরকারের তত্ত্বাবধানে সৃষ্টি হয় ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ। বঙ্গভঙ্গের নেতিবাচক ব্রিটিশ মনোভাব উপলব্ধি করে জাতীয় ঐক্যের প্রয়োজনে প্রবর্তিত হল রাখি বন্ধন প্রথার। কিন্তু কোন অবস্থায় হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের বিরোধ প্রশমিত হয়নি বরং তা উত্তরোত্তর তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে। এর পরিপ্রেক্ষিতে নবাব স্যার সলিমুল্লাহর (১৮৬৬-১৯১৫) প্রচেষ্টায় ১৯০৬ সালের ৩০শে ডিসেম্বর ঢাকায় 'অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ' প্রতিষ্ঠিত হয়। অর্থাৎ ভারতীয় হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণির স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য যেমন 'ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস' গড়ে ওঠেছিল, ঠিক তেমনি মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণির স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য 'অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ' গড়ে ওঠেছিল। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, বঙ্গভঙ্গের পরে ভারতের জনগোষ্ঠীর এক বৃহৎ অংশ ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের ডাক দেয়, যা স্বদেশী আন্দোলন নামে পরিচিত। বিভিন্নমুখী চাপের কারণে ব্রিটিশ সরকার ১৯১১ সালের ১২ই ডিসেম্বর 'বঙ্গভঙ্গ রদ' আইন জারি করতে বাধ্য হন। বাংলা ও ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসে বঙ্গভঙ্গ একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে পরিচিত। এ সম্পর্কে হারুন-অর-রশিদ মন্তব্য করেন:

> ১৯০৫ সালের বাংলা বিভাগ এবং নতুন প্রদেশ সৃষ্টি পূর্ব বাংলার মৃতপ্রায় মুসলিম সমাজে প্রাণ সঞ্চার করে। উন্নয়নের ছোঁয়া লাগে নতুন প্রদেশের রাজধানী ঢাকায়। অনেক কল-কারখানা, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান ঢাকা ভিত্তিক হওয়া শুরু করে। হিন্দু সম্প্রদায়ের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী সুসংগঠিত ও শক্তিশালী আন্দোলন মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক সংগঠনের আবশ্যকতা তুলে ধরে। নবাব স্যার সলিমুল্লার উদ্যোগে ১৯০৬ সালের ডিসেম্বর মাসে ঢাকায় নিখিল ভারত মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠার মূলে অন্যতম কারণ ছিল। হিন্দু সম্প্রদায় কিছুতেই বঙ্গভঙ্গকে মেনে নিতে পারে নি। তাদের দুর্বার আন্দোলনের কাছে নতি স্বীকার করে ব্রিটিশ সরকার পুনরায় বাংলাকে একত্রিত করতে বাধ্য হয়। আসামকে পূর্বের ন্যায় পৃথক শাসনাধীনে নিয়ে আসা হয়। বিহার, উড়িষ্যা ও ছোট নাগপুর (যা পূর্বে 'বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির' অন্তর্ভুক্ত ছিল) নিয়ে পৃথক প্রদেশ গঠিত হয়। বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলন এক শ্রেণির বাঙালির মধ্যে জাতিসত্তাবোধ জাগিয়ে তোলে। সীমিত আকারে হলেও, বাঙালি জাতিসত্তার উন্মেষ ছিল বঙ্গভঙ্গ উদ্ভূত পরিস্থিতির ইতিবাচক ফলাফল।

Dhaka University Institutional Repository

অপরদিকে, বঙ্গভঙ্গ হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি করে। এই সর্বপ্রথম বাংলার সমাজ সাম্প্রদায়িক ধারায় বিভক্ত হয়ে পড়ার লক্ষণ দেখা দেয়। ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ আনুষ্ঠানিকভাবে রদ হলেও পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার জনগণের মনে একটি বিভক্তি রেখা রয়ে যায়, যা বাংলার পরবর্তী রাজনৈতিক গতিধারাকে প্রভাবান্বিত করে।[৫]

১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে তার প্রভাব ভারতবর্ষেও আছড়ে পড়ে। মুসলমান সম্প্রদায় ধর্মীয় আবেগের কারণে তুরস্কের অখণ্ডতা রক্ষার চেষ্টা করে। "ব্রিটিশ সরকার যুদ্ধে মিত্রপক্ষে যোগদান করলে ভারতবর্ষের মুসলমানেরা তুরস্কের খেলাফত রক্ষার দাবিতে আন্দোলন করেন– এ আন্দোলন ইতিহাসে খেলাফত আন্দোলন নামে পরিচিত। এ আন্দোলনে ব্রিটিশ বিরোধী কাজ করার এক পর্যায়ে খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন যুক্তভাবে অগ্রসর হয়।"[৬] "১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে হিন্দু-মুসলিম মিলনের স্মারক 'লক্ষ্ণৌ প্যাক্ট' সাধিত হলে মুসলমানের জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচন ব্যবস্থা ও আইন সভার আসন সংরক্ষণের দাবি স্বীকৃত হয়। এ সময় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের রাজনৈতিক তৎপরতা যুক্তভাবে ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনে রূপ নেয়।"[৭] পরিণামে এ আন্দোলন হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতীয়তাবোধকে আরও বেশি জাগ্রত করে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটাতে কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

১৯১৭ সালে প্রথম মহাযুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে এবং একই সালের অক্টোবর মাসে রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটিত হয়–যা বিশ্বে অক্টোবর বিপ্লব বা রুশ বিপ্লব হিসেবে পরিচিত। রুশ বিপ্লব প্রতিটি সচেতন ভারতীয়ের দৃষ্টিতে প্রতিক্রিয়াশীল বিরাট এক বিশ্বশক্তির পতন হিসেবে চিহ্নিত হলো। "রাউলাট বিলের প্রতিবাদে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে পরিচালিত সত্যাগ্রহ আন্দোলন চলাকালে জেনারেল ডায়ারের নির্দেশে সংঘটিত হয় জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংসতম হত্যাকাণ্ড (১৩ এপ্রিল ১৯১৯)। ঐ বর্বর হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন আরও ব্যাপকতা লাভ করে এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও ব্রিটিশ সরকার প্রদত্ত (১৯১৫ সালের ৩ জুন) 'স্যার' বা 'নাইটহুড' উপাধি বর্জন করেন। এ পরিস্থিতিতে ১৯২০ সালের ডিসেম্বর মাসে মহাত্মা গান্ধী ব্রিটিশদের দমন ও নিপীড়নমূলক শাসনকার্যের বিরুদ্ধে তাঁর অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের সূচনা করেন।"[৮]

ভারতীয় বিপ্লবী মানবেন্দ্রনাথ রায়ের (যিনি এম. এন. রায় নামে পরিচিত ছিলেন, তবে তার প্রকৃত নাম ছিল নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য) উদ্যোগে ১৯২০ সালের ১৭ই অক্টোবর সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত উজবেকিস্তানের রাজধানী তাসখন্দে এবং ১৯২১ সালে ভারতের শ্রীপাদ অমৃত ডাঙ্গে ও মুজফ্ফর আহমদ-এর

Dhaka University Institutional Repository

নেতৃত্বে গড়ে ওঠে কমিউনিস্ট পার্টি। "বস্তুত ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের পর থেকেই এই অঞ্চলে সন্ত্রাসবাদী সশস্ত্র আন্দোলনে ছেদ পড়ে। স্বাধীনতাকামীরা দলে দলে বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিতে আরম্ভ করেন। বিশেষ করে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির মনে কমিউনিস্ট পার্টি খুবই প্রভাব ফেলে। কোথাও কোথাও কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে ব্রিটিশ-বিরোধী সশস্ত্র আন্দোলনও গড়ে ওঠে।"[৯]

ব্রিটিশ বিরোধী খেলাফত আন্দোলন ও অহিংস অসহযোগ আন্দোলন ক্রমশ সহিংস হয়ে উঠলে ১৯২২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মহাত্মা গান্ধী আন্দোলন স্থগিত করেন। ভারতবর্ষের অস্থির রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ (১৮৭০-১৯২৫) ১৯২২ সালের ৩১ শে ডিসেম্বর 'নিখিল ভারত স্বরাজ পার্টি' গঠন করেন। একজন উদার এবং অসাম্প্রদায়িক মানুষ হিসেবে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের কাছে চিত্তরঞ্জন দাশের ছিল ঈর্ষণীয় জনপ্রিয়তা। তিনি হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের সম্প্রীতির জন্য ১৯২৩ সালে মুসলমান নেতাদের সাথে ঐতিহাসিক 'বেঙ্গল প্যাক্ট' (Bengal Pact) চুক্তি স্বাক্ষর করেন। ১৯২৮ সালে এ.কে. ফজলুল হক (১৮৭৩-১৯৬২)-এর নেতৃত্বে গড়ে ওঠে 'কৃষক প্রজা পার্টি'।

১৯৩০ থেকে ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত ইংরেজরা এদেশে শাসনকার্য পরিচালনা করতে গিয়ে দমন-পীড়নের সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছায়। "১৯৩০ সালে ৬ এপ্রিল গান্ধীজী লবণ আইন অমান্য করার জন্যে পায়ে হেঁটে ডান্ডি যাত্রা শুরু করেন। ১২ এপ্রিল গান্ধী গ্রেফতার হন। ৩০ জুলাইয়ের দিকে এই আন্দোলনে যোগদানকারী প্রায় লাখ লাখ মানুষ স্বেচ্ছায় গ্রেফতার বরণ করে। মদের দোকানে প্রতিরোধ, বিলেতি কাপড় পোড়ানো প্রভৃতি ঘটনা তখন একটি নিত্যদিনের স্বাভাবিক দৃশ্য ছিল।"[১০] ঐ একই সালের ১৮ এপ্রিল মাস্টারদা সূর্যসেনের নেতৃত্বে বাঙালি বিপ্লবীরা চট্টগ্রামে ব্রিটিশদের দুটি অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করে। ১৯৩৩ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি সূর্যসেন গ্রেফতার হন এবং ১৯৩৪ সালের ১২ জানুয়ারি দেশদ্রোহিতার অপরাধে তাঁকে ফাঁসি দেওয়া হয়। এ সময় স্বাধীনতাকামী মানুষের প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল সূর্যসেনের চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার দখল কিংবা মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, "ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির নেতা শ্রীপাদ অমৃত ডাঙ্গে ও মুজফ্ফর আহমদের বিরুদ্ধে অস্ত্রের সাহায্যে ব্রিটিশ রাজ উৎখাতের অভিযোগ করে সরকার এই সময় এক মামলা দায়ের করে। এটাই ঐতিহাসিক মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা বলে খ্যাতি অর্জন করে।"[১১]

Dhaka University Institutional Repository

১৭৫৭-১৮৫৭ সাল পর্যন্ত ভারতবর্ষে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন বিদ্যমান ছিল। "ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের শেষ দশ বছর (১৯৩৭-১৯৪৭) পূর্ব বাংলায় চারটি মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। ১৯৩৫ সালে ভারত শাসন আইনের অধীনে ১৯৩৭ সালের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে ভারতের প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের মাধ্যমে এ. কে. ফজলুল হক প্রথম এবং ১৯৪১ সালে দ্বিতীয় মন্ত্রিসভা গঠন করেন। ১৯৪৩ সালের ২৮ মার্চ ফজলুল হক মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করলে খাজা নাজিমুদ্দীন ২৪ এপ্রিল ১৩ সদস্য বিশিষ্ট মন্ত্রিসভা গঠন করেন।"[১২] ব্রিটিশ শাসনামলে সর্বশেষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৪৬ সালে। "১৯৪৫-৪৬ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগের সাফল্যে মুসলিমদের প্রতিনিধিত্ব করার বিষয়ে তাদের দাবির সারবত্তা প্রমাণ করে। এতদিন ধরে কংগ্রেস যে নিজেদের ভারতীয় জনগণের একমাত্র প্রতিনিধি বলে দাবি করে আসছিল, তা খানিকটা দুর্বল হয়ে যায়।"[১৩] এ নির্বাচনে হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী (১৮৯২-১৯৬৩) ও আবুল কাশিমের নেতৃত্বে মুসলিম লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯-১৯৪৫) সারা বিশ্বের ন্যায় পূর্ব বাংলার ভূ-রাজনীতিতেও ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করে। ব্রিটিশ শাসনের অন্তিমপর্বে বিশ্বরাজনীতি এবং দেশীয় রাজনীতি এক বিক্ষুব্ধকাল অতিক্রম করছিল। যার ফলে এ দু'অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক, ভূ-রাজনৈতিক পরিবর্তনও অনিবার্য হয়ে ওঠে। যার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৪০ সালের ২২ মার্চ নিখিল ভারত মুসলিস লীগের অধিবেশনে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ হিন্দু-মুসলমানের পৃথক ধর্ম, স্বতন্ত্র সংস্কৃতি, ভাষা, ইতিহাস, ঐতিহ্য, শিল্পকলা, রাজনীতির কথা উল্লেখ করে দুটি সম্প্রদায়ের পৃথক রাষ্ট্র গঠনের তাগিদ প্রদান করে 'দ্বি-জাতি তত্ত্বে'র (Two Nations Theory) প্রবর্তন করেন। পরবর্তী দিন ২৩ মার্চ পাকিস্তানের ঐ একই অধিবেশনে শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক পাকিস্তান প্রস্তাব বা লাহোর প্রস্তাব ঘোষণা করেন। দ্বি-জাতি তত্ত্ব ও লাহোর প্রস্তাব ঘোষণার পরবর্তী সময়ে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ আরও তীব্র আকার ধারণ করে। এ-সম্পর্কে কালিপদ বিশ্বাস উল্লেখ করেন:

> ফজলুল হক দীর্ঘকাল ধরে যে অসাম্প্রদায়িক মনোভাব বিকশিত করেন, তার প্রভাব দ্রুত গতিতে হ্রাস পায়। ঘটনার চাপে 'লাহোর' প্রস্তাব উত্থাপন করে এবং 'সান্ত্বনা' বতৃতা দিয়ে ফজলুল হক দ্বিজাতিতত্ত্ব ও সাম্প্রদায়িক শক্তিকেই ক্রমবর্ধমান করে তোলেন।...ফজলুল হক 'লাহোর প্রস্তাব' উত্থাপন করে জিন্নার দ্বিজাতিতত্ত্বকেই সামনে নিয়ে এলেন এবং মুসলমানদের জন্য পৃথক রাষ্ট্র গঠনের দাবিটির প্রতি গুরুত্ব দান করেন। কিন্তু অচিরেই হক সাহেব তাঁর ভুল বুঝতে পারলেন। জিন্নাহ তখন অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী।[১৪]

মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ১৯৪২ সালে স্বাধীনতার আন্দোলন শুরু হয়, যা আগস্ট আন্দোলন নামে পরিচিত। একদিকে ঔপনিবেশিক শাসকচক্র, অন্যদিকে স্বদেশী, জাতীয়তাবাদী এবং শ্রেণিসচেতন কমিউনিস্ট

Dhaka University Institutional Repository

ও শ্রমিক আন্দোলন শাসকচক্রের ভিত নাড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়। উদ্বিগ্ন ব্রিটিশ সরকার মহাত্মা গান্ধী পরিচালিত গণআন্দোলনকে ব্যর্থ করতে মুসলিম লীগের কর্ণধার জিন্নাহকে ব্যবহার করে। এ প্রসঙ্গে কালিপদ বিশ্বাস বলেন:

> অহিংস এবং সহিংস আন্দোলনের দুটি ধারাই স্বতন্ত্রভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামকে এমন একটা পর্যায়ে উন্নীত করে, যার ফলে ব্রিটিশ শাসকরা উদ্বিগ্ন হয়ে যায়। মহাত্মা গান্ধী বিপ্লবীদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া সত্ত্বেও নীতিগতভাবে সশস্ত্র সংগ্রামের ধারাটিকে সমর্থন করা কখনোই তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। ...ইতোমধ্যে উদ্বিগ্ন ব্রিটিশ সরকার মহাত্মা গান্ধী পরিচালিত গণআন্দোলনকে প্রতিহত করতে সহায়করূপে পায় মুসলিম লীগের একমাত্র কর্ণধার জিন্নাহকে। তাই মহাত্মা গান্ধীর ঐক্যবদ্ধ স্বাধীন ভারত গঠন করার প্রয়াস ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।[১৫]

১৯৪১ থেকে ১৯৪৬ পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্পে উভয় বাংলায় অসংখ্যবার হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা সংঘটিত হয়। তবে ১৯৪৬ সালে কলকাতায় হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে ভয়াবহ দাঙ্গা সংঘটিত হয় এবং এই দাঙ্গায় ব্রিটিশ শাসকদের ভূমিকাও প্রশ্নবিদ্ধ ছিল। এ সম্পর্কে আনিসুজ্জামান উল্লেখ করেন:

> ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্টের কলকাতায় যে মর্মান্তিক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হল– যার জের চলে অন্যত্র, বিশেষ করে, একদিকে নোয়াখালিতে, অন্যদিকে বিহারে– তা-ই লীগ-কংগ্রেসের একযোগে চলা চূড়ান্তভাবে অসম্ভব করে দেয়। বাকিটা করে অন্তর্বর্তীকালীন কেন্দ্রীয় সরকারে কাজ করার অভিজ্ঞতা। একদিকে ব্রিটেনে নির্বাচনোত্তর নতুন সরকার ভারতবর্ষকে ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যে স্বাধীনতা প্রদানের ঘোষণা দিয়ে লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে ভাইসরয় করে পাঠায়, অন্যদিকে ভারতের রাজনৈতিক নেতারা দেশবিভাগের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত হন।[১৬]

ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িক সংঘাত, রাজনৈতিক অস্থিরতা দূর করার জন্য ভাইসরয় লর্ড মাউন্টব্যাটেন মুসলিম লীগ এবং কংগ্রেস উভয় নেতাদের সঙ্গে সমঝোতা বৈঠকে বসেন। কিন্তু অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন নিয়ে মুসলিম লীগ এবং কংগ্রেস ঐক্যে পৌঁছতে ব্যর্থ হয়। যার পরিপ্রেক্ষিতে লর্ড মাউন্টব্যাটেন উপলব্ধি করেন যে, ভারত বিভক্তি দ্বারা শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। এ সম্পর্কে সিরাজুল ইসলাম উল্লেখ করেন:

> ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থায় যে বাঙালি হিন্দু ভদ্রলোকদের কাছে ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ ছিল 'বঙ্গমাতার অঙ্গচ্ছেদ' যারা বাংলাভূমি ও বাঙালি জাতীয়তাবাদে ঐক্য রাখার জন্য আয়োজন করেছিল রাখিবন্ধন উৎসবের এবং যাদের দুর্বার আন্দোলনের মুখে ব্রিটিশ সরকার ঐ ব্যবস্থাকে রদ করতে বাধ্য হয়েছিল, সে হিন্দু ভদ্রলোক সমাজই ১৯৪৭ সালে বাংলাকে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে ভাগ করার পক্ষে রায় দিল। [১৭]

Dhaka University Institutional Repository

অবশেষে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট হিন্দুদের জন্য ভারত এবং ১৫ আগস্ট মুসলমানদের জন্য পাকিস্তান নামে দুটি পৃথক আবাসভূমির জন্ম হয়। ভারত বিভাগের সঙ্গে সঙ্গে আরেক নৃশংস ও নারকীয় হত্যাযজ্ঞ সংঘটিত হয়– হিন্দু-মুসলমান ও শিখ-মুসলমান দাঙ্গা। এ সম্পর্কে আনিসুজ্জামান বলেন:

> ইতিহাসের বৃহত্তম দেশত্যাগও সংঘটিত হয়–প্রায় দুই কোটি মানুষ বাস্তত্যাগ করে। তারপরেও দেখা গেল, ভারতে মুসলমান এবং পাকিস্তানে হিন্দু রয়ে গেল–যার যার দেশের নাগরিক হিসেবে। মুসলিম লীগের 'দ্বি-জাতি' তত্ত্ব অনুযায়ী যে ভারতীয় মুসলমানদের একটি পৃথক জাতি বলা হয়েছিল, তারা এখন ভারতীয় ও পাকিস্তানি জাতিতে বিভক্ত হয়ে দ্বি-জাতিত্ত্বের অসারতাই প্রমাণ করল।[১৮]

বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে বিশ শতকের চল্লিশের দশক থেকে গল্প রচনা শুরু করে নব্বইয়ের দশক-এই দীর্ঘকাল পরিসরে শওকত ওসমান সমাজ ও ইতিহাসের নিরন্তর পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করেছেন। বাঙালির জাতীয় জীবনের নানা ঘটনা শওকত ওসমানের শিল্পীমনকে বরাবরই আলোড়িত করেছে। ফলে জাতীয় চেতনার পরিবাহী অনেক আন্দোলন, সাতচল্লিশের দেশবিভাগ, বায়ান্নর ভাষা-আন্দোলন, আটান্নর সামরিক আইন, ঊনসত্তরের গণ-আন্দোলন ও একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ যেমন বাঙালির জাতীয় জীবনের গতি-প্রকৃতিতে প্রভাব ফেলেছে, তেমনই শোষণ-নিষ্পেষণে ত্যক্ত এ জাতির বিবেককে করেছে শাণিত ও বজ্রদীপ্ত। ইতিহাসের কালজ্ঞানকে গভীরভাবে ধারণ করেছেন শওকত ওসমান তাঁর রচনার মধ্যে। যতীন সরকার বলেছেন :

> শওকত ওসমান অত্যন্ত আন্তরিকভাবেই জাতিকে অসুস্থ ও পশ্চাৎগামী বিকৃত ইতিহাস থেকে মুক্তি দিতে চেয়েছেন। স্বজাতির মানুষগুলোর মধ্যে সুস্থ ইতিহাসবোধ সঞ্চার করাই তাঁর লেখনী চালনার অন্যতম উদ্দেশ্য। সে উদ্দেশ্যের পরোক্ষ বাস্তবায়ন হয়েছে তাঁর গল্প-উপন্যাসে, আর একেবারে স্পষ্ট প্রত্যক্ষ রূপ ধরেছে প্রবন্ধে।[১৯]

শওকত ওসমান যখন সাহিত্যের ক্ষেত্রে আবির্ভূত হন, তখন দেশের রাজনীতিতে কয়েকটি পরিবর্তনের ঢেউ আসে। প্রায় দু'শ বছরের বৃটিশ শাসনের তখন অবসান হতে চলেছে। ভারতের স্বাধীনতা আসন্ন, হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্যে স্বতন্ত্র আবাসভূমির দীর্ঘকালের সমস্যার অবসান হতে চলেছে একদিকে, অন্যদিকে এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক বিভেদ, সহিংস দলাদলি ও শত্রুতার বহ্নিপ্রবাহ ভারতবর্ষের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। সংখ্যালঘু মুসলমানরাই যে বহুলাংশে তার শিকার হয়েছিলো তা সহজেই বুঝা যায়। এরকম একটি যুগের সন্ধিক্ষণে বাংলা সাহিত্যে শওকত ওসমানের আবির্ভাব। ফলে তাঁর সাহিত্যে জাতীয় জীবনের তৎকালীন নানা সমস্যার প্রতিফলন ঘটে বেশি।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়ে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হয়। ভারতবর্ষের মুসলমানদের জন্য একটি আলাদা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলেও পরবর্তীকালে দেখা গেলো সহস্র মাইল দূরের পশ্চিম পাকিস্তানিদের সঙ্গে ভাষা, সামাজিক অবস্থা, কৃষ্টি, সংস্কৃতি ইত্যাদি কোনো দিক থেকেই পূর্ব পাকিস্তানিদের আদর্শগত মিল নেই। ফলে দিন দিন সমস্যা, সঙ্কট আর সংঘর্ষ ঘনিয়ে আসে। শুরুতেই ভাষাগত বিরোধ চরমে ওঠে এবং এই মৌলিক বিরোধটিকে কেন্দ্র করে আন্দোলন আরম্ভ হয়, জোরদার হয় রাষ্ট্রীয় সংঘাত। জাতীয় জীবনের এই সব সমস্যা শওকত ওসমানের সাহিত্য-জীবনকে কতখানি প্রভাবিত করেছে, তা অনুমান করা যায় যখন দেখি তাঁর সাহিত্য-জীবনের প্রায় পুরো সময়টাই প্রধানত জাতির সামাজিক ও রাজনৈতিক নানা সঙ্কটের অভিমুখী হয়ে তাঁর সাহিত্য-মানসকে এক ধরনের বিপ্লববাদের ভূমিকায় অবতীর্ণ করেছে। এ জন্যেই জাতীয় আন্দোলনের অনেকগুলো ঘটনার পরিপ্রক্ষিতে তাঁর সাহিত্যিক কৃতির বিচার চলে।

সাধারণ অর্থে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে যারা সম্পৃক্ত তাদেরকে রাজনীতিবিদ বলে। এ রাজনীতিবিদরা রাষ্ট্র পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করে। রাজনীতিবিদদের সুপরিকল্পিত ও সুশৃঙ্খল শাসনব্যবস্থা একদিকে যেমন রাষ্ট্র ও জনজীবনে শান্তি বয়ে আনে, অপরদিকে অপরিকল্পিত বিশৃঙ্খল শাসনব্যবস্থা রাষ্ট্র ও জনজীবনে চরম দুর্ভোগ বয়ে আনে। লেনিন রাজনীতির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন: "রাজনীতি হল শ্রেণীসমূহের ভেতরকার সম্পর্ক, এ হল রাষ্ট্রের ব্যাপারে অংশগ্রহন, রাষ্ট্র চালনা, রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপের রূপ, লক্ষ্য, বিষয়বস্তু নির্ধারণ।"[২০] যদিও শওকত ওসমান "প্রথাগত রাজনীতির সাথে কখনো সরাসরি সম্পৃক্ত ছিলেন না, তবুও রাজনীতি ভাবনায় তাঁর প্রজ্ঞার পরিচয় পাওয়া যায়। মূলত লেখক শওকত ওসমান দেশি-বিদেশি বিভিন্ন বিষয় থেকে রাজনীতির বিভিন্ন প্রসঙ্গ এনে এদেশে মানুষের মধ্যে সচেতনতার বিস্তার ঘটাতে চেয়েছেন-এখানে একজন পেশাদার রাজনীতিবিদ থেকে তাঁর পার্থক্য স্পষ্ট হয়।"[২১] তাঁর রাজনীতি এবং ইতিহাস সচেতনতার পরিচয় দিতে গিয়ে যতীন সরকার বলেন :

> শওকত ওসমান গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, সাম্প্রদায়িকতা, বাংলাদেশের ইতিহাস-ঐতিহ্য, মুসলিম বিশ্বের গতি-প্রকৃতি ইত্যাদি বিষয়ের অন্দরমহলে যে-ভাবে প্রবেশ করতে পারেন ও এসবের নাড়ি-নক্ষত্রের পরিচয় টেনে বের করতে পারেন আশ্চর্য কুশলতায়, সে রকমটি একজন পেশাদার রাজনীতিকের পক্ষে সম্ভব নয়।[২২]

শওকত ওসমানের রাজনীতি এবং ইতিহাস-সচেতন মনের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক, প্রবন্ধ এবং রম্য রচনায়। তিনি কখনো প্রত্যক্ষ আবার কখনো পরোক্ষভাবে তাঁর সাহিত্যে ইতিহাস এবং রাজনীতি তুলে ধরেছেন। এ পর্বে অর্থাৎ ব্রিটিশ কালপর্বে তাঁর যে সমস্ত রচনাতে বাংলা ভাগের

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ফুটে উঠেছে তার মধ্যে *পতঙ্গ পিঞ্জর* (১৯৮৩) ও *আর্তনাদ* উপন্যাস, *পিঁজরাপোল* গল্পগ্রন্থের 'আলিম মুয়াজ্জিন', *বিগত কালের গল্প* গ্রন্থের 'চুহাচরিত' উল্লেখযোগ্য।

১৯৪৭ সালের বাংলাভাগ ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। "বাংলাভাগের মূলে ছিল সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক অভিশাপ এবং ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থা। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকচক্র যে 'দ্বি-জাতি তত্ত্বে'র বীজ বপন করে, তারই প্রতিক্রিয়া স্বরূপ বাংলাভাগের আত্মপ্রকাশ। যুক্তি-বুদ্ধিহীন আবেগসর্বস্ব বাংলাভাগ দু-অঞ্চলের ধর্মীয় সংখ্যালঘু মানুষের ভাগ্যে তীব্র আতঙ্ক ও অস্বস্তি বয়ে নিয়ে আসে।"[২৩] বাংলাভাগ ছিল "একই সাথে Triumph ও tragedy. সেই শোণিতলিপ্ত ঘটনা পরম্পরার সর্বাপেক্ষা বিয়োগান্তক পর্যায় ছিলো বাংলাদেশ ভূখণ্ডের পাকিস্তান অন্তর্ভুক্তি।"[২৪] বাঙালির জীবনে বাংলাভাগের প্রতিক্রিয়া সুদূরপ্রসারী বেদনাবহেরই আখ্যান হিসেবে ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছে। "কেননা ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তির পাতা ফাঁদে কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ উভয়ই ধরা দিয়ে সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মাধ্যমে বাংলাভাগের গতিকে ত্বরান্বিত করেন। মূলত সম্প্রদায়গত ভেদবুদ্ধিসম্পন্ন মানসিকতা এবং রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তের শিকার ১৯৪৭ সালের বাংলাভাগ।"[২৫] বাংলাভাগ পরবর্তীকালে শওকত ওসমান নিজ দেশে পরবাসী হন এবং শেষ পর্যন্ত নিজ বাসভূমি ছেড়ে সপরিবারে পূর্ববাংলায় চলে আসেন। যুগযন্ত্রণার প্রত্যক্ষ সাক্ষী শওকত ওসমানের সাহিত্য রচনায় বাংলাভাগের অন্তর্যন্ত্রণা প্রত্যক্ষ প্রভাব ফেলেছিল। যার ফলে তাঁর রচিত গল্পে বাংলাভাগজনিত যুগযন্ত্রণার প্রতিচ্ছবি উপস্থাপিত হয়েছে।

পিঁজরাপোল গ্রন্থের 'আলিম মুয়াজ্জিন' গল্পটি বাংলাভাগের পূর্ব এবং পরবর্তী রাজনৈতিক জটিলতাকে ধারণ করে আছে। এ গল্পে আলিম মসজিদের মুয়াজ্জিন-এর পদে কর্মরত ছিল। যদিও তার নামের সাথে 'পাগলা' খেতাবটি উচ্চারিত হত, কিন্তু বাংলাভাগের প্রাক্কালে সে প্রকৃত অর্থে পাগল হয়ে যায়। সে নিজেকে কখনো হিন্দু আবার কখনো রিফিউজি মনে করত। আবার পথে রক্তের দাগ দেখলে পথিককে সতর্ক করত। মূলত গল্পকার এই জাতীয় সতর্ক করার মাধ্যমে হিন্দু-মুসলমানের রক্তাক্ত দাঙ্গাকে স্মরণ করিয়ে দেন। আলিম মুয়াজ্জিনের ভাষায় :

> আলিম নিজের মনে হাসে, আর অস্পষ্ট শব্দে বলে : হালা, এক পাগলা ছিলা আলমা মুয়াজ্জিন। এহন দেহি ঢের পাগলা বাড়ছে। নিজের জায়গা মেলে না।[২৬]

Dhaka University Institutional Repository

মাঝে মাঝে আলিম মুয়াজ্জিন-এর ট্রাফিক পুলিশের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার ঘটনাকে লেখক প্রতীকী পরিচর্যা হিসেবে ব্যবহার করেন। এ জাতীয় পরিচর্যার মাধ্যমে বিবেকি মানুষদের সঠিক পথে চলার বিষয়কে ইঙ্গিত করেন। এ সম্পর্কে সানজিদা আকতারের মন্তব্য:

> দেশবিভাগের অনেক গল্পে যাত্রার বিবেকের মতো চরিত্রের সন্ধান মেলে। যারা প্রবল প্রতিকূলতার মধ্যেও অতন্দ্র জ্বালিয়ে রাখে মূল্যবোধ আর আদর্শের শিখা অনির্বাণ।[২৭]

এ গল্পে আলিম মুয়াজ্জিন সেই মূল্যবোধ শাসিত আদর্শ-সমাজের বিবেকি চরিত্রের প্রতিনিধি। অশুভ শক্তির প্রতি নিন্দা এবং শুভ শক্তিকে আহবান করে গল্পকার গল্পের পরিসমাপ্তি টেনেছেন। এ গল্পে দেখা যায়, বাংলাভাগ ভৌগোলিক অবস্থানের সাথে সাথে মানুষের অন্তর্জগতেও আঘাত করেছিল। যার বেদনাবহ সাক্ষী পাগল আলিম মুয়াজ্জিন। গল্পের সমাপ্তিতে পাগলা আলিম মুয়াজ্জিনের কণ্ঠে ধ্বনিত হয় মানবতাবাদের উদাত্ত আহবান :

> আলিম বলে : চুপচাপ ক্যান? আজান দিতা আছিলা না? আজান দ্যাও।
> আদেশ-অনুরোধপুষ্ট কণ্ঠস্বর।
> কয়েকজন চীৎকার করে উঠে : "আল্লাহো...।"
> রীতিমত ধমক দিয়ে উঠল আলিম : ও নয়। আজান দ্যাও।
> পাগলের অনুরোধই বটে।
> মিছিলের জোট-বাঁধা আওয়াজ শতধা তরঙ্গ তোলে : হিন্দু-মুসলমান ভাই-ভাই।[২৮]

সমাজসচেতন লেখক শওকত ওসমান 'আলিম মুয়াজ্জিন' গল্পের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তের শিকার একজন রক্তাক্ত ব্যক্তির ইতিবৃত্ত তুলে ধরেছেন। তবে তিনি একজন আলিম মুয়াজ্জিনের কথা উপস্থাপন করলেও শেষ পর্যন্ত তা একজনের হয়ে থাকেনি, বরং বাংলাভাগ মানুষের ভৌগোলিক অবস্থানের সাথে সাথে মানুষের অন্তর্জগতেও আঘাত করে। যার ফলে বাংলাভাগের প্রভাবে অনেকে মানবের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য হারিয়ে পাগল বা উন্মাদ হয়ে গিয়েছিল-যার বেদনাবহ সাক্ষী পাগল আলিম মুয়াজ্জিন।

বিগতকালের গল্প গ্রন্থের 'চুহা-চরিত' গল্পে রাজনৈতিক জটিলতা ফুটে উঠেছে। এ গল্পে চুহা জীবন চরিতের আড়ালে কায়েমী স্বার্থবাদী গান্ধীভক্ত ও ইসলামভক্ত দুই ভণ্ড প্রতারকের মুখোশ উন্মোচিত হয়েছে। "ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনে গান্ধীভক্ত, মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের স্থানীয় ও জাতীয় নেতাদের কর্মকাণ্ড এবং স্বার্থ উদ্ধারের অপকৌশলের অনুপুঙ্খ বর্ণনা এ-গল্পে উপস্থাপিত হয়েছে। তাছাড়া একই সাথে লেখক এ-জাতীয় স্বার্থপর নেতাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য উন্মোচনে তাদের অন্তর্জগৎ ও বহির্জগতের বৈপরীত্যের

Dhaka University Institutional Repository

ভাষাচিত্র নির্মাণ করেছেন।"[২৯] 'চুহা-চরিত' গল্পের কথক একটি ছোট চুহা। যে প্রভুর আশ্রয়ে সে ছিল সেই প্রভুটি প্রথমে ছিল গোঁফধারী। পরবর্তীকালে পাকিস্তান রাষ্ট্রের স্বপ্নে মুসলিম লীগার হয়ে লেবাস পরিবর্তন করেছে। অর্থাৎ গোঁফ কেটে দাড়ি, প্যান্ট ছেড়ে পায়জামা এবং পার্টি অফিসের প্রবেশ পথে একটি কোরআন শরীফ রাখার ব্যবস্থা করে। অপরদিকে কথক চুহার সহোদর যে প্রভুর বাড়িতে আশ্রিত ছিল সে ছিল গান্ধীভক্ত। গান্ধীর মতই সে নিরামিষ ভোজী, অথচ মাংস কিংবা মাছে তার অরুচি ছিল না।

"কংগ্রেস খাতা-কলমে জাতীয়তাবাদী দল কিন্তু হিন্দু-মুসলমান প্রশ্নে তাদের অবস্থান বিপরীত মেরুতে। অন্যদিকে মুসলিম লীগ ধর্মীয় সংগঠন হয়েও তারা ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে কাজ না করে ব্যক্তি স্বার্থ উদ্ধারে তৎপর। গল্পকার কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের একই মানসিকতা চুহাদ্বয়ের বক্তব্যে চিহ্নিত করেছেন।"[৩০] ভিন্ন ভিন্ন দলের নেতারা ভিন্ন ভিন্ন বক্তব্য উপস্থাপন করলেও মানসিকভাবে যে তারা স্ব-গোত্রীয় এবং কোনভাবে যে তারা প্রজাহিতৈষী হতে পারে না, তা চুহার বক্তব্যের মধ্য দিয়ে লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন :

> দুই সহোদরের দুই মনিব। গলাগলি করিয়া দণ্ডায়মান। ঘরে চেয়ারে বসিয়া একে অপরের সিগারেট জ্বালাইয়া দিল।[৩১]

মুসলিম লীগ এবং কংগ্রেসের রাজনৈতিক অফিস কক্ষে অবস্থানরত চুহাদ্বয় দুই রাজনৈতিক নেতার নিজ স্বার্থ উদ্ধারে প্রতারণামূলক বিভিন্ন দৃশ্যের প্রত্যক্ষ সাক্ষী। মুসলিম লীগ নেতার মূলনীতি তার স্ত্রীর জবানিতে গল্পকার তুলে ধরেছেন :

> দহলিজে কোরান ঝুলাইছ, পায়জামা ধরেছো। পোলাদের পাডাও আংরেজের মক্তবে – কিছু বুঝন পারি না।[৩২]

কংগ্রেস নেতা গান্ধীজীর অর্ধেক আদর্শে নামমাত্রে বিশ্বাসী–'অহিংসা এবং শান্তি'। উভয় নেতৃবৃন্দ মন্বন্তর কালে অবৈধ পথে অর্থ-সম্পত্তির পাহাড় গড়ে তুলেছিল। দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষগুলো যখন খাদ্যসংকটের পাশাপাশি বস্ত্রসংকটে নিপতিত হয়, তখনও তারা ছিল নির্বিকার। গল্পে দেখা যায় দুই রাজনৈতিক দলের টানাপোড়েন এবং ঔপনিবেশিক শাসকদের ইন্ধনে এদেশের মানুষের জীবনই দুই ভাগে বিভক্ত হয় অর্থাৎ বাংলা ভাগ হয়।

শওকত ওসমান রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তে বিভ্রান্ত না হয়ে, স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গিতে রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ তাঁর ছোটগল্পে তুলে ধরেছেন। "তাঁর অসংখ্য ছোটগল্পে এদেশের রাজনৈতিক উত্থান-পতন, বিবর্তনের বিচিত্র ধারাক্রম রূপান্তরিত হয়েছে বিশ্বস্ততার সঙ্গে।"[৩৩] বাংলাভাগের প্রভাব এবং প্রতিক্রিয়া ছিল বাঙালি জীবনে

Dhaka University Institutional Repository

বেদনাবহ ও সুদূরপ্রসারী। "স্বাধীনতার আগে-পরে রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা আর দুর্ভিক্ষপীড়িত ভিটেমাটি ছাড়া মানুষের স্রোতে যেন দিশেহারা হয়ে পড়েছিল এই উপমহাদেশ। আর দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত, নিজ বাসভূমি থেকে উৎক্ষিপ্ত, স্বজনহারা, সর্বস্বহারা উপার্জনহীন অনেক মানুষের কাছে দেশবিভাগের আনন্দ চরম দুঃখের প্রতীক হয়ে এসেছিল।"[৩৪]

শওকত ওসমানের গল্পে দেখা যায় "ব্রিটিশ শাসনের অন্তিমলগ্নে শহরকেন্দ্রিক রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রভাবে গ্রামের সাধারণ জনগণ এবং কৃষকসম্প্রদায় নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠেন। তার ফলে দারিদ্র-পিড়ীত, বুভুক্ষু, নিঃসহায়ত্ব মানুষদের মধ্যেও বৃদ্ধি পায় ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রেরণা। সংঘবদ্ধ কৃষকদের প্রতিরোধে পরিবেশ হয়ে ওঠে উত্তপ্ত।"[৩৫] মন্বন্তরের পটভূমিতে লেখা *সাবেক কাহিনী* গল্পগ্রন্থের 'ভাগাড়' গল্পে বিত্তবান শোষক এবং শোষণের বিরুদ্ধে গ্রামের কৃষক ও সাধারণ মানুষের একতাবদ্ধ হওয়ার চিত্র দেখা যায়। জোতদার মনসব আলি জনসাধারণের প্রতিরোধ দমনে ব্যর্থ হয়। উপরন্তু সংঘবদ্ধ জনতা মনসব আলির রক্ত চক্ষুকে উপেক্ষা করে তার ভীতিশূন্য হৃদয়ে ভয়ের সৃষ্টি করে। গল্পকারের ভাষায়:

> আরো ভিড় জমে। শানিত ব্যঙ্গভরা কৌতুহল দৃষ্টি চারিদিকে। ভয় পায় মনসব আলি।
> এত মানুষ কেন এক জায়গায় জমে?[৩৬]

শওকত ওসমান "শ্রেণিবিভক্ত সমাজে শ্রেণিসংঘাতের নানা পর্যায় পর্যন্ত অত্যন্ত সার্থকতার সঙ্গে তাঁর ছোটগল্পে রূপায়িত করেছেন। কখনও এগুলো মুক্তিকামী মানুষের প্রতিবাদ হিসেবে বিবৃত হয়েছে–কখনও বা হয়েছে অনুপ্রেরণার আধার।"[৩৭]

ব্রিটিশ শাসনের বেড়াজাল ছিন্ন করে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান ও ১৫ আগস্ট ভারত নামে এ উপমহাদেশে দুটি পৃথক রাষ্ট্রের জন্ম হয়। 'দ্বি-জাতি তত্ত্বে'র ভিত্তিতে হাজার মাইল ব্যবধানে অবস্থিত পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমানে বাংলাদেশ) ও পশ্চিম পাকিস্তান (বর্তমানে পাকিস্তান) নিয়ে সৃষ্টি হয় পাকিস্তান রাষ্ট্রের। "সূচনালগ্ন থেকেই পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী এদেশের জনগণের প্রতি বিমাতাসুলভ আচরণ করে। রাজনৈতিক, সামজিক ও অর্থনৈতিকভাবে শোষণের মাধ্যমে এ দেশের মানুষকে বিভিন্নমুখী বৈষম্য এবং নির্যাতনের মুখে ঠেলে দেয়। পাকিস্তান সরকার সুপরিকল্পিতভাবে প্রথম আঘাত করে পূর্ব বাংলার ভাষা ও সংস্কৃতির উপর। পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী ১৯৪৮ সালেই উর্দুভাষাকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা করায় পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মোহভঙ্গ হয় এবং ভাষার প্রশ্নে সরকারের সাথে সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে।"[৩৮] যার

Dhaka University Institutional Repository

পরিপ্রেক্ষিতে বাঙালি জাতি ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি বুকের তাজা রক্তে রাজপথ রঞ্জিত করে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মাতৃভাষার দাবিকে প্রতিষ্ঠিত করে। এ সম্পর্কে ড. আব্দুর রশীদ বলেন:

> "রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের ফলেই ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে ভাষা ও সাংস্কৃতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বাঙালি জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটে। প্রকৃত অর্থে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন বাঙালি জাতির আত্মজাগরণের সুদৃঢ় ও সুসংবদ্ধ প্রকাশ এবং স্বাধিকার আন্দোলন ও স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম সোপান।"[৩৯]

ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে এদেশের মানুষের মধ্যে যে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটে তার বহিঃপ্রকাশ পরবর্তী বিভিন্ন সাংস্কৃতিক আন্দোলন, স্বাধিকার আন্দোলন ও স্বাধীনতা সংগ্রামে লক্ষ্য করা যায়। একুশের ভাষা আন্দোলনের সঞ্জীবনী এদেশের মানুষকে অধিকার ও রাজনৈতিক সচেতন করে তোলে। যার ফলে পূর্ব বাংলার জনগণ মুসলিম লীগ সরকারের শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে একত্র হয়ে রাজনৈতিকভাবে তাকে মোকাবেলা করার সিদ্ধান্ত নেয়। "এ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক, মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ, কৃষক প্রজা পার্টি, নেজামে ইসলাম ও গণতন্ত্রী দলের সমন্বয়ে ৪ ডিসেম্বর ১৯৫৩ সালে গড়ে ওঠে যুক্তফ্রন্ট।"[৪০] যুক্তফ্রন্ট সম্পর্কে বলতে গিয়ে জহির রায়হান মন্তব্য করেন:

> পশ্চিম পাকিস্তানি শোষকদের দালাল মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে বাংলার মানুষের ঐক্যজোট যুক্তফ্রন্ট।[৪১]

১৯৫৪ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট ২৩৭টি মুসলমান আসনের মধ্যে ২২৩টিতে নির্বাচিত হয়ে এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে এবং ৩ এপ্রিল সরকার গঠন করে। "এ নির্বাচনের মাধ্যমে বাংলার জনগণ প্রমাণ করে তারা স্বায়ত্বশাসন ও স্বাধিকারের প্রশ্নে আপসহীন এবং পশ্চিম পাকিস্তানিদের অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক বৈষম্য ও সাংস্কৃতিক নিপীড়ন নির্যাতন থেকে মুক্তি পেতে ঐক্যবদ্ধ। যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনি বিজয় ছিল মূলত কেন্দ্রীয় শাসনের বিরুদ্ধে বাঙালির রাজনৈতিক উত্থান।"[৪২] যুক্তফ্রন্টের বিজয়ে আতঙ্কিত পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ক্ষুব্ধ হয়। এ সম্পর্কে জহির রায়হানের বক্তব্য:

> শুরু হলো একের পর এক প্রাসাদ-রাজনীতির চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রে ভরা অধ্যায়। কী করে বাংলাকে দাবিয়ে রাখা যায়। কী করে বাঙালিকে শোষণ করা যায়।[৪৩]

যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠনের পর পূর্ব বাংলায় কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সংঘটিত হয়। তার মধ্যে "চন্দ্রঘোনা কর্ণফুলী পেপার মিলে বাঙালি ও বিহারি শ্রমিকদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ, যুক্তফ্রন্ট সরকারের

Dhaka University Institutional Repository

মুখ্যমন্ত্রী এ. কে. ফজলুল হকের ৩০ এপ্রিল ১৯৫৪ সালে কলকাতা শহরে সফর ও সফরকালীন বিভিন্ন সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রদত্ত তাঁর ভাষণ পশ্চিম পাকিস্তানের বেতার-পত্র-পত্রিকাতে বিকৃতভাবে উপস্থাপন, ২ মে কেন্দ্রীয় কারাগারের সম্মুখে স্থানীয় জনগণ ও কারগার কর্তৃপক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ এবং ১৫ মে ঢাকার অদূরে আদমজি পাটকলে বাঙালি ও অবাঙালি শ্রমিকদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের ঘটনা উল্লেখযোগ্য।"[৪৪] এ সম্পর্কে হারুন-অর-রশিদ মন্তব্য করেন:

> এভাবে সরকার গঠনের ৫৬ দিনের মধ্যে অর্থাৎ ৩০ মে (১৯৫৪) পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের ৯২(ক) ধারা বলে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বরখাস্ত এবং পূর্ব বাংলায় গভর্নরের শাসন কায়েম করা হয়। ফজলুল হককে পাকিস্তান রাষ্ট্রের একজন বিশ্বাসঘাতক হিসেবে আখ্যায়িত করে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে যুক্তফ্রন্ট সরকারের ব্যর্থতা এবং পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষায় এ পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে বলে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে প্রচার করা হয়।[৪৫]

পাকিস্তান সরকার যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভা বরখাস্ত করার পাশাপাশি এদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনকে ঘিরে নানা ধরনের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে হিংসা বিভেদের সংকীর্ণতা সৃষ্টি করতে তৎপর হয়। জহির রায়হানের ভাষায়:

> ১৯৫৪ থেকে ১৯৫৮ সাল এই চারটি বছর ধরে পাকিস্তানের ইতিহাস হচ্ছে গুটিকয়েক ক্ষমতালিপ্সু, কায়েমি স্বার্থবাদী, আমলা মুৎসুদ্দি, সামন্তপ্রভু, ধনপতি, মদ্যপ বদ্ধোন্মাদ রাজনৈতিক স্বার্থশিকারির প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের ইতিহাস।[৪৬]

বিভিন্নমুখী প্রতিবন্ধকতা সত্বেও বাংলার মানুষ নিজেদের সংগঠিত করার প্রয়াস অব্যাহত রাখে। যার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৫৭ সালের ৬-১০ ফেব্রুয়ারি টাঙ্গাইলের কাগমারিতে 'কাগমারি সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয়। এটা ছিল– মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অন্যদিকে "১৯৫৮ সালের ৮ অক্টোবর পাকিস্তানের সেনাবাহিনি প্রধান জেনারেল আইয়ুব খান রাজনৈতিক দল ও নেতাদের মতপার্থক্যের চূড়ান্ত পর্যায়ে কৌশলে সামরিক শাসন জারি করে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কুক্ষিগত করে। ১৯৫৬ সালে প্রবর্তিত শাসনতন্ত্রকে বাতিলের মাধ্যমে আইয়ুব সরকার বাক স্বাধীনতা, ব্যক্তি স্বাধীনতা, সভা-সমিতি করার অধিকারসহ এক কথায় পূর্ব বাংলার মানুষের সমস্ত স্বাধীনতা হরণ করে। এ. কে ফজলুল হককে তাঁর টিকাটুলির বাসায় নজরবন্দি করা হয় এবং মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ও শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করে কারাগারে পাঠানো হয়।"[৪৭]

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়া জনগণের আস্থা অর্জন এবং জনসমর্থন লাভের জন্য ১৯৫৯ সালের ২৭ অক্টোবর ক্ষমতা গ্রহণের প্রথম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে নিজস্ব চিন্তাধারা সম্বলিত 'মৌলিক গণতন্ত্র' ঘোষণা করে। যদিও এ মৌলিক গণতন্ত্র ছিল ভিত্তিহীন এবং আইয়ুব খানের উদ্দেশ্য ছিল একটি নিজস্ব আজ্ঞাবহ শ্রেণি তৈরি করা। এ কারণে ১৯৬০ সালের ২৩ মার্চ আইয়ুব খান সামরিক আইন প্রত্যাহার করে একটি শাসনতন্ত্র প্রচলন করে। যার ফলে পাকিস্তানের রাজধানী করাচি থেকে ইসলামাবাদে স্থানান্তর করা হয় এবং ঢাকাকে নামমাত্র দ্বিতীয় রাজধানীর মর্যাদা প্রদান করা হয়। "পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধেও পূর্ব বাংলায় প্রতিবাদ ব্যক্ত হলে পাকিস্তান সরকার দমনমূলক নীতির আশ্রয়গ্রহণ করে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, শেখ মুজিবুর রহমানসহ অনেক নেতাকে গ্রেফতারের মাধ্যমে পুনরায় কারাগারে নিক্ষেপ করে। পাকিস্তানির শাসক গোষ্ঠীর নিপীড়ন-নির্যাতন এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে তারা পূর্ব পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতাদের বিচ্ছিন্নতাবাদী, দেশদ্রোহী এবং বিশৃঙ্খলাসৃষ্টিকারী আখ্যা দিতেও কার্পণ্য করেননি।"[৪৮]

পাকিস্তান কালপর্বে ষাটের দশক ছিল মূলত রাজনীতির ক্রান্তিকাল। এ দশকে নিপীড়ন, নির্যাতন, ছাত্র আন্দোলন ছিল নিত্যদিনের ঘটনা। বাঙালিদের প্রতি শাসকশ্রেণির বৈষম্যমূলক আচরণ, সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক শোষণ পূর্ব বাংলার ছাত্রসমাজকে আরও বেশি ক্ষুব্ধ করে তোলে। তাছাড়া "১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের সময় পূর্ব বাংলাকে অরক্ষিত এবং নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে রাখার জন্য আইয়ুব শাসন বিরোধী ছাত্র আন্দোলন আরও তীব্র হয়ে উঠে। ১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের লাহোরে বিরোধী দলের জাতীয় সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালির মুক্তির সনদ 'ছয়দফা' প্রস্তাব উত্থাপন করেন। বিশ্ব ইতিহাসে ফ্রান্সে যেমন ফরাসি বিপ্লব, ইংল্যান্ডে যেমন ম্যাগনাকার্টা গুরুত্বপূর্ণ; বাংলা বাঙালির ইতিহাসে 'ছয়দফা' তেমনি অর্থবহ। 'ছয়দফা' ছিল বাঙালির অর্থনৈতিক মুক্তি ও অধিকার আদায়ের গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।"[৪৯]

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান 'ছয়দফা' কর্মসূচি উত্থাপনের মাধ্যমে অধিকার বঞ্চিত বাঙালিকে অধিকার সচেতন করে তোলেন। 'ছয়দফা' কর্মসূচি ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের শৃঙ্খল থেকে বাঙালিদের বাঁচার মুক্তির সনদ। কিন্তু পাকিস্তান সরকার গণআন্দোলনকে স্তব্ধ করার জন্য ১৯৬৬ সালের ৮ মে শেখ মুজিবুর রহমানসহ ৩৪ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি ও নেতাকর্মীকে পাকিস্তান রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অভিযোগে অর্থাৎ রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে গ্রেফতার করে। এটি ছিল 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা'। এরপর ১৯৬৯ সালের ৪ জানুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি অর্থাৎ 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' প্রত্যাহার এবং পূর্ববাংলার জণগনের নিপীড়ন নির্যাতনের বিরুদ্ধে 'ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' ঐতিহাসিক ১১ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে।

Dhaka University Institutional Repository

অন্যদিকে পাকিস্তান সরকার পূর্ব বাংলার জনগণের আন্দোলন প্রতিহত করতে ১৪৪ ধারা জারি করে। কিন্তু "পূর্ব বাংলার জনগণ ১৪৪ ধারা লঙ্ঘন, পুলিশ, সেনাবাহিনি, ই.পি.আরের বাধা উপেক্ষা করে রাজপথে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। এই পটভূমিতে ১৯৬৯ সালের ২০ জানুয়ারি ছাত্রনেতা আসাদ শহিদ হন এবং ২৪ জানুয়ারি সৃষ্টি হয় গণঅভ্যুত্থান।[৫০] এ সম্পর্কে হারুন-অর-রশীদ মন্তব্য করেন:

> ২৪ জানুয়ারি পুলিশের বুলেটে নবকুমার ইনস্টিটউটের দশম শ্রেণির ছাত্র মতিউরের মৃত্যু, ১৫ ফেব্রুয়ারি বন্দী অবস্থায় ঢাকার সেনানিবাসে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামি সার্জেন্ট জহুরুল হকের গুলিবিদ্ধ অবস্থায় মৃত্যুবরণ, ১৮ ফেব্রুয়ারি ই.পি.আরের গুলিতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ও রসায়ন বিভাগের শিক্ষক ড. শামসুদ্দোহার শাহাদত বরণ ইত্যাদি মর্মান্তিক ঘটনা সমগ্র পূর্ব বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত বিদ্রোহের স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে পড়ে।[৫১]

পূর্ববাংলার গণবিদ্রোহে ভীত হয়ে পাকিস্তানি শাসকচক্র ২২ ফেব্রুয়ারি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করে এবং শেখ মুজিবুর রহমানকে নিঃশর্ত মুক্তি দান করে। ২৩ ফেব্রুয়ারি রেসকোর্সে অনুষ্ঠিত 'ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ'-এর পক্ষ থেকে তোফায়েল আহমদ শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান প্রভাব বিস্তার করে ১৯৭০ সালের নির্বাচনে। ১৯৭০ সালের ৭ ও ১৭ ডিসেম্বর নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদের ১৬৯ টি আসনের মধ্যে ১৬৭ টি এবং প্রাদেশিক পরিষদের ৩০০ টি আসনের মধ্যে ২৮৮ টি আসন অর্জন করে। উল্লেখ্য "জাতীয় পরিষদ এবং প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন ১৯৭০ সালের ৭ ও ১৭ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হলেও প্রাকৃতিক দুর্যোগ কবলিত ৩০টি আসনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭১ সালের ১৭ জানুয়ারি।"[৫২] সত্তরের নির্বাচনে বাঙালির চুড়ান্ত বিজয় সত্ত্বেও পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকচক্র বিভিন্ন অজুহাতে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করে নতুন করে ষড়যন্ত্র করে। যার ফলে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ মধ্যরাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী নিরীহ, নিরস্ত্র বাঙালি নিধনে উল্লাসে ঝাঁপিয়ে পড়ে। অবশেষে ২৬ মার্চ বাঙালি জাতি চূড়ান্তভাবে মুক্তি সংগ্রাম শুরু করে।

সমাজ ও রাজনৈতিক সচেতন শওকত ওসমান বরাবরই ছিলেন পাকিস্তানি সামরিক স্বৈরাচারের তীব্র সমালোচক। বাংলাদেশের সাহিত্যের স্বাতন্ত্র্য অর্জনে ১৯৪৭ সালের বাংলাভাগ একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসেবে উল্লেখযোগ্য। এটা বলা যায় যে, বাংলাভাগের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ ভূখণ্ডের লেখকদের স্বতন্ত্র শিল্প ও সাহিত্যচর্চার পথ প্রশস্ত হয়। এ সম্পর্কে অশ্রুকুমার সিকদারের মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য:

> ১৯৪৭ সালের পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি মুসলমানের কাছে দেশ বিভাগের চেয়ে বড় হয়ে উঠেছিল স্বাধীনতা। তাদের কাছে এই স্বাধীনতা ছিল দ্বিগুণ স্বাধীনতা; একবার ইংরেজের শাসন থেকে, সঙ্গে সঙ্গে এতদিনকার চেপে বসা

Dhaka University Institutional Repository

হিন্দুদের আধিপত্য থেকে। দেশভাগের ফলে বাঙালি মুসলমান মধ্যশ্রেণীর বিকাশ ত্বরান্বিত হয়েছিল এবং পূর্ব বাংলায় একটি শ্রেণী লাভবান হয়েছিল। আর এই লাভবান মধ্যশ্রেণীর ভিতর থেকেই লেখকরা উঠে এসেছিলেন।[৫৩]

১৯৪৭ সালের বাংলাভাগোত্তর এ ভূখণ্ডের সাহিত্যিকদের মধ্যে শওকত ওসমানের নাম অগ্রগণ্য। যদিও লেখক হিসেবে বাংলাভাগের পূর্বেই তাঁর স্বীকৃতি ঘটে। তবুও পূর্ববাংলা তথা বাংলাদেশের পরিবেশ তাঁর লেখার পরিপুষ্টিদানে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিল। ১৯৪৭ সালের অক্টোবর মাসে চট্টগ্রাম কমার্স কলেজে যোগদান করেন এবং একটানা ১১ বছর (১৯৪৭-১৯৫৮) তিনি চট্টগ্রামে কাটিয়েছেন। এ সময় তিনি শিক্ষকতার পাশাপাশি বিভিন্ন সাহিত্য সাংস্কৃতিক আন্দোলনে ভূমিকা পালন করেন। এ সম্পর্কে অনীক মাহমুদের মন্তব্য:

১৯৪৮ সালে চট্টগ্রামে প্রতিষ্ঠিত হয় একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন 'সংস্কৃতির বৈঠক'। এখানে ইবনে গোলাম নবী, গোপাল বিশ্বাস, মাহবুবুল আলম চৌধুরী, কলিম শরাফী প্রমুখ গুণীজনের সঙ্গে শওকতের হৃদ্যতা জন্মে। প্রবীণ সাহিত্যিক মাহবুবুল আলম, ওহীদুল আলমের সঙ্গেও শওকত ওসমানের ভাল সম্পর্ক গড়ে উঠে। চট্টগ্রামের 'প্রান্তিক নবনাট্য সংঘের' ভাইস প্রেসিডেন্টও হয়েছিলেন। পঞ্চাশের দশকের 'রেলওয়ে ইনস্টিটিউট' (পরে ওয়াজিউল্লাহ ইনস্টিটিউট) থেকে প্রকাশিত 'পরিচিতি' পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন শওকত ওসমান।[৫৪]

পূর্ব ও পশ্চিম বাংলায় (১৯৫০ সালে) দাঙ্গা সংঘটিত হলে ঐ সময় শওকত ওসমানের পরিবার চট্টগ্রামে তাঁর সঙ্গে অবস্থান করে। সরকারি বাধা উপেক্ষা করে তিনি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। এ সম্পর্কে আবুল আজাদ বলেন:

১৯৫২ সালের আগস্টে পূর্ব পাকিস্তান সাংস্কৃতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় কুমিল্লায়। শওকত ওসমান এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য পেশ করেন। পরবর্তী ৫ বছরের মধ্যে রাজনৈতিক মঞ্চেও শওকত ওসমান আবির্ভুত হন। ১৯৫৭ সালে কাগমারিতে অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের সাংস্কৃতিক সম্মেলনে পঠিত প্রবন্ধটি 'আধুনিক বাংলা সাহিত্য' শিরোনামায় উপস্থাপিত হলেও এর ভেতরকার বেশির ভাগ কথাবার্তাই ছিল বাঙালি জাতীয়তা বিকাশের প্রেরণা সঞ্চারক।[৫৫]

এ সময়ে সমকালীন সমাজভাবনাকে অবলম্বন করে তিনি সাহিত্য রচনা করেন। ষাটের দশকে শওকত ওসমানের একাধিক গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য : *প্রস্তর ফলক* (১৯৬৪), *উপলক্ষ্য* (১৯৬৫), *নেত্রপথ* (১৯৬৮), *উভশৃঙ্গ* (১৯৬৮)। এ কাল পর্বে গল্পের প্রধান বিষয় হিসেবেও তিনি নির্বাচন করেছেন সমকালকে। ফলে সমকালের ব্যক্তি-সমাজ এবং রাষ্ট্রকেন্দ্রিক নানামাত্রিক জটিলতা, সমাজ-সংস্কৃতির নানাচিত্র এ পর্বের গল্পে তুলে ধরেছেন। "সমকালের শৃঙ্খলিত শাসন ব্যবস্থা, মন্বন্তর, সাম্প্রদায়িকতা,

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাভাগ পরবর্তী প্রতিক্রিয়া, ধর্মীয় চালচিত্র, ব্যক্তিক জটিলতা তাঁর এপর্বের রচনাতে স্থান পেয়েছে।[৫৬] এ প্রসঙ্গে জিল্লুর রহমান বলেন:

> সমকাল তাঁকে স্বস্তি দেয় নি, দেয় নি বন্ধুত্বের স্নিগ্ধ স্পর্শ। মনে হয় যেন তাঁর একা বুকে ধারণ করে চলেছেন সারা দেশের, সমগ্র সমাজের বঞ্চনার জ্বালা।[৫৭]

পাকিস্তান কালপর্বে রচিত তাঁর অনেক গল্পেই পাকিস্তান পর্বের অনেক বিষয়ই ফুটিয়ে তুলেছেন রূপকের অন্তরালে। মূলত গল্পকার নতুন কালের প্রতিক্রিয়াকে ব্যক্ত করতে গিয়ে রূপক-প্রতীক-ইঙ্গিতধর্মিতাকে অনুষঙ্গ হিসেবে বেছে নিয়েছেন। এটা উল্লেখ্য যে, "সভ্যতার ক্রান্তিকালে-রাজনৈতিক অস্থিরতায়-ব্যক্তিক নিরাপত্তাহীনতায় শিল্পী-সাহিত্যিকগণ সরলরেখায় অনেক কিছু প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকেন এবং এ সময় প্রকাশের যথার্থ মাধ্যম হিসেবে রূপক-প্রতীকের বহুবিধ ব্যবহার করেন, কথাসাহিত্যিক শওকত ওসমানও এর ব্যতিক্রম নন।"[৫৮]

বাংলাভাগের পরে উভয় অঞ্চলের ভাগ্যবিড়ম্বিত মানুষের নিরাপত্তাজনিত অভাব দেখা যায়, সেইসাথে নতুন পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য বিরামহীন সংগ্রাম প্রকট হয়ে ওঠে। রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তের প্রত্যক্ষ শিকার শওকত ওসমানের (পাকিস্তান কালপর্বের) ছোটগল্পে বাংলাভাগের পরবর্তী প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে। এসময় উদ্বাস্ত মানুষগুলো শহরের অলি-গলি, ফুটপাথ এবং রেলস্টেশনসহ বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। এ রকম একটি চিত্রের সাহায্যে *জুনু আপা ও অন্যান্য গল্প* গ্রন্থের 'গেঁহু' গল্পটি রচিত। এ-গল্পে উদ্বাস্তদের মানবেতর জীবন যাপনের নানাদিক উন্মোচিত হয়েছে। 'গেঁহু' গল্পে দেখা যায়–পাকিস্তান সৃষ্টির পর ভারতের আজমগড় জেলা থেকে পূর্ববাংলায় এসেছিল অবাঙালি জব্বার, তার পত্নী খয়রন, তিন ছেলেমেয়ে ও বৃদ্ধা মাকে নিয়ে। বাংলাদেশের আবহাওয়া তাদের জন্য স্বস্তিদায়ক ছিল না। ট্রেনের বগিতেই ছিল তাদের সংসার। গল্পকারের ভাষায়:

> স্পষ্ট দেখা যায় বগীর অভ্যন্তর। একটা গেরস্থের সংসার রীতি-মত। এইটুকু জায়গা। তবু সান্নিধ্যের কি অপরূপ মহিমা। এককোণে হাঁড়ি-কুড়ি, পায়খানার লোটা, রান্নার অন্যান্য আসবাব : উঠোন-চুলো, লক্‌ড়ী, ন্যাকড়া, ফ্যান-গালা গামলা, কয়েকটা বাঁশের পাতলা চুপড়ী। অন্য কোণে কয়লা এবং এই জাতীয় ইতর স্তুপের বোঝা। একটা ছাগল বাঁধা রয়েছে দুই কোণের মাঝখানে। কয়লার উপর জমেছে ছাগলের লাদী।[৫৯]

বাংলাভাগ-উত্তর উদ্বাস্তু সমস্যাকে তুলে ধরতে গিয়ে গল্পকার রেলগাড়ির একটি পরিত্যক্ত বগিকে একটি পরিবারের আশ্রয়স্থল হিসেবে দেখিয়েছেন। "বাংলাভাগের অসারতা প্রমাণের জন্য গল্পকার এ-

Dhaka University Institutional Repository

পরিবারের উদাহরণ পাঠকের সামনে জীবন্ত করে তুলেছেন। তাছাড়া রেলগাড়ির বগিতে পরিবারটিকে আশ্রয় দেওয়ার মধ্যে গল্পকার সাধারণ মানুষের অনন্ত ছোটাছুটিকে নির্দেশ করেছেন, যেমন রেলগাড়ি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ছুটে চলে।"[৬০]

বাংলাদেশে এসে জব্বারের স্ত্রী খয়রন ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়। গমের বদলে ভাত খেতে হয়। এতে জ্বর ছাড়ে না। এটা নিয়ে জব্বারের কাছে তার বৃদ্ধা মা অভিযোগ করে। কারণ অনেক দিন বৃদ্ধা মা গেঁহু অর্থাৎ গমের রুটি খায় নি। মায়ের সঙ্গে গেঁহু নিয়ে জব্বারের কথা কাটাকাটি হয়। অভিমান করে মা ভাত না খেয়ে ঘুমিয়ে গেলে জব্বারও না খেয়ে শুয়ে পড়ে। গভীর রাতে বৃদ্ধা মা উঠে দেখে তার ছেলে না খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। অতঃপর জব্বারের মা ছেলেকে ডেকে তুলে এবং উভয়েই ভাত খেয়ে পরিতৃপ্ত হয় এবং গেঁহুর কথা তুলবেন না বলে প্রতিশ্রুতি দেন– "হ্যাঁ, ব্যাটা। গেঁহু কা মু মে ঝাড়ু মারো।"[৬১] গল্পকার শত প্রতিকূলতার মধ্যেও সন্তানের প্রতি মায়ের চিরন্তন ভালোবাসা 'গেঁহু' গল্পে ফুটিয়ে তুলেছেন। বাংলাভাগ সাধারণ মানুষের জীবনে যে অশান্তির বিষ-বাষ্প বয়ে এনেছে গল্পকার তা প্রতীকী চিত্রকল্পে 'গেঁহু' গল্পের পরিণাম নির্দেশ করেছেন:

> একটু পরে বগির মুখ বন্ধ হোয়ে গেল। নিভে গেল ল্যাম্প।... শ্রাবণের ঝিল্লী ঝকৃত রাত্রি...চারদিকে অন্ধকার।... এখন শুধু গুহা আর গুহা।[৬২]

এই গল্পটির সার্থকতা নিয়ে প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক আখতারুজ্জামান ইলিয়াস বলেছেন:

> নিজের মাটি থেকে ওপড়ানো মানুষের শেকড়-ছেঁড়া চেহারা 'গেঁহু' গল্পে যেমন প্রকট, অন্য কোথাও তার ছায়াও দেখেছি বলে মনে হয় না।[৬৩]

শওকত ওসমান সাধারণ মানুষের আকাঙ্ক্ষা, নতুন দেশ সৃষ্টির আনন্দ প্রভৃতির বাস্তবতা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। 'মন্ত্রগুণ' গল্পটিকে তাঁর চিন্তার সঙ্গে স্ববিরোধী মনে হলেও গল্পকার হিসেবে এ-গল্পে বাংলাভাগোত্তর স্বাধীনতা দিবসের আলো ঝলমলে পরিবেশ, সাধারণ মানুষের সাথে খ্রিস্টান লরেন্সের দিবসটি পালনের আনন্দোৎসবের চিত্র অঙ্কন করেছেন সার্থকভাবে। এ-গল্পে খ্রিস্টান ভদ্রলোক লরেন্স বিদেশি হলেও মনে-প্রাণে নিজেকে এদেশি মনে করেন। তিনি শহরের পরিবেশ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে স্বাধীনতার মন্ত্রগুণে গুণ্ডাদের পরিবর্তিত হওয়ার ইতিবৃত্ত উপলব্ধি করেন। যারা এতদিন আদিম জিঘাংসায় শহরের পরিবেশকে কলুষিত করেছিল, তারাই আজ নতুন যুগের পালাবদলের অংশীদার। লেখকের ভাষায় :

> এতদিন গোলাম ছিলাম। কাইজ্যা করছি। আর তো গোলাম না, স্বাধীন মানুষ।...এই আমার দেশের মানুষ। ঘুমন্ত দৈত্যদল এক নিমেষে এক মন্ত্রে জেগে উঠেছে। কাল বিকেলেও যার চোখে ছিল খুনের আঁচড়, হাতে ছোরা ; আজ সে

Dhaka University Institutional Repository

গোলাপ-পাশ-ধারী। এদের দিয়েই দুনিয়ার সমস্ত অসাধ্যসাধন সম্ভব...এরাই নিখাদ বারুদের কণা–পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ অস্ত্রশালা।...মনে তারস্বরে বেজে যায় : আমি আর গোলাম নই, আমি স্বাধীন।[৬৪]

রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্ত এবং ধর্মীয় প্রেরণা ছাড়াও বাংলাভাগের মূলে দেশকে স্বাধীন করার স্পৃহা এবং ভবিষ্যৎ কল্যাণকর রাষ্ট্র গঠনের আকাঙ্ক্ষা সক্রিয় ছিল, এবং আরো সক্রিয় ছিল গভীর দেশপ্রেম।

নেত্রপথ গ্রন্থের 'চিড়িমার' গল্পে লেখক 'গানের পাখি' এবং 'চিড়িমার' (শিকারী) শব্দদ্বয়কে যথাক্রমে দেশপ্রেমিক মানুষ এবং নির্যাতনকারী শাসক শ্রেণির প্রতিনিধি হিসেবে অঙ্কন করেছেন। পাকিস্তানি স্বৈরাচারী শাসকশ্রেণি সর্বদা এদেশের জনগণের কণ্ঠরোধ করতে তৎপর ছিল। 'চিড়িমার' গল্পে চিড়িমারের হাতে গানের পাখি ডাহুক, ঘুঘু, শ্যামা, টিয়া, কোকিল, দোয়েল প্রভৃতি খাঁচায় বন্দি হওয়ার মধ্য দিয়ে পাকিস্তান সরকারের ষড়যন্ত্রমূলক কণ্ঠরোধের একটি চিত্র লেখক অঙ্কন করেছেন। বন্দি পাখিদের আর্তনাদে কথকের মনও বিষণ্নতায় ভরে ওঠে :

– তোমরা কে?

– আমরা চিড়িমার।

– কি করো?

– চিড়িয়া ধরে বাজারে বেচি।

....পাখিগুলোর দিকে চেয়ে আমার কষ্ট হয়। ওদের কাউকে বিশেষভাবে চিনতাম না। কিন্তু আমার প্রবাস-দিন এই বিহঙ্গ-সাহচর্যেই তো মধুময় হোয়ে উঠত।

শুধালাম, "তোমরা এইসব পাখি ধরেছ কেন?"

– কি পাখি? একজন জবাব দিলে।

– কোকিল দোয়েল।

– এদের নিশ্চয় ধরব।

...

– কিন্তু এই গানের পাখি ধরে তোমাদের কি হবে?

– সাহেব, সেই জন্যেই তো এদের আগে ধরা উচিত। এরা গান গাইলে, গান শুনে শুনে জঙ্গলের সমস্ত পাখি নড়েচড়ে, লাফালাফি করে।[৬৫]

১৯৫৯ সালের ২৬ অক্টোবর জেনারেল আইয়ুব 'মৌলিক গণতন্ত্র' নাম দিয়ে আন্দোলনকারী মানুষদের বিনা অপরাধে কারাগারে নিক্ষেপের মাধ্যমে তাদের কণ্ঠরোধের চেষ্টা করেন। 'চিড়িমার' গল্পে গানের পাখিদের

Dhaka University Institutional Repository

ধরে খাঁচায় ঢুকানোর মাধ্যমে আইয়ুব সরকারের অত্যাচারের কাহিনি রূপক আকারে প্রতিফলিত হয়েছে। সানজিদা আকতার বলেন:

> 'চিড়িমার' গল্পে স্বৈরশাসনের শৃঙ্খলে বন্দি অপরাহত মানুষের অব্যক্ত যন্ত্রণার সতর্ক প্রকাশ ঘটেছে।[৬৬]

পাকিস্তান সৃষ্টির সূচনাকাল থেকে সাধারণ মানুষের জীবন উপভোগের বিষয়টি নির্ভর করতো শাসক শ্রেণির মর্জির উপর। সাধারণ মানুষ শাসক শ্রেণির এই রীতিনীতি ভাঙতে তৎপর ছিল, যার চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে *প্রস্তর ফলক* গ্রন্থের 'দীক্ষায়ণ' গল্পে। পাকিস্তানি শাসকদের নিয়মনীতি উপেক্ষা করে পাঁচজন রাজকর্মচারী ও ব্যবসায়ী আনন্দ-উপভোগের জন্য রাতের আঁধারে গাড়ি করে বেরিয়ে পড়েন। তারা একত্রে মদ্যপান এবং নাচানাচি করেন। এক গরীব চাষী মহাজনের একদল ভেড়া নিয়ে যাওয়ার সময় আনন্দরত হবিব খানেরা তাকে মদ পান করার আমন্ত্রণ জানায়। কিন্তু চাষী মদ পান করতে রাজি না হওয়ায় তারা চাষীকে বাদ দিয়ে ভেড়াদের জোর করে মদ পান করায়। লেখকের ভাষায় :

> ভো বন্ধু...তোমা দুঃখ আমার দুঃখ।...অথচ এদেশে বাস করতে হবে।...মানুষরে ত শরাব খাওয়ানো গেল না। এসো ভেড়াকে শরাব পান করাই।
>
> তারপর রক্তিমের ভংগীতে শফীউল্লা চীৎকার দিলে, "অথচ এদেশে বাস করতে হবে...বন্ধুগণ...আসুন...আমরা ভেড়া দিয়েই শুরু করি...আসুন...বিসমিল্লা..." ।[৬৭]

মুলত 'দীক্ষায়ণ' গল্পে শৃঙ্খলিত পাকিস্তান রাষ্ট্রযন্ত্রের নিয়ম-নীতি ভাঙার কথা বলা হয়েছে।

শওকত ওসমানের *প্রস্তর ফলক* গ্রন্থের 'শিকারী' গল্পে অতি সুক্ষ্মভাবে রূপকের অন্তরালে রাজনৈতিক চিত্র উপস্থাপন করেছেন। গল্পের কাহিনীতে পাখি শিকারের কথা উঠলেও মূলত আইয়ুব খানের মার্শাল ল-এর উত্তাল রাজনৈতিক সময়স্রোত গল্পে বিবৃত হয়েছে। গল্পে দেখা যায়– তাজু খান এবং আয়াজ চৌধুরী দুই বন্ধু পাখি শিকার করতে যান। তাজু খান পাখি শিকারি এবং বন্ধু আয়াজ ছিলেন প্রকৃতিপ্রেমিক। আয়াজ পাখি শিকারের জন্য নয় পাখি দেখার জন্য বন্ধু তাজু খানের সাথে হাওড়ে যান। বন্ধু আয়াজ চৌধুরীর নিষেধ সত্ত্বেও তাজু খান হাঁস শিকার করে প্রকৃতির শান্ত পরিবেশকে অশান্ত করে তোলেন। একটি হাঁসের মৃত্যুতে তার অপর সঙ্গী হাঁসটি তারস্বরে আর্তনাদ করছিল। কিন্তু তাজু খান ঐ হাঁসটিকেও মারতে গিয়ে পিছলে পড়ে যান এবং বন্দুকের গুলি তার পাঁজর বিদ্ধ করে বেরিয়ে যায়। মৃত্যুর পূর্বে তাজু খান উচ্চারণ করে:

> The murderer murdered thus. – খুনীরা এইভাবে খুন হয়।[৬৮]

Dhaka University Institutional Repository

'শিকারী' গল্পে গল্পকার তাজু খানের মৃত্যুকে দেখিয়েছেন প্রতীকী অর্থে। "প্রকৃত অর্থে যে শাসকচক্র এদেশের শান্ত পরিবেশকে মার্শাল ল দিয়ে অশান্ত এবং গণতন্ত্রকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন, তাদের সে সিদ্ধান্ত যে আত্মঘাতী হয়ে তাদেরই প্রাণসংহার করবে তা গল্পকার রূপকের মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন কথাসাহিত্যিক শওকত ওসমান গল্পটিতে যে মনোভাব ব্যক্ত করেছিলেন তার প্রতিফলন লক্ষ করা যায় ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের মাধ্যমে।"[৬৯]

প্রস্তর ফলক গল্প গ্রন্থের 'ভ্রুণাঙ্ক' গল্পটি রূপকধর্মিতার দিক থেকে অভিনব। এ গল্পে গল্পকার রূপকের অন্তরালে একটি নতুন বোধ সঞ্চার করেছেন। এ সম্পর্কে চঞ্চল কুমার বোস বলেন:

> মাতৃজঠর থেকে ভূমিষ্ঠ হয়নি, এমন এক সুপ্ত মানবভ্রুন গল্পকারের অনিন্দ্য শিল্পকলায় চরিত্রকল্প হয়ে উঠেছে। সমাজ-অস্বীকৃত এক অবৈধ সন্তানের তীব্র সামাজিক মানবিক অসহায়ত্ব উন্মোচনের মৌল অভীপ্সা থেকেই যেন লেখক উত্তম পুরুষে কাহিনি বর্ণনা করেছেন।[৭০]

এ গল্পের মানব ভ্রুণটি ছিল অনেক সংগ্রামের মাধ্যমে সৃষ্টি হতে চলা বাংলাদেশ নামক ভবিষ্যৎ রাষ্ট্র।

গল্পের কাহিনিতে দেখা যায় হাবিব এবং রাফেজার প্রণয়ের ফসল মানবভ্রুণটি মাতৃজঠরের নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকার ভেদ করে পৃথিবীর আলো-বাতাস দেখার জন্য অস্থির। গল্পের ভাষায়:

> সমস্ত সর্পিলতার বেড়া ছিঁড়ে আমি বাইরে আসতে চাই। আমি জননীর মুখ, পৃথিবীর মুখ দেখার প্রয়াসী। দুই ঋতু আমাকে অস্থির করে তুলেছে। বউলে-মুকুলে, পত্রঝরা মিমির আওয়াজে, নীড়কারিগর পাখির কলভাষে, শীর্ণ স্রোত-লগ্ন চরের বালু-ঝিকিমিকি-রেখায় সমন্বিত, কি মধুর এই মধুমাস। কত মধুভারনম্র পৃথিবীর ধুলি ঋত্বিকের গুহাবাস নয় আর।[৭১]

'ভ্রুণাঙ্ক' গল্পে গল্পকার বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটির জন্ম-যন্ত্রণার কথাই রূপকের আড়ালে ব্যক্ত করেছেন। যদিও ১৯৪৭ সালে 'দ্বি-জাতি' তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রযন্ত্রের সৃষ্টি হয়, কিন্তু শুরু থেকেই পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী পূর্ববাংলার জনগণকে সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে শোষণ-নির্যাতন করে। তাই পূর্ব বাংলার জনগণ এক নতুন রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখে। কিন্তু পাকিস্তানি শাসকচক্রের ষড়যন্ত্রে তা বারবার ব্যর্থ হয়ে যায়। বুলবন ওসমান বলেন- "অবশেষে 'ভ্রুণাঙ্ক' গল্প লেখার সাত বছর পর এই শিশুটির জন্ম হয় এদেশে, যার নাম : বাংলাদেশ।"[৭২]

Dhaka University Institutional Repository

শওকত ওসমান সরাসরি রাজনীতির সাথে যুক্ত ছিলেন না, কিন্তু রাজনীতি সম্পর্কে তাঁর স্পষ্ট একটা ধারণা ছিল। যার কারণে তাঁর রাজনীতি-ভাবনা ও সাহিত্যভাবনা একাত্ম হয়ে গিয়েছে। তাই শওকত ওসমান রাজনৈতিক চিত্র উপস্থাপন করতে গিয়ে যেমন পাকিস্তানের সামরিক সরকারের স্বৈরাচারী মনোভাব তুলে ধরেছেন, তেমনি এদেশের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা হিসেবে বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের ইঙ্গিত করেছেন।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে পূর্ব বাংলার বিশাল গণরায়কে উপেক্ষা করে স্বৈরশাসক ইয়াহিয়া খান এবং পশ্চিম পাকিস্তান পিপলস পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভূট্টো নতুন ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করে রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি করে। এ রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ রমনা রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' এ ঐতিহাসিক ভাষণের মাধ্যমে দেশবাসীকে মুক্তি সংগ্রামের আহবান জানান। অন্যদিকে ২৫ মার্চ রাতে বর্বর পাকিস্তানি সেনারা আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে নিরস্ত্র বাঙালির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারা নির্বিচারে হত্যা, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ, নারী নির্যাতন করে নারকীয় বিভীষিকা সৃষ্টি করে। "অবশেষে আরম্ভ হয় হাজার বছরের বাঙালি জীবনের শ্রেষ্ঠ ধ্রুপদী ঘটনা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ। প্রতিবাদী বাঙালিও তাদের সর্বশক্তি প্রয়োগ করে। দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে ১৬ ডিসেম্বর অর্জিত হয় বাংলাদেশের স্বাধীনতা, যা এদেশের হাজার বছরের ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ অর্জনগুলোর মধ্যে অন্যতম।"[৭৩]

বাংলাদেশ ও বাঙালি জাতির জীবনে ১৯৭১ সালের মুক্তিসংগ্রাম একটি স্মরণীয় অধ্যায় এবং রাজনৈতিক তাৎপর্যময় ঘটনা। এ স্বাধীনতা সংগ্রামের ফলে বিশ্ব মানচিত্রে অভ্যুদয় ঘটে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের। এ সম্পর্কে এ. এফ. সালাউদ্দীন বলেন:

> একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ দীর্ঘকালের আত্মানুসন্ধান, দীর্ঘকালের আন্দোলন এবং ইতিহাসের অমোঘ প্রক্রিয়ার পরিণতি।[৭৪]

বাঙালি জাতি ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভ করলেও তার ক্রমবিবর্তন সাধিত হয়েছে বিচিত্র পথ ধরে। "বাংলাদেশের রাজনীতির ইতিহাসে ১৯৭২-২০০০ একটি গুরুত্বপূর্ণ কালপর্ব। মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশ এ সময় এক তীব্র অস্থিরতার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়। এ কালপর্বকে আবার তিনটি অংশে ভাগ করা যায় : ১৯৭২-৭৫, ১৯৭৫-৯০ ও ১৯৯০-২০০০।"[৭৫] স্বাধীন বাংলাদেশে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ প্রথম সরকার গঠন করে। দেশের সর্বত্র তখন অস্থিরতা বিরাজ করছিল। সেই পরিস্থিতিতে যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশে আওয়ামী লীগ জাতিকে জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার আলোকে প্রণীত একটি

Dhaka University Institutional Repository

গ্রহণযোগ্য সংবিধান উপহার দিতে সমর্থ হয়েছিল। "১৯৭২ সালে প্রণীত নতুন সংবিধানের আলোকে ১৯৭৩ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ নতুন সরকার গঠন করে। নতুন রাষ্ট্রের প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরূপতা, খাদ্য সাহায্য পাঠাতে বিলম্ব, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের দেশ পরিচালনায় অদক্ষতার কারণে ১৯৭৪ সালে দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। ধীরে ধীরে দেশ নতুন সংকটের দিকে অগ্রসর হয়। আবার এরই মধ্যে মুক্তিযুদ্ধে পরাজিত দেশি-বিদেশি শক্তির ষড়যন্ত্রও থেমে ছিল না।"[৭৬]

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বিপথগামী একদল সৈন্যের হাতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে নির্মমভাবে নিহত হন। ১৯৭৫-এর পরবর্তী ১৫ বছরের অধিককাল সামরিক, আধা-সামরিক শাসনে দেশ পরিচালিত হয়েছে। অর্থাৎ শাসকশ্রেণি সুচতুরভাবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ভূলুণ্ঠিত করেছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকান্ডের পর বাংলাদেশের রাজনৈতিক বিকাশ তার স্বাভাবিক গতিপথ হারায়। এ সম্পর্কে সৈয়দ আবুল মকসুদ-এর মন্তব্য:

> তারপর এলো সরাসরি সামরিক শাসন। জাতির জীবন থেকে হারিয়ে গেল ভাষা আন্দোলনের চেতনা, ৫৪-র ২১ দফার চেতনা, ৬২-র শিক্ষা আন্দোলনের মর্মবাণী, ৬৬-র ছয় দফার চেতনা, ৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থানের সময় ছাত্রদের ১১ দফার অঙ্গীকার এবং সবচেয়ে যা বেদনাদায়ক তা হলো মুক্তিযুদ্ধের চেতনা। গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করতে করতে দেশ স্বাধীন হয়েছিল, সেই গণতন্ত্রই দেশ থেকে নির্বাসিত হলো।[৭৭]

১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর কেন্দ্রীয় কারাগারে জাতীয় চার নেতা– সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমদ, কামরুজ্জামান ও মনসুর আলীকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। অন্যদিকে ৭ নভেম্বর সিপাহী-জনতার অভ্যুত্থানে খালেদ মোশাররফ নিহত হলে সামরিক বিধিবলে জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় আসেন। ১৯৮১ সালের ৩০ মে পর্যন্ত তিনি দেশ শাসন করেন। কিন্তু ১৯৮১ সালের ৩১ মে আরেকটি সামরিক অভ্যুত্থানে জিয়াউর রহমান নিহত হলে ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ জেনারেল এরশাদ রাষ্ট্র পরিচালনায় আবির্ভূত হন। কিন্তু ১৯৮৮ সালের নির্বাচনের পর এরশাদ-বিরোধী আন্দোলন তীব্র হয়ে ওঠে। জেনারেল এরশাদের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন স্বরূপ ১৯৮৯ সালের ১০ অক্টোবর ছাত্ররা সচিবালয় ঘেরাও করে এবং 'সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য' গঠন করে। অন্যদিকে বিরোধী দলগুলো এরশাদ সরকারের শাসনক্ষমতার অবসান ঘটাতে ১৯৯০ সালের ১৯ নভেম্বর যৌথ আন্দোলনের ঘোষণায় স্বাক্ষর করে। রাজনৈতিক দল ও ছাত্রসমাজের তীব্র আন্দোলনের মুখে ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর এরশাদ সরকার পদত্যাগ করেন এবং বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। জেনারেল এরশাদের পদত্যাগের মাধ্যমে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে গণতন্ত্রের উত্তরণ ঘটে। এ সম্পর্কে হারুন-অর-রশিদ মন্তব্য করেন:

Dhaka University Institutional Repository

জেনারেল এরশাদের দীর্ঘ স্বৈরশাসন বিরোধী গণতান্ত্রিক সংগ্রামের শেষের দিকে ১৯৯০ সালের ১৯ নভেম্বর আন্দোলনরত তিন রাজনৈতিক জোটের পক্ষ থেকে সংবিধানের আওতায় এরশাদ ও সরকারের পদত্যাগ, নির্দলীয় নিরপেক্ষ ব্যক্তির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর এবং সার্বভৌম সংসদ প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার ঘোষণা (যা 'তিন জোটের রূপরেখা' নামে খ্যাত) আমাদের শাসনতান্ত্রিক রাজনীতির ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী ঘটনা। রূপরেখা ঘোষণার স্বল্প সময়ের ব্যবধানে এরশাদ-বিরোধী ছাত্রজনতার গণঅভ্যুত্থান সংঘটিত হয়।[৭৮]

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ধারার সুস্থ বিকাশে ১৯৯০-২০০০ সাল পর্যন্ত কালপর্বটি তাৎপর্যপূর্ণ। দীর্ঘ সেনাশাসনের অবসানের পর ১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি নিরপেক্ষ-নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে এ নির্বাচনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) জয়লাভ করে সরকার গঠন করে। কিন্তু "নির্বাচিত সরকার গঠনের মাধ্যমে এদেশের রাজনীতিতে যে সুস্থ ধারা বিকাশের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল তা অল্প দিনের মধ্যে বিনষ্ট হয়। রাজনৈতিক দলগুলোর একে অপরের প্রতি অবিশ্বাস-মতানৈক্য-অসহিষ্ণুতা-ক্ষমতার লড়াই, বৈদেশিক দাতা-সংস্থা-ব্যক্তির কর্তৃত্ব, জনগণের অসচেতনতা এবং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর দুর্বলতা রাজনৈতিক বিকাশকে ব্যাহত করেছে।"[৭৯]

বিরোধী দল আওয়ামী লীগ ১৯৯৪ সালের মার্চ থেকে সংসদ বর্জন করেন এবং ডিসেম্বর মাসে একযোগে আওয়ামী লীগের সাংসদগণ সংসদ থেকে পদত্যাগ করেন। ১৯৯৫ সালের ২৪ নভেম্বর প্রেসিডেন্ট পার্লামেন্ট ভেঙ্গে দেন। ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি ভোটারবিহীন এক নির্বাচনের মাধ্যমে বিএনপি আবার সরকার গঠন করে, কিন্তু বিরোধীদলের আন্দোলনের মুখে এ সরকার পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়। ১৯৯৬ সালের নির্বাচনের মাধ্যমে দীর্ঘদিন পর আওয়ামী লীগ আবার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, "১৯৯০ পরবর্তীকালে বাংলাদেশের রাজনীতিতে জোটবদ্ধ নির্বাচন-সংস্কৃতির সম্প্রসারণ ঘটেছে। তবে নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানে স্বৈরাচারী সরকারের পতন হলেও রাজনৈতিক দলগুলোর স্বৈরাচারী মনোভাবের পতন ঘটেনি, যার ফলে গণতন্ত্রও সুনির্দিষ্ট ভিত্তিভূমি খুঁজে পেতে ব্যর্থ হয়েছে। তাছাড়া সমস্ত আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু জাতীয় সংসদও প্রত্যাশা পূরণে সক্ষম হয়নি। এক্ষেত্রে প্রধানত রাজনৈতিক দলগুলোর যথাযথ ভূমিকা এবং জনগণের সচেতনতার অভাবকেই স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে তার কাঙ্ক্ষিত সফলতা অর্জন করতে না পারার ব্যর্থতার জন্য দায়ী করা যায়।"[৮০]

শওকত ওসমানের সমাজ সচেতনতার সাথে রাজনৈতিক বিষয়গুলোকে অঙ্গীভূত করে দেখার দৃষ্টি, নির্ভীক উচ্চারণ তাঁকে বাংলাসাহিত্যে পৃথক আসন দান করেছে। কারণ ব্রিটিশ কালপর্ব ও পাকিস্তান কালপর্বের মত বাংলাদেশ কালপর্বেও তিনি মৌলবাদ, স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের সাথে একাত্মতা প্রকাশ

Dhaka University Institutional Repository

করেছেন– কখনও লেখনীর মাধ্যমে আবার কখনও রাজপথে নেমে উচ্চ কণ্ঠে। ব্যক্তি শওকত ওসমান এবং সাহিত্যিক শওকত ওসমান ছিলেন পরস্পর সমান্তরাল। কারণ ব্যক্তিজীবনের মত তিনি সাহিত্য সাধনাতেও ছিলেন আন্তরিক, ন্যায়নিষ্ঠ, স্পষ্টভাষী, প্রতিবাদী ও কর্তব্যসচেতন। এখানে উল্লেখ্য যে, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে নিহত হলে তিনি প্রতিবাদস্বরূপ ২২ আগস্ট স্বেচ্ছায় দেশ ত্যাগ করে ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে ১৯৮১ সালে স্বেচ্ছানির্বাসন থেকে দেশে ফিরে এসে সার্বক্ষণিক লেখালেখিতে সময় ব্যয় করেন। তিনি তাঁর মনের কথা মুখে এনে লেখনীর মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। এ সম্পর্কে অনীক মাহমুদ বলেছেন:

> দেশ কালের পরিবর্তনের প্রক্রিয়াকে শওকত ওসমান নিরবচ্ছিন্নভাবে অনুধাবন করেছেন। নিজের দর্শন বিশ্বাসবোধের দীপ্তিতে সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি এমনকি ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গিকে নিরন্তর স্থাপন করে আপন শিল্পলোকের বিস্তৃতি ও সমৃদ্ধি সাধন করেছেন।[৮১]

১৯৭১ সালের স্বাধীনতা-সংগ্রাম শওকত ওসমানের মনন ও সাহিত্যকর্মে গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল। তাই সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনা এবং বৈচিত্র্যময় জীবনের অভিঘাত, স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশের চিত্র, যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের বহুবিধ অস্থিরতা তাঁর গল্পের অবয়বে ফুটে উঠেছিল। অর্থাৎ শওকত ওসমান তাঁর ছোটগল্পে খণ্ডকালীন অভিব্যক্তিতে স্বাধীনতা যুদ্ধের নানা অনুষঙ্গ তুলে ধরেছেন। স্বাধীনতা লাভের পরেও মুক্তিযোদ্ধার পরিণাম ও হতাশা, হানাদার বাহিনীর সদস্য কর্তৃক ধর্ষিত নারীর ক্ষোভ পর্যন্ত তার দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। সত্তরের দশকে প্রকাশিত *জন্ম যদি তব বঙ্গে* গ্রন্থের গল্পগুলি একাত্তরের ঐতিহাসিক মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিকায় রচিত। বাংলাদেশ নামক স্বাধীন ভূখণ্ডের জন্ম-যন্ত্রণার রক্তিম লাবণ্যে গল্পগুলো সজীব; উত্তম পুরুষে অধিকাংশ গল্পের কাহিনি বিবৃত হওয়ায় একাত্তরের ভয়াবহ আতঙ্ক জীবন্ত হয়ে উঠেছে। এছাড়া এ গ্রন্থের সমগ্র গল্পগুলোতেই মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণা, অনুষঙ্গ ও সংগ্রামমুখর দিনরজনীর প্রচ্ছাপ রয়েছে। 'জন্ম যদি তব বঙ্গে', 'রক্তচিহ্ন', 'জননী ও জন্মভূমি', 'ক্ষমাবর্তী' প্রভৃতি গল্পে ঘটনাবিন্যাসে লেখকের আবেগ পরিশীলিতরূপ লাভ করেছে। ঘটনা ও চরিত্র অভিন্নমাত্রিক হয়ে উঠেছে গল্পগুলোতে।

জন্ম যদি তব বঙ্গ-এর 'বার্তাবহ' গল্পে লাশ নদীতে ভেসে যেতে দেখে লেখকের কল্পনা সুদূর প্রসারী হয়েছে। লাশকে তাঁর মনে হয়েছে বাংলাদেশের বার্তাবাহক। লাশ ভেসে যাচ্ছে– আর নদীর ধার দিয়ে লোকজন হাঁটছে। এটাকে তাঁর মনে হয়েছে জানাজার শেষে শবানুগমন। এ-গল্পে ইঙ্গিতধর্মিতার মাধ্যমে লেখক বাংলাদেশের আসন্ন স্বাধীনতার যেমন ইঙ্গিত করেছেন, তেমনি পাকবাহিনীর বর্বরতার চরম সীমাকেও তুলে ধরেছেন। এছাড়া শওকত ওসমান 'জন্ম যদি তব বঙ্গে'-গল্পে একজন বৃদ্ধ বাঙালি স্বদেশপ্রেমিকের প্রতিবাদী চরিত্র অঙ্কন করেছেন। এ-গল্পের গ্রাম্য বৃদ্ধ তার বাস্তুবাড়ি ছেড়ে কোথাও যাবে না বলে বদ্ধপরিকর

Dhaka University Institutional Repository

ছিল। কিন্তু অপারেশনের সময় মিলিটারিরা গ্রামে ঢুকে তাকে মুক্তিবাহিনীর কথা জিজ্ঞাসা করে। বৃদ্ধ তাদের খবর জানে না বলে জানায়। তখন বৃদ্ধকে মিলিটারিরা একটি বন-বাদাড়ের ধারে বেয়নেট চার্জ করে ধড়ে জীবন থাকা অবস্থায় মাটি চাপা দিয়ে চলে যায়। হাত বাইরে উঁচু হয়েছিল। কাকে মাংস খেয়ে গেছে। শওকত ওসমান এই বৃদ্ধের মুখে বঙ্গবাসীকে আহবান জানিয়েছেন :

> নেকড়ের পালে পড়ে আমি আমার শেষ প্রতিবাদ রেখে গেছি বাইরের জগতে। আমার মুঠি হাত, দ্যাখো, দ্যাখো। তুমিও দুশমনকে আঘাত দিতে হাত মুঠিবদ্ধ করো। একটু দাঁড়াও। দেখে যাও, জন্ম যদি তব বঙ্গে।[৮২]

এই গল্পে সমকালীন জীবনচিত্রের মাধ্যমে যুদ্ধ এবং মুক্তির অন্বেষা যুগপৎ এক হয়ে প্রতিফলিত হয়েছে।

পশ্চিমা হানাদার বাহিনী ইসলামি রাষ্ট্রের মর্যাদা রক্ষার জন্য ইতিহাসের বর্বরতম হত্যাকাণ্ডসহ নয়মাস, জুলুম, নির্যাতনের নকশা অব্যাহত রেখেছিল। তাদের নির্যাতনের নানান পদ্ধতি ছোটগল্পে আঁকবার প্রয়াস পেয়েছেন শওকত ওসমান। *জন্ম যদি তব বঙ্গে*-এর 'আলোক অন্বেষা' গল্পে পার্টির নিবেদিত প্রাণ কর্মী সালামৎ আলি একাত্তর সালে অজপাড়া গাঁয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। এক ঘাগী মুসলিম লীগার পাঞ্জাবি মিলিটারিকে পথ দেখিয়ে সালামৎ আলিকে বন্দি করেছিল। আটচল্লিশ ঘণ্টা বন্দিশালায় সালামৎ আলিকে চোখে ফেটি বেঁধে রাখা হয়। প্রথমে তার উপরে সাইকেলের চেন দিয়ে নির্যাতন করা হয়। একদিকে ক্ষুৎ-পিপাসার জ্বালা, অন্যদিকে সব অন্ধকার করে রাখায় এক নারকীয় অবস্থার সৃষ্টি হয়। সালামৎ আলি মৃত্যুর আগে দুনিয়াটা দেখে নেয়ার প্রার্থনা জানিয়েছিল। তারপর এক পাঞ্জাবি জোয়ান আলোর প্রতিশ্রুতি দিয়ে নিয়ে যায়। সেপাই তাকে একটা চেয়ারে বসায়। রেডি বলে ঘটা করে চক্ষু উন্মোচন মাত্র সালামৎ আলির মনে হল জ্বলন্ত তীর যেন তার চোখের মধ্যে ঢুকল। লেখকের ভাষায়:

> প্রায় অচেতন তবু একেবারে মূর্ছিত-চেয়ার থেকে মাটিতে লুটিয়ে পড়ার আগে সালামৎ আলি চেতনার স্বাক্ষর পাঠ করে ফেললে নিমেষেই। জায়গাটা টর্চার চেম্বার বা নির্যাতন কক্ষ।...তার মাথার উপর পাঁচশ পাওয়ারের বাল্ব জ্বলছে...।[৮৩]

লেখক 'আলোক-অন্বেষা' গল্পে নির্যাতন কক্ষে নৃশংস অত্যাচারে অবধারিত মৃত্যুপথযাত্রী সালামতের মনে নরপশুদের ধ্বংস করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন– "দুশমনের কাছ থেকে করুণা ভিক্ষা করোনা? হয় তাদের ধ্বংস করো অথবা ধ্বংস হও।"[৮৪] এ গল্পে লেখক সালামৎ আলির আত্মগত চিন্তাপ্রবাহে মুক্তিযুদ্ধের পরিবেশকে বাঙ্ময় করে তুলেছেন। "গল্পের মূল বিষয়কে লেখক আলোকিত করেছেন সালামৎ আলির নির্ভীক চিত্র অঙ্কনের মাধ্যমে। এ গল্পে যেমন একদিকে ফুটে উঠেছে একজন সাহসী মুক্তিযোদ্ধার গৌরবান্বিত

Dhaka University Institutional Repository

জীবনদানের কাহিনি, তেমনি অন্যদিকে প্রকাশ পেয়েছে বর্বর পাকিস্তানি সৈন্যদের নারকীয় অত্যাচারের প্রতিচ্ছবি।[৮৫]

নারীধর্ষণের চিত্র লেখা হয়েছে এই গ্রন্থের 'ক্ষমাবতী' ও 'জননী: জন্মভূমি' গল্প দুটিতে। গ্রামের কৃষক তমিজ মিয়ার একমাত্র কন্যা তহমিনা। জন্মের পর তার মা মারা যায়। অল্প বয়সেই সংসারের দায়িত্ব নিয়েছিল তহমিনা। বাবার ইচ্ছা ছিল ঘরে একটা ঘরজামাই এনে রাখবে। কিন্তু হানাদার বাহিনীর অত্যাচারে সে আশার পরিসমাপ্তি ঘটে। গ্রাম অপারেশনের সময় ক্রমাগত পাঁচ হানাদার তহমিনার উপরে বলাৎকার করে। তমিজ মিয়া সংজ্ঞাহীন মেয়েকে নিয়ে বর্ডারের দিকে ধাবিত হয়। অবশেষে গোমতী নদীর তীরে এক বাড়িতে আশ্রয় পায়। মেয়ের অস্বাভাবিক অবস্থা প্রত্যক্ষ করে তমিজ মিয়া বেদনাহত হয়। মেয়েকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে :

> মারে, তুই ছাড়া আমার কেউ নাই। মারে কথা কস্ না ক্যান? হোন্! জানোয়ারে কিছু কইরলে হে মনে রাখতা নেই। কুকুর কামড় দিলে কি মানুষে মনে রাখে, না পা কাইট্যা ফেলে? মানুষে কিছু কইরলে অন্য কথা। জানোয়ারকে মানুষে মাফ কইরা দ্যায়।[৮৬]

কিন্তু তমিজ মিয়া তার দুহিতাকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার জন্য সর্বমুখী চেষ্টা করেও শেষ রক্ষা করতে পারেননি। তহমিনা তার অশুচি শরীর নিয়ে আর বাঁচতে চায়নি। তাই সে আত্মধিক্কার আর বিবেকদংশিত হয়ে গোমতীর জলে ডুবে আত্মহত্যা করে। তারপর থেকে তমিজ মিয়া উন্মাদ হয়ে যায়। তার গগনবিদারী চিৎকারের মাধ্যমে সারা দেশেরই ভয়াবহ দুর্যোগময় পরিস্থিতি অনুধাবন করা যায় :

> তোমরা যদি কোনদিন আরিচা-নগরবাড়ী- কি ডেমরা– কি মুন্সীগঞ্জ- না- বাংলাদেশের যে কোন নদীর ঘাটে যাও, হয়ত কোন জায়গায় বাউণ্ডেলে তমিজ মিয়ার দেখা পেয়ে যেতে পারো। চুলে জট, নিরেট পাগল, সদা চুপচাপ, কাঁধে কাঁথা জাতীয় বুচ্‌কী এবং বিড়বিড় আন্দোলিত ঠোঁটসহ হঠাৎ হাঁটু জলে সে নেমে যাবে,তারপর বজ্রনাদী চিৎকার দেবে, "তুই আমারে মাফ কইর‍্যা দে, মা – মা – মা –।"[৮৭]

পশ্চিমা নরপশুদের বলাৎকারের ক্ষেত্রে কোন বাছ-বিচার ছিল না। শওকত ওসমান বলেছেন:

> দেশ জননীর কিছু কুলাঙ্গার সন্তান থাকে যারা মায়ের বেইজ্জতি উপভোগ করে আশ্বিন কার্তিকে রমণরত এক জোড়ার পাশে খাড়া অন্যান্য কামাতুর কুত্তার মত তাদের পালার অপেক্ষায়।[৮৮]

হানাদার বাহিনীর সদস্যরা ছিল ধর্ষণের ক্ষেত্রে সারমেয় স্বভাবী। তাই 'জননী : জন্মভূমি' গল্পে ক্যাপ্টেন তাজ খাঁ নামক এক হানাদার বলাৎকার করে ষাটোর্ধ্ব বৃদ্ধা কসিমনকে। ক্যাপ্টেন তার সঙ্গের বাঙালি

Dhaka University Institutional Repository

কুলাঙ্গার রাজাকারকে কসিমনের ঘরে যেতে বললে মায়ের বয়সী বলে সে মাফ চেয়েছে। তখন পাশবতাড়িত ক্যাপ্টেন বলেছে :

> আরে ছোড়ো বাৎ। দেশ কো ভী তোমলোগ মা বোলতা।[৮৯]

স্মরণীয় যে, একটি ইসলামি রাষ্ট্রে মনুষ্য চেহারাধারী এই সমস্ত হানাদাররাও অফিসারের পদ অলংকৃত করেছিল।

পশ্চিমা হানাদারের পাশবিকতার প্রতিশোধের চিত্র রয়েছে *এবং তিন মির্জা* গ্রন্থের 'দ্বিতীয় অভিসার' গল্পে। একদিন রাত্রে মাজুকে তিনশত টাকার চাকরির লোভ দেখিয়ে তারই জ্ঞাতি ভাই ফরীদ রাজাকার মিলিটারির ক্যাম্পে রেখে আসে। ধর্ষিত হয়ে জীবন বাঁচিয়ে কোন রকমে মাজু বাড়িতে ফিরে আসে। কিন্তু সে হয় অন্তঃসত্ত্বা। সন্তান প্রসবের চারমাস পরে সঙ্গিনী মরিয়মকে নিয়ে এই 'বেজন্মা মিলিটারির ছাওয়ালের' সৎকারের জন্য রাতে পুনরায় যাত্রা শুরু করে মাজু। ধলেশ্বরীর স্রোতে ভাসিয়ে দিয়ে মনের জ্বালা মিটাতে চায়। অতঃপর মাজু ফেলে দেয় নদীর জলে তার অবৈধ সন্তানটিকে। "যারা মাতৃত্বের অবমাননা করে মাজুর কপালে কলঙ্ক তিলক পরিয়েছিল, তাদের বীজজাত সন্তান আপন উদরে ধারণ করেও মাজু নিজের অপমানকে ভুলতে পারেনি। তাই প্রতিশোধের শেষ বহ্নিজ্বালা মেটানোর জন্য সে ধলেশ্বরীর তীরে গিয়েছিল দ্বিতীয় বারের মত রাতের অভিসারিকা হয়ে।"[৯০] এই গল্পে শওকত ওসমান একদিকে বাঙালি নারীত্বের মধ্যে যেমন প্রতিশোধ গ্রহণের প্রবৃত্তির সঞ্চার করেছেন, তেমনই কলঙ্কমুক্ত বিজয় ঘোষণা করেছেন।

জন্ম যদি তব বঙ্গে গ্রন্থের 'রক্তচিহ্ন', 'জননী : জন্মভূমি', 'ক্ষমাবর্তী' প্রভৃতি গল্পে মুক্তিযুদ্ধে বাঙালির অপরিসীম আত্মত্যাগ, ব্যাপক প্রাণহানি এবং তাঁদের গৌরবময় বীরত্ব মুখ্য হয়ে উঠেছে।

'রক্তচিহ্ন' গল্পটির একমাত্র চরিত্র (উত্তম পুরুষ) অঙ্কনে লেখকের প্রধান শক্তি তাঁর তীব্র আবেগানুভূতি ও ঘটনাবিন্যাসে লেখকের সর্বজ্ঞতা সত্ত্বেও চরিত্রের স্মৃতিচারী দৃষ্টিকোণ বিধৃত হয়েছে:

> মনে পড়ল, তার গ্রামের কথা। সব ছায়ার মত ভেসে আসে। বাবা এখন হয়ত সারাদিনের খাটুনির পর মা'র সঙ্গে তার কথা ইয়াদ করছে। নিশুত গাঁয়ে শেয়ালের ডাকাডাকিতে ঘুম ভেঙ্গে গেছে কোন কোন গেরস্থর। কোথাও ছোট কচি বাচ্চা কাঁদছে। নদীতে এসেছে জোয়ার। গাঁয়ের রাস্তাগুলো শুকনো খটখটে, এখন জোছনা পোহাচ্ছে। দুই জেলা পার হয়ে এসেছে সে মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিতে। কুমিলার এই সীমান্ত থেকে বহু ক্রোশ দূরে ছোট পাড়া-গাঁ বার বার

Dhaka University Institutional Repository

চোখের সামনে হাতছানি দিতে লাগল। বাপের অশ্রুসজল কণ্ঠ ভেসে আসে, 'আল্লার রাহে সঁপে দিলাম, সহি সালামতে থাইক্যো বা-জান।[৯১]

আলোচ্য গ্রন্থে যুদ্ধকালীন বিচিত্র ঘটনার পাশাপাশি যুদ্ধোত্তর সময়ের অভিজ্ঞতাও প্রতিফলিত হয়েছে।

মৃত্যুর সাথে সংগ্রামরত অবস্থাতেও মুক্তিযোদ্ধারা হানাদার নিধনে পিছ পা হয়নি। এরূপ চিত্র ফুটে উঠেছে 'রক্তচিহ্ন' গল্পে। *জন্ম যদি তব বঙ্গে* গ্রন্থের এ গল্পের নাজেম অপারেশনে গিয়ে আহত হয়। দৌড়ানোর ক্ষমতা নেই। আহত অবস্থায় সামান্য দূরে গিয়ে একটি খেজুর গাছের গুড়িতে ঠেস দিয়ে বসেছিল। জীবনের অন্তিম মুহূর্ত। শরীর থেকে অবাধে রক্ত ঝরছে। এমন সময় পাঞ্জাবিরা টর্চ মেরে এগিয়ে আসে। কাছে রক্ষিত হাত বোমার পিন খুলে নাজেম ছুঁড়ে মারে হানাদারদের দিকে। বোমাটি ফাটল কয়েকজন মানুষের মিলিত আর্তনাদসহ। এখানে মৃত্যুর দুয়ারে দাঁড়িয়ে শেষ প্রতিশোধ গ্রহণের স্পৃহা মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে কিরূপ ক্রিয়াশীল ছিল, তা দেখান হয়েছে।

জন্ম যদি তব বঙ্গে গ্রন্থের 'বারুদের গন্ধ লোবানের ধোঁয়া'[৯২] গল্পে বাংলাদেশের চৌষট্টি হাজার গ্রামের একটিতে পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর ক্যাপ্টেন বশীর তার দল নিয়ে সামরিক অভিযান চালায়। এ অভিযানের উদ্দেশ্য ছিলো মুক্তিযোদ্ধা কর্তৃক সেখানকার ব্রিজ উড়িয়ে দেওয়ার প্রতিশোধ গ্রহণ করা। ভোর হওয়ার আগেই বশীরের বাহিনী গোটা গ্রাম ঘিরে ফেলে। এরপর শুরু হয় :

নির্বিচার হত্যা, অগ্নিদাহ, লুট। রমণীর চিৎকার, আর্তনাদ, আগুনের লেলিহান শিখা, প্রাণভীত মানব-মানবীর দৌড়, বেয়নেটে গাঁথা শিশু, মেশিনগানের খটখট রব-নারকীয় তাণ্ডবের নানা অধ্যায়।[৯৩]

এই ঘটনার আগে বশীরের জওয়ানরা রেললাইনের ধার থেকে লিকলিকে রোগা এক কলেজ ছাত্রকে ধরে নিয়ে এসেছিলো। বশীর তাকে জিজ্ঞেস করেছিলো,'ডরতি নেহি?' সেই ছোকরা নির্ভয়ে উত্তর দিয়েছিলো, 'কিউ?' বার বার জিজ্ঞেস করেও বশীর যখন সেই কলেজ-পড়ুয়ার কাছ থেকে একই উত্তর পায়, তখন সে চিৎকার করে উঠেছিলো,'কিয়া ডরতা নেহি?' শীর্ণদেহ ছেলেটি তখন কোনো জবাব দেয়নি। কিন্তু ক্যাপ্টেনের দিকে তাকিয়েছিলো নির্ভয়ে। সে দৃষ্টি বড় অদ্ভুত। চোখ নামিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছিলো ক্যাপ্টেন। কিছুদিন পর জেল হাজতে মারা যায় সেই তরুণ। ক্যাপ্টেন চমকে উঠেছিলো, আরো চমকে উঠেছিলো এক সিপাহী যখন তাকে বলেছিলো, 'আপ জানতে নেহি ইয়ে বাঙালী কা বাচ্চালোক কিয়া হ্যায়?' তখন একবার মনে হয়েছিলো বশীরের, মৃত লাশের চোখ দুটো সে দেখবে; তেমনি দীপ্ত, রহস্যময় কিনা।

Dhaka University Institutional Repository

আবেগময়তার মধ্যেও ঘটনার বাস্তবতা যেন অত্যুজ্জ্বল দীপ্তিতে ইতিহাসের অভ্যন্তর থেকে বেরিয়ে আসে। এছাড়াও 'বারুদের গন্ধ লোবানের ধোঁয়া' গল্পে একজন গেরিলা রণেশ দাশগুপ্তের গেরিলা যুদ্ধের কৌশল ও হানাদারদের ফাঁকি দেয়ার কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। গেরিলা লিডার দাশগুপ্ত লাশ হয়ে চাদর ঢাকা অবস্থায় শুয়েছিলেন। পাষণ্ড হানাদার ক্যাপ্টেন বশির তার দলবল নিয়ে সেই গ্রাম অপারেশন করে। হত্যা-ধর্ষণ-লুণ্ঠনের পর লাশের পাশে দুই যুবতীকে কান্নারত অবস্থায় দেখে। একজন কোরান পড়ছে। এ দৃশ্যে ক্যাপ্টেনের মনে ভাবান্তর হল। এরপর তারা চলে যায়। গেরিলা লিডার দাশগুপ্ত এভাবে সখিনা আর তহমিনা নামক দুই যুবতীকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছেন।

জন্ম যদি তব বঙ্গ-এর 'সারেঙ সুখানী' গল্পে বর্ণিত হয়েছে হানাদার নিধনের কাহিনি। জাহাজের সারেঙ সোলেমান তাঁর কর্মস্থল থেকে ছুটি নিয়ে বাড়িতে এসেছিল কয়েকদিনের জন্য। দালালরা তাকে চিনিয়ে দিলে হানাদারেরা ধরে নিয়ে গিয়ে স্টিমার চালাতে বাধ্য করে। বৃদ্ধ বয়সে পাক বাহিনীর হত্যা, লুণ্ঠন-ধর্ষণ-নির্বিচারে গ্রাম জ্বালান তাকে প্রতিশোধস্পৃহী করে তোলে। ষ্টিমারের অন্যান্য খালাসিদের সহযোগিতায় বৃদ্ধ সারেঙ মেঘনার বুকে স্টিমার ডুবাতে সক্ষম হয় এবং দেড়শ হানাদারের সলিল সমাধি রচনা করে। স্টিমার ডুবে যাওয়ার সময় সারেঙ ও খালাসিরা নদীতে ঝাঁপ দেয়। হানাদারেরা বুঝতে পেরে তাদের গুলি করে মেরেছিল। কয়েকজনের অমিত সাহস আর আত্মবিসর্জনের মধ্য দিয়ে এক প্লাটুন হানাদার খতম ছিল এক বীরোচিত অপারেশন।

'দুই বিগ্রেডিয়ার' গল্পে বাঙালির মানবতা ও পশ্চিমাদের বর্বরতার পরিমাপ করেছেন লেখক। 'দুই ব্রিগেডিয়ার' গল্পে ২৫শে মার্চের রাতে যখন আগুনের লেলিহান শিখায় ঢাকা শহর জ্বলছে, তখন আগুন নেভানোর কর্তব্যবোধে ফায়ার ব্রিগেডের কর্মী ময়ীদ ভূঁইয়া সেই ভয়ঙ্কর নিকষ অন্ধকারে জিপ নিয়ে বেরিয়ে পড়ে ফায়ার ব্রিগেড অফিসের উদ্দ্যেশে। তারপর ভূঁইয়া তাঁর সহকর্মীদের নিয়ে ছুটে চলে আগুনের শিখা লক্ষ করে। এমন সময় একটি গুলী এসে তাঁর বুকে বিঁধে। দূরে মিলিটারী জিপ। আহত ভূঁইয়া যখন বুঝলো আর্মিরাই তাঁদের লক্ষ করে গুলী ছুঁড়ছে, তখন সে ব্রিগেডিয়ার আসলামকে জিজ্ঞেস করলো:

> ভাইলোগ, আপলোগ মেরা সব ফায়ারম্যান কো কিঁউ মারা ... হাম লোগ সব ডিউটি মে নিকলা ... শহর মে আগ(আগুন) লাগা ... হাম লোগ সব ফায়ার ব্রিগ্রেড কা আদমী ... ।[৯৪]

তখন সেই নির্মম পাকিস্তানী অফিসার কিছুমাত্র অনুতাপ না করে জবাব দেয়–

Dhaka University Institutional Repository

শোনো, বাঙালীকে বাচ্চা, হাম ভী ডিউটী মে নিকলা। মেরা আব ডিউটী হ্যায় আগ (আগুন) লাগানা, জায়সা তোমহারা হ্যায় বুজানা(নেভানো) ... সমঝা...?[৯৫]

এরপর আর কী প্রশ্ন করা যায়! মৃত্যুপথযাত্রী সয়ীদ ভূঁইয়াও আর কোনো প্রশ্ন করার সুযোগ পায়নি।

অথচ হানাদারদের অগ্নিসংযোগ আর হত্যার ডিউটি ছিল পৃথিবীর নরাকার নরাধমদের অন্ধকারতম ইতিহাস- "It was the most gruesome genocide in history and it shocked the conscience of the world."[৯৬]

এই গ্রন্থের শেষ গল্প 'ওয়াগন ব্রেকার' গল্পের কাহিনি স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের দুঃসহ অর্থনৈতিক বাস্তবতার পটভূমিকায় নির্মিত। এই গল্পে স্বাধীনতা-উত্তর মুক্তিযোদ্ধাদের পরিণাম ও পরিণতি অঙ্কন করা হয়েছে। দেশের জন্য জাতির ক্রান্তিলগ্নে যে অমিত তেজে যুবসমাজ যুদ্ধে অংশ নিয়ে স্বাধীনতার সোনালি পতাকা ছিনিয়ে এনেছে, স্বাধীনতা পরবর্তীকালে তাদের কর্মসংস্থান বা আশা-আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়নে যথাযথ ভূমিকা গ্রহণ করা হয়নি। ফলে এ সময় অনেকেই ক্ষোভে-রাগে বিপথে গমন করেছে। 'ওয়াগন ব্রেকার' গল্পে শওকত ওসমান এরকম ঘটনারই বর্ণনা করেছেন। পাড়াগাঁয়ের জোবেদ মিয়ার ছেলে লাতু ওরফে লুৎফর রহমান ছিল 'ওয়াগন ব্রেকার'। ট্রেনের ওয়াগন থেকে রাতের অন্ধকারে বহুবার সে মাল নামিয়েছে। স্বাধীনতা যুদ্ধের ডাকে বাঙালির অসহায় মুহূর্তে সেও আগরতলায় মুক্তিযোদ্ধার ট্রেনিং নিয়ে যুদ্ধে অংশ নেয়। সেখানেও লাতু নিজেকে ওয়াগন ব্রেকার হিসেবে পরিচয় দিয়েছিল। তার সম্পর্কে কেউ কেউ সে সময় তাৎক্ষণিক খারাপ ধারণা পোষণ করলেও যুদ্ধে তার দক্ষতা ও কৌশল দেখে তারিফ করেছে। স্বাধীনতা অর্জনের পর লাতু বাড়ি এসেছিল বীরযোদ্ধার বেশে। তারপর বাবা-মার আশীর্বাদ নিয়ে কিছু করার জন্য শহরে চলে যায়। গিয়াস মল্লিক ছিল সহযোদ্ধা। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র বলেই সে ফিরে গেছে লেখাপড়ার কাজে। কেউ কেউ বিভ্রান্ত হয়ে ডাকাতি-হাইজ্যাক করছে। লাতুর আকাঙ্ক্ষা ছিল মুক্তিযোদ্ধা বলে হয়ত কেউ একটা চাকরি দিবে। কিন্তু কেউ তাকে খাতির করল না। সেও ভিড়ে গেল ডাকাত দলে। একদিন দিবালোকে টাকা ছিনিয়ে নেবার সময় পুলিশের গুলিতে সে নিহত হল। পুলিশরাই তাকে যথাস্থানে দাফন করে। গিয়াস মল্লিক পত্রিকায় খবর পড়ে বেদনাহত হয় এবং পুত্র শোকাতুর পিতাকে সান্ত্বনা দানের জন্য শহরের গোরস্তানে একটি কবর দেখায় লাতুর কবর বলে। গিয়াস মল্লিক লাতুর বাবাকে বলেছে :

চাচা, বেওয়ারিশ লাশের কবর এখানে। আপনি আর কাঁদবেন না। যুদ্ধের কাজ ত ফুরিয়ে গেছে। তাই এখন আমরা বেওয়ারিশ।[৯৭]

Dhaka University Institutional Repository

"মুক্তিযোদ্ধাদের যথাযথ মূল্যায়ন ও তাঁদের দানের স্বীকৃতি না দেয়ার কারণেই লাতুর এহেন পরিণতি নেমে এসেছে। এর দায়ভাগ যেমন তৎকালীন শাসকের, তেমনই জনগণেরও বটে।"[৯৮] এ-গল্পে যুদ্ধ পরবর্তী একটি দেশের সার্বিক চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে।

'দস্যু দারোগা সংবাদ' (পুরাতন খঞ্জর) গল্পেও একজন মুক্তিযোদ্ধার বিপথগামী হওয়ার চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। "মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তীকালে সঠিক পুনর্বাসনের অভাবে, শাসকশ্রেণির অদূরদর্শিতা, ভঙ্গুর অর্থনীতি এবং আইন-শৃঙ্খলার অবনতির কারণে দেশের বীর সন্তানেরা যে আদর্শচ্যুত হয়ে নীতিহীন কাজের সাথে জড়িয়ে পড়েন তা এ গল্পের স্বল্প অবয়বে লেখক উপস্থাপন করেছেন। সাবুদ আলী মুক্তিযুদ্ধের সময় দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য প্রাণপণে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। দীর্ঘ নয় মাস 'দেশকে মায়ের প্রতিরূপে দেখে-ভেবে' রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের মাধ্যমে স্বাধীনতার জন্যে অপেক্ষায় থেকেছেন।"[৯৯] গল্পের ভাষায়:

> হঠাৎ স্বাধীনতার বান ডাকল। পাঞ্জাবী জানোয়ারদের জুলুমে আমার চোখ খুলে গেল। ডাকাতি ছেড়ে দিলাম। সবলুট করা সম্পদ দেশের ছেলে যারা লড়ছিল– তাদের কাজে নিঃশেষ করে ছাড়লাম। আপনার পা ছুঁয়ে বলছি, দারোগা সাহেব, আবার নিঃস্ব। ইতোমধ্যে বউ মারা গেছে। সুতরাং কোন তোয়াক্কা নেই। আট-ন' মাস কী নেশার মধ্যে না কাজ করেছি। আমি নিজেকে চিনতে পারতাম না। খুন আগে করতাম, পরেও করেছি। পাঞ্জাবী মেরেছি, দালাল মেরেছি, রাজাকার মেরেছি...আপনার কাছে মিথ্যে বলব না। এককালের শিক্ষা বেশ কাজ দিলে। দেশ সকলের মা। আমার মরা মায়ের সঙ্গে তার যোগাযোগ ঘটেছিল কি না বলতে পারব না– আমি মাঝে মাঝে মেয়েটাকে স্বপ্ন দেখতাম, আর ডাক দিতাম : মা, মা।[১০০]

এ গল্পে দেখা যায়, স্বাধীনতা পরবর্তীকালে সমাজবাস্তবতার নির্মমতা সাবুদের স্বাধীনতার স্বাদকে বিস্বাদ করে তোলে। যার ফলে মুক্তিযোদ্ধা সাবুদ আর্থিক টানাপড়েনে বাধ্য হয়ে ডাকাতির মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করে। যদিও তার জীবিকা অর্জনের পথটি সামাজিকভাবে অবৈধ ছিল, তবুও নিরুপায় সাবুদ বাঁচার তাগিদে এ-ঘৃণ্য পথ বেছে নিয়েছিল– যার বর্ণনা সাবুদ ডাকাত দারোগা আলি সাহেবের কাছে দিয়েছিল। মুলত এ গল্পে লেখক শওকত ওসমান সাবুদ ডাকাত চরিত্রের মাধ্যমে স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের বিশৃঙ্খল পরিবেশ এবং মুক্তিযোদ্ধাদের অবমাননাকর দিকটি ফুটিয়ে তুলেছেন।

রাজনৈতিক কালপ্রবাহ এবং তার অভিঘাত-চাঞ্চল্যকে শওকত ওসমান প্রত্যক্ষ করেন শিল্পীর সন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে। ব্রিটিশ শাসনের উত্তাল পরিবেশ, পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্তি অভীপ্সায় এদেশবাসীর নিরন্তর সংগ্রাম, অতঃপর পাকিস্তানী রাজনীতির কালো অন্ধকার এবং পশ্চিম পাকিস্তানীদের ঔপনিবেশিক মানসিকতার

Dhaka University Institutional Repository

নৃশংস রূপ অঙ্কিত হয়েছে *এবং তিন মির্জা* গ্রন্থের গল্পগুলোতে। ইতিহাসের পটভূমিকায় ব্যক্তি ও সমষ্টিগত মানুষের রক্তাক্ত সংগ্রাম, অজস্র দুঃখভোগ, অভাবনীয় স্বার্থত্যাগ কিংবা আবেগ-আলোড়িত মুহূর্ত বিচিত্র আয়তনে রূপলাভ করেছে এ-গ্রন্থে।

শওকত ওসমানের 'তিন মির্জা' গল্পে ব্রিটিশ যুগে ঢাকায় সিপাহী বিদ্রোহের পটভূমিকায় মির্জা পরিবারের পরম্পরাগত ইতিহাসের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। বিপুল লাখেরাজ সম্পত্তির অধিকারী ছিলো মির্জা পরিবার। তারপর কালের চাকায় পিষ্ট হয়ে কে কোথায় ছিটকে পড়েছে। তবে বৃটিশ আমলে বাংলার রাজনীতিতে এই পরিবারের কারো কারো যে ভূমিকা, দেশাত্মবোধের সঙ্গেই ছিলো তার নিবিড় সম্পর্ক। ঊনিশ শতকে সিপাহী বিদ্রোহের পর 'একশ বারো বছর পরে' পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে তখন বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয়েছে।

লেখক ইতিহাসের এক বিশাল ক্যানভাসে ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ থেকে শুরু ক'রে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাকে তিনটি চরিত্রের নানা ঘটনাক্রমের মধ্য দিয়ে চিত্রিত করেছেন। ছোট ছোট বাক্যে সরল বর্ণনার মধ্য দিয়ে লেখক ইতিহাসের কালিক স্বরূপকে ফুটিয়ে তুলেছেন গল্পে। ইতিহাসের এক ধারাবাহিক ক্রম থেকে গল্পকার নির্বাচন করেছেন তিনটি চরিত্র– মির্জা হায়দার, মির্জা আলি আনোয়ার, মির্জা আলি আশরার। মির্জা হায়দার চরিত্রচিত্রণে গল্পকার কোনো সুস্থিত পরিণতিতে উপনীত হতে পারেননি। মির্জা হায়দারের চরিত্রাঙ্কনে গল্পকার প্রত্যক্ষ ঘটনা অপেক্ষা তার কিংবদন্তীতুল্য, রহস্যময় এবং প্রায়-অজ্ঞাত জীবনকেই মুখ্য করে তুলেছেন। গল্পের দ্বিতীয় চরিত্র মির্জা আলি আনোয়ার ছিলেন ম্যাজিস্ট্রেট এবং ইংরেজি-শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণীর প্রতিনিধি। ইংরেজদের ওপর মহলের সঙ্গে তার বিশেষ অন্তরঙ্গতা ছিল। "ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনের দাবানলে যখন এ উপমহাদেশে ব্রিটিশ মসনদ কেঁপে উঠেছিল, সে-সময় (১৯২৭/২৮) এক তরুণী তাঁর কাছে আসেন তার রাজবন্দি ভাইয়ের মুক্তির বিষয়ে সুপারিশের জন্য, কিন্তু মির্জা রূঢ় স্বরে তা করতে অস্বীকৃতি জানান। তরুণীটিও তাকে চড়া কণ্ঠে জানিয়েছিলেন– 'আপনি কি এদেশে জন্মাননি? দেশের সামান্য সেবা দিয়ে কী সারাজীবনের পাপ স্খলন করার চেষ্টা এতটুকু দেখাতে পারেন না?' এর অল্প দিনের ব্যবধানে তরুণীর ভাই আত্মহত্যা করলে মির্জা আনোয়ারের বোধোদয় ঘটে এবং শরীরে প্রবাহিত পূর্বপুরুষদের রক্ত তার দেশভাবনায় জেগে ওঠে।"[১০১] কারণ ম্যাজিস্ট্রেট মির্জার রূঢ়তার কারণেই মৃত্যু ঘটে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনকারী সেই যুবকের।

Dhaka University Institutional Repository

এ সময় থেকেই স্বদেশভাবনায় অনুপ্রাণিত হয়ে মির্জা আনোয়ার গোপনে রাজবন্দিদের সাহায্য করেন। লেখক জানাচ্ছেন:

> রাজবন্দির সাথে তিনি দেখা করতে যেতেন।...এক-দু ঘন্টা কেটে যেত রাজবন্দিদের সঙ্গে জেলের ভেতরে।...ব্যক্তিগত পর্যায়ে রাজবন্দিদের সঙ্গে যেন কতকালের আলাপ মির্জা সাহেবের।...বাড়ী ফিরে গিয়ে যখন জানতে পারেন যে তাদের পরিবারের কোন আর্থিক বিপর্যয় দেখা দেয় নি। কারণ, মাস-মাস অথবা ঈষৎ সময় ব্যবধানে তাদের আয়ের যোগান যথা-মজুদ ছিল এবং এই টাকা নাকি তার এক অচেনা হিতাকাঙ্ক্ষী পাঠিয়ে দিত অন্য একজন মারফৎ।...রাজবন্দির সন্দেহ গিয়েছিল মির্জা আনোয়ারের উপর।[১০২]

মির্জা পরিবারের আর এক সন্তান মির্জা আশ্‌রার তাঁর গেরিলা দল পরিচালনা কালে শত্রুর মেশিনগানের গুলিতে আহত হন। সঙ্গীদের তিনি তাঁর আহত দেহ ফেলে রেখে চলে যেতে বলেন। বুলেটবিদ্ধ মির্জা আশরার কখন মারা গেলেন সে কথা লেখক বলেননি। তবে মির্জা নিজে যে কথাটি বলেছিলেন :

> বন্ধুগণ তোমরা কেউ কেউ ভাবতে পারো, শত্রুর হাতে আমার লাশ পড়বে। তা পড়ুক। পরে পুঁতে দেবে মাটিতে। জননী বাংলাদেশের মাটির বুকে ঘুমাবো তার চেয়ে প্রশান্তিময় আর কী আছে দুনিয়ায়। কুইক মার্চ।[১০৩]

হয়তো তাঁর সেইবাক্যই মৃত্যুর অনিবার্য সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিয়েছিলো তখন।

বাংলাদেশের উপর পাকিস্তানীদের বর্বর হামলার বিরূদ্ধে বাঙালিদের যে মুক্তি সংগ্রাম গড়ে ওঠে এবং তাতে মির্জা আশ্‌রার মতো অগণিত দেশপ্রেমিকের দ্বিধাশূন্য আত্মদান ঘটে, সেই করুণ ইতিহাসের স্মৃতিচারণে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই আবেগের প্রকাশ হতে পারে।

১৯৭১-এর স্বাধীনতা সংগ্রাম বাঙালি জাতির সার্বিক মুক্তির আকাঙ্ক্ষার দ্যোতক। শওকত ওসমান মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক যে গল্প লিখেছেন, এগুলোর মধ্যে যে বক্তব্য রয়েছে, তাতে ফুটে উঠেছে বাঙালির উপর তৎকালীন জঙ্গি পাকিস্তানি শাসকদের বর্বরোচিত সামরিক অভিযানের নির্মম ইতিহাস। সে ইতিহাসে যুক্ত হয়েছে দেশের তখনকার রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে শওকত ওসমানের প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা। সে সময়ের বাংলাদেশ যেন এক অদ্ভুত নাড়ির বন্ধনে বাঁধা পড়ে লেখকের মননকে প্রসারিত করেছে সেই করুণ ইতিহাসের দিকে, তার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে লেখকের স্পর্শকাতর শিল্পীমন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গল্প রচনায় উদ্বুদ্ধ হয়।

Dhaka University Institutional Repository

শওকত ওসমানের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গল্পগুলো তথ্যগত দিক থেকে '৭১-এর সামরিক হামলার শিকার বাংলাদেশের ইতিহাসকে যেমন উজ্জ্বল রেখায় ধরে রেখেছে, শিল্পগত দিক থেকে তেমনি দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ বাঙালির আবেগকে মর্মান্তিক রূপ দিয়েছে। তখনকার ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে নির্মম বাস্তবতার ছবি অঙ্কন করেছেন লেখক এসব গল্পে। একদিকে তা হয়ে উঠেছে কথাশিল্প, অন্যদিকে তা যুগের কাহিনি।

একথা ঠিক যে যুগের জীবনজিজ্ঞাসা শওকত ওসমানের গল্পের নেপথ্যে একটি শক্তিশালী পরিপ্রেক্ষিত রচনা করে। জীবনকে তির্যকভাবে এবং নিকট-সান্নিধ্যে দেখবার ক্ষমতাই যে তার প্রকৃত উৎস তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

আশির দশকের শেষ পর্যায়ে প্রকাশিত *ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী* (১৯৯০) গ্রন্থে প্রথাগত অনুসৃতি সত্ত্বেও শওকত ওসমান আঙ্গিক নিরীক্ষায় শিল্পোত্তীর্ণ। 'কুটিলা ভবেৎ', 'শিবগঞ্জের মেলা', 'অনন্ত বাসর', 'ভুবন পাগলার সমস্যা', 'নিদয়-নিদয়া', 'কেন মৌন', 'স্বৈরিণী' প্রভৃতি গল্পে নাটকীয় ঘটনা-নির্ভর ঊনিশ শতকীয় শিল্পরীতি মুখ্য হয়ে উঠলেও নামশীর্ষক 'ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী' গল্পে শওকত ওসমান রূপকের জগতে প্রবেশ করেছেন। সামরিক দুঃশাসন কবলিত বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক বাস্তবতার অনুষঙ্গে 'ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী' এক রাজনৈতিক রূপকে পরিণত হয়েছে।

আলোচ্য গল্পে মুরারী চরিত্রের মাধ্যমে গল্পকার এদেশের সামরিক একনায়কদের প্রতিরূপ অঙ্কন করেছেন। ঈশ্বরের সর্বব্যাপী অস্তিত্ব ও জনপ্রিয়তায় ঈর্ষান্বিত হয়ে মুরারী নিজেই ঈশ্বর হবার দুর্জয় সাধনায় রত। আত্মম্ভরী মুরারী বলেছে :

> যদ্দুর পারা যায় আমি নিজেকে ছড়িয়ে দিচ্ছি। ঈশ্বরের সঙ্গে আমার প্রতিযোগিতা।[১০৪]

ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী হবার চেষ্টারত মুরারীর পরিণামে ভূমিপতন ঘটে। শওকত ওসমান ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় 'ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী' গল্পের সামাজিক ও রাজনৈতিক মনস্তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে সত্তর ও আশির দশকে বারবার রাষ্ট্রক্ষমতা কুক্ষিগত করেছে সামরিক জান্তারা। জনজীবনে নেমে এসেছে স্বৈরশাসন। সামরিক একনায়করা মুরারীর মতো নিজেদের ঈশ্বর প্রতীম কল্পনা করে। গল্পে মুরারীর সর্বব্যাপী ও সর্বশক্তিমান হবার উচ্চাভিলাষ ও ঔদ্ধত্যের মর্মন্তুদ পরাভব ঘটে। মুরারী চরিত্রের পতনটিও প্রতীকী মূল্যে প্রাতিস্বিক :

Dhaka University Institutional Repository

কোনো দাঁতাল শুয়োরের চারণ-ভূমিতে মুরারী অনধিকার প্রবেশ করতে গিয়েছিল। জন্তু তাকে আদৌ শ্রদ্ধা জানায়নি।[১০৫]

বাংলাদেশে নব্বইয়ের দশকে জনবিদ্বেষী গণবিরোধী সামরিক একনায়কত্ব মুরারীর ভাগ্যকেই বরণ করে নিতে বাধ্য হয়।

এ গ্রন্থের 'জনপদ' গল্পে ইংরেজ শাসনের বিরূদ্ধে স্বদেশী আন্দোলনরত জগদীশের মরণপণ লড়াইয়ের অভিজ্ঞতা নাটকীয় ঘটনাক্রমে বর্ণিত হয়েছে। গল্পের শেষ পর্যায়ে জগদীশের প্রাণরক্ষাকারী মাঝি সুবলের পুত্র সুধীরের সঙ্গে জগদীশের সাক্ষাৎ ও কথোপকথন নাট্যকৌশলে বিবৃত :

আপনি কোন জগদীশ পাক্‌ড়াশী?

"আমি সে-ই জগদীশ।"

সুধীর আগন্তুকের মুখের দিকে চেয়ে বিস্মিত কিন্তু কথা বন্ধ করেনা, "কিন্তু তিনি ত ১৯৪২ সনের মহাত্মা গান্ধীর ডাক দেওয়া আগষ্ট আন্দোলনে পুলিশের সাথে লড়াই করে স্বর্গীয় হয়েছেন।"

"স্বর্গীয় না নারকীয় হয়েছেন তা তোমরা জানো। আমি বেঁচে আছি।"

"মরার পর বেঁচে আছেন? তাহলে আপনি অন্য জগদীশ।"

"না, আমি সেই জগদীশ তোমার বাবার কাছে আমার ঋণ ছিল। তিনি আমাকে একবার খুব জোর বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন। নচেৎ ধরা পড়ে যেতাম।"

"আপনি কি সেই-ই জগদীশ যার কাহিনী এই এলাকায় এখনও চালু এবং যিনি আগষ্ট আন্দোলনে মারা গেছেন?"

"হ্যাঁ। তুমি কি জানো না, বৎস, যারা কাহিনী হয়ে যায় তাদের আর মরার ভয়ই থাকে না? ও কথা বাদ দাও। তোমার টোলের হার কী, শোনাও ত।"

টোল আদায়কারী রেট-কার্ড খুঁজতে দেরাজ খোলে। একটু সময় যায়। তারপর সে মুখ তুলে তাকায়। তার সামনে কেউ নেই। কক্ষে সে একা। শুধু বার বার একটা কথা তার কানে বার বার আছাড় খায়:

"যারা কাহিনী হয়ে যায়, তাদের মরার ভয়ই থাকে না।"[১০৬]

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নিয়ে লেখা হয়েছে *ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী* গ্রন্থের 'কেন মৌন' গল্পটি। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে অনেক পরিবারে আদর্শগত দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়েছিল। হয়তো দেখা গেছে পুত্র মুক্তিযোদ্ধা এবং পিতা পাকিস্তানি সমর্থক। সে সময়ের অনেক মুক্তিযোদ্ধা কেবল জন্মভূমির মুক্তির জন্য ঘনিষ্ঠজন যারা স্বাধীনতার বিপক্ষে তাদেরকেও শাস্তি দিতে কসুর করেনি। আলোচ্য গল্পে এক পাকিস্তান সমর্থক ব্যবসায়ী কি কারণে মুক্তিযোদ্ধা পুত্রকে সাহায্য করেছিলেন তার বিবরণ আছে। সফল ব্যবসায়ী মোবেদ মজুমদারের জীবনাচরণ তার পুত্রকন্যারা পছন্দ করে না। তিনি ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ মনেপ্রাণে মেনে নিতে পারেননি। পাকিস্তান ভাঙার

Dhaka University Institutional Repository

হোতাদের মনে মনে গালিগালাজও করেন। রাজনীতি না করলেও পার্টির চাঁদা দেন। এরূপ পরিবারের বড় ছেলে বিলেত গিয়ে আর দেশে ফিরল না। বড় মেয়ে স্বামীঘর ছেড়ে ছেলেমেয়েদের রেখে আমেরিকায় পাড়ি জমায় প্রেমিকের হাত ধরে। সবশেষে ইংরেজি অনার্স পড়ুয়া ছোট ছেলে বাড়ি থেকে পালিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়। শুধু তাই নয়, এক পুত্র জহির উদ্দীন যুদ্ধে যাবার আগে মানসিকভাবে পিতার কাছ থেকে দূরে সরে গিয়েছিল। কিছুদিন পর এক সহযোদ্ধাকে নিজের সংবাদ দেয়ার উদ্দেশ্যে বাবা-মায়ের কাছে পাঠায়। মুক্তিযোদ্ধা মারফত পুত্রের খবরাদি পেয়ে মোবেদ মজুমদার অপথ্য স্নেহের ভারে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন। তার হাতে দেয়ার জন্য মা নিয়ে আসেন গহনার বাক্স এবং মি. মজুমদার দেন অনেকগুলো টাকা। এভাবে পুত্রস্নেহের সুবাদে তাকেও সাহায্য করতে হয় মুক্তিযোদ্ধাদের। ছেলে-মেয়ে পিতার বিপরীত স্বভাব দেখে তার গৃহিণী মন্তব্য করে :

> ঘৃণা, ক্ষোভ চিরকাল চেপে রাখা অসম্ভব। অনেক মুর্খই তা জানে না।[১০৭]

আসলে মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে একই পরিবারের সদস্যদের ভিন্ন ভিন্ন অভিজ্ঞতা এবং মতাদর্শ যুক্ত হয়। ফলে কেউ হয় মুক্তিযোদ্ধা, কেউ হয় রাজাকার।

বাঙালির জাতীয় আন্দোলনের পূর্ণতা এসেছিল স্বাধীনতা যুদ্ধের মধ্য দিয়ে সার্বভৌম স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের মাধ্যমে। শওকত ওসমানের কথাসাহিত্যে সাতচল্লিশের বিভাগোত্তর কালের নানা আন্দোলন-সংক্ষুব্ধতা, সর্বোপরি মুক্তিযুদ্ধের নানা অনুষঙ্গ সার্থকভাবে ফুটে উঠেছে।

জন্ম যদি তব বঙ্গে এবং *ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী* গ্রন্থদ্বয় ইতিহাসের কাছে শওকত ওসমানের দায়বদ্ধতার সাক্ষ্য। কিন্তু এই ইতিহাস-নিষ্ঠা সত্ত্বেও শওকত ওসমান শিল্পাঙ্গিক প্রশ্নে সতর্ক ও কালসচেতন। স্বাধীনতা-উত্তর পর্বে শওকত ওসমান বক্তব্য বিন্যাসে শাণিত। মুক্তিযুদ্ধের গৌরবময় ইতিহাস রূপায়ণে তিনি আবেগধর্মী এবং সামরিক শাসনের ঘৃণ্য চেহারা উন্মোচনে আপোষহীন। তথাপি মুক্তিযুদ্ধের খণ্ড ঘটনা ও তার অভিব্যক্তি শওকত ওসমানের গল্প-উপন্যাসে যে সমস্ত দিকের নির্দেশনা দিয়েছে তা অপ্রতুল নয়। পরিপূর্ণ শিল্পকুশলতায় এগুলো যেমন উত্তীর্ণ, তেমনই অভিজ্ঞতা ও অন্তর্বাস্তবতায় সমৃদ্ধ।

১৯৭১ সালের বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ শওকত ওসমানের চিন্তা সাহিত্যকর্মে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। মানসিকভাবে পাকিস্তানকে মেনে না নেয়া এবং পাকিস্তানি শাসকদের বাঙালি পীড়নের জঘন্য মনোভাব তাঁকে বীতশ্রদ্ধ করে তুলেছিল। ফলে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে তিনি আরও সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। তাঁর

Dhaka University Institutional Repository

গল্প, উপন্যাস, নাটক ও প্রবন্ধে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও বাঙালির তৎকালীন জীবন সংগ্রামের নানা প্রসঙ্গ ধরা পড়েছে। তৎকালীন পাকিস্তানি স্বৈরশাসকের বাঙালি নিধন সাম্রাজ্যবাদেরই যে আরেক বিভৎসরূপ, সে বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ ছিলেন। তাঁর ভাষ্য :

> সাম্রাজ্যবাদের দেশী চেলা থাকে প্রত্যেক অনুন্নত দেশে। সুতরাং বিস্ময়ের কিছু নেই। এহিয়া খান এবং নিক্সনেরা সাম্রাজ্যবাদরূপী পিতার সমাজপুত্র।[১০৮]

দেশ-কালের পরিবর্তনের প্রক্রিয়াকে শওকত ওসমান নিরবচ্ছিন্নভাবে অনুধাবন করেছেন। নিজের দর্শন ও বিশ্বাসবোধের দীপ্তিতে সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি এমনকি ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গিকে নিরন্তর স্থাপন করে আপন শিল্পলোকের বিস্তৃতি ও সমৃদ্ধি সাধন করেছেন। এই কারণে আমরা বলব, শওকত ওসমান কেবল মুক্তবুদ্ধির চারিত্র্যকে নিজের মধ্যে আবিষ্ট করেননি, সর্বসাধ্য শিল্পীর দায়-দায়িত্ব নিয়ে দেশ, জাতি ও জাতীয়তার উন্মীলনে সংগ্রাম করেছেন।

ব্রিটিশ, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ– এই তিন কালপর্বে বিস্তৃত জীবনে শওকত ওসমান নিবিষ্টচিত্তে তাঁর সাহিত্য সাধনায় মগ্ন ছিলেন। প্রবহমান সময়ের সমান্তরালে তাঁর সাহিত্যের ভুবন সৃষ্টি হয়েছে। একদিকে ইতিহাস-সচেতন মন, অন্যদিকে বহমান ঘটনাস্রোত তাঁর ছোটগল্পের পটভূমিকে সমৃদ্ধ করেছে। কারণ তাঁর গল্পের পটভূমি জীবন-সমাজ ও সময়ের অন্তর্নিহিত চেতনায় সমৃদ্ধ। এজন্য তাঁর রচনাতে দুর্ভিক্ষ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ১৯৪৭ সালের বাংলাভাগ, ভাষা আন্দোলন, সামরিক শাসন, ১৯৭১ সালের গৌরবময় মুক্তিযুদ্ধ সার্থকভাবে চিত্রিত হয়েছে। তিনি তাঁর সাহিত্যের মাধ্যমে আধুনিক জীবনভাবনা, অসাম্প্রদায়িক চেতনা, শোষণমুক্ত সমাজের প্রত্যাশা করেছেন। স্বদেশের সংস্কৃতি, আর্থ-সামাজিক–রাজনৈতিক পরিবেশ সুস্পষ্টভাবে চিত্রিত হয়েছে তাঁর গল্পে। ব্রিটিশ কালপর্বে মূলত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা, ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন, ১৯৪৩ সালের মন্বন্তর, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, কুসংস্কারের প্রতি আঘাত সুস্পষ্টভাবে চিত্রিত হয়েছে। অন্যদিকে পাকিস্তান কালপর্বের গল্পে ১৯৪৭ সালের বাংলাভাগের প্রতিক্রিয়া, ভাষা আন্দোলন, সামরিক শাসন ব্যবস্থা, মুক্তি সংগ্রামের প্রস্তুতি, স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছেন। বাংলাদেশ কালপর্বে লেখক বাঙালি ও বাংলাদেশের ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ ঘটনা ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা পরবর্তী অস্থিরতা, সমাজ-রাষ্ট্র ভাবনার বিভিন্ন দিক গল্পে তুলে ধরেছেন। এ পর্বের অধিকাংশ গল্পের পটভূমি একাত্তরের ঐতিহাসিক মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিকায় বিন্যস্ত।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশেষে আমরা বলতে পারি, আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী শওকত ওসমানের গল্পে সুদীর্ঘ জীবন পথের বিভিন্ন সময়ে অর্জিত অভিজ্ঞতার চিত্র, সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশের বাস্তব সমস্যা সুদৃঢ়ভাবে বিন্যস্ত। তাঁর সাহিত্যিক মন আবর্তিত হয়েছে এদেশের প্রকৃতি, সমাজ, জীবন ও তার পরিপার্শ্বকে ঘিরে। প্রতিটি কালপর্বের সময়স্রোতের বৈশিষ্ট্যকে তিনি বিষয়ভাবনার মর্মমূলে স্থাপন করে সাহিত্য রচনায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। ফলে স্বদেশের সংস্কৃতি, আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবেশ সুস্পষ্টভাবে চিত্রিত হয়েছে তাঁর গল্পে।

তথ্যসূত্র

১. আতাউস সামাদ, 'দেশ, দেশ, সবার উপর দেশ'; *ব্যক্তি ও সাহিত্যিক শওকত ওসমান* (সম্পা. বুলবন ওসমান), দীপ্তি প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ৯৯।

২. আতাউস সামাদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৫।

৩. যতীন সরকার, 'ইতিহাস-চেতন শওকত ওসমান'; *নিসর্গ* (সম্পা. সরকার আশরাফ), বাণী প্রকাশনী, বগুড়া, ১৯৯১, পৃ. ১১।

৪. ড. মো. আব্দুর রশীদ, *শওকত ওসমানের ছোটগল্প : সমকাল, জীবনবৈচিত্র্য ও শিল্পরূপ*, দিকদর্শন প্রকাশনী লি., বাংলাবাজার, ঢাকা, ২০১৫, পৃ. ৩৩।

৫. হারুন-অর-রশিদ, বাংলাদেশ রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন, ১৭৫৭-২০০০, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ৭০-৭১।

৬. ড. মো. আব্দুর রশীদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১।

৭. রফিক উল্লাহ খান, *বাংলাদেশের উপন্যাস: বিষয় ও শিল্পরূপ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ১৪।

৮. ড. মো. আব্দুর রশীদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১।

৯. মো. হাননান, *বাঙালির ইতিহাস*, অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ৯৬।

১০. মো. হাননান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০১।

১১. মো. হাননান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০১।

Dhaka University Institutional Repository

১২. ড. মো. আব্দুর রশীদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩।

১৩. আনিসুজ্জামান, 'ফিরে দেখা: উনিশশো সাতচল্লিশ'; *দেশভাগ: স্মৃতি আর স্তব্ধতা* (সম্পা. সেমন্তী ঘোষ), গাঙচিল, কলকাতা, ২০১১, পৃ. ৩১।

১৪. কালিপদ বিশ্বাস, *যুক্ত বাংলার শেষ অধ্যায়*, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা, ২০১২, পৃ. ২-৩।

১৫. কালিপদ বিশ্বাস,পূর্বোক্ত, পৃ. ৫।

১৬. আনিসুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১-৩২।

১৭. সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), বাংলাদেশের ইতিহাস, ১৭০৪-০১৯৭১, ৩য় খণ্ড, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ১৮।

১৮. আনিসুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩।

১৯. যতীন সরকার, 'ইতিহাস-চেতন শওকত ওসমান', *নিসর্গ* (সম্পাদনা–সরকার আশরাফ), বাণী প্রকাশনী, বগুড়া, ১৯৯১, পৃ. ৮।

২০. আ. ন. ইয়াকলেভ এবং অন্যান্য, *রাজনীতির মূলকথা* (অনুদিত : ননী ভৌমিক), প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৭৫, পৃ. ৫।

২১. ড. মো. আব্দুর রশীদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৫।

২২. যতীন সরকার, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১২।

২৩. ড. মো. আব্দুর রশীদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৬।

২৪. রফিক উল্লাহ খান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩।

২৫. ড. মো. আব্দুর রশীদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৬।

২৬. শওকত ওসমান, *শওকত ওসমান গল্পসমগ্র*, (সম্পাদনা বুলবন ওসমান), সময় প্রকাশন, বাংলা বাজার, ঢাকা, ২০০৩, 'আলিম মুয়াজ্জিন' (*পিঁজরাপোল*), পৃ. ১২৬।

২৭. সানজিদা আকতার, *বাংলা ছোটগল্পে দেশবিভাগ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০২, পৃ. ১৩৭।

২৮. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'আলিম মুয়াজ্জিন', পৃ. ১২৮।

২৯. ড. মো. আব্দুর রশীদ, পূর্বোক্ত, পৃ.৭৯।

৩০. ড. মো. আব্দুর রশীদ, পূর্বোক্ত, পৃ.৭৯।

৩১. শওকত ওসমান, *বিগত কালের গল্প*, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃ. ৪৮।

৩২. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪।

Dhaka University Institutional Repository

৩৩. সানজিদা আকতার, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৬।

৩৪. সানজিদা আকতার, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১।

৩৫. ড. মো. আব্দুর রশীদ, পূর্বোক্ত, পৃ.৮৫।

৩৬. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, ২০০৩, পৃ. ১৮৭।

৩৭. অনীক মাহমুদ, *বাংলা কথাসাহিত্যে শওকত ওসমান*, ইউরেকা বুক এজেন্সী, রাজশাহী, ১৯৯৫, পৃ. ১২৮।

৩৮. ড. মো. আব্দুর রশীদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৭।

৩৯. ড. মো. আব্দুর রশীদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৭।

৪০. ড. মো. আব্দুর রশীদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৮।

৪১. জহির রায়হান, 'পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ'; *রক্তাক্ত বাংলা* (সম্পা. বিজলী প্রভা সাহা), মুক্তধারা, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ৫৯।

৪২. ড. মো. আব্দুর রশীদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৮।

৪৩. জহির রায়হান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৯।

৪৪. ড. মো. আব্দুর রশীদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৮।

৪৫. হারুন-অর-রশিদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৩-১৯৪।

৪৬. জহির রায়হান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৯।

৪৭. ড. মো. আব্দুর রশীদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৯।

৪৮. ড. মো. আব্দুর রশীদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫০।

৪৯. ড. মো. আব্দুর রশীদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫০।

৫০. ড. মো. আব্দুর রশীদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫১।

৫১. হারুন-অর-রশিদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৩-২৭৪।

৫২. হারুন-অর-রশিদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮০।

৫৩. অশ্রুকুমার সিকদার, 'ভাঙা বাঙলার সাহিত্য'; *দেশভাগ : স্মৃতি আর স্তব্ধতা* (সম্পা. সেমন্তী ঘোষ), গাঙচিল, কলকাতা, ২০০৯, পৃ. ১৯২।

৫৪. অনীক মাহমুদ, পূর্বোক্ত, ১৯৯৫, পৃ. ৪১।

Dhaka University Institutional Repository

৫৫. আবুল আজাদ, *নজরুল ইসলাম- শওকত ওসমান সমকাল-সংস্কৃতি*, রাইটার্স ফাউন্ডেশন-বাংলাদেশ, ঢাকা, ২০০০, পৃ.৭২।

৫৬. ড. মো. আব্দুর রশীদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৫।

৫৭. জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, 'শ্রদ্ধাঞ্জলী'; *শওকত ওসমান স্মারক গ্রন্থ* (সম্পা. সেলিনা বাহার জামান), বুলবুল পাবলিশিং হাউজ, ঢাকা, ২০০৪, পৃ. ১৪০।

৫৮. ড. মো. আব্দুর রশীদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৬।

৫৯. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, ২০০৩, পৃ. ১৫৮।

৬০. ড. মো. আব্দুর রশীদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৭।

৬১. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৪।

৬২. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৫।

৬৩. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, 'শওকত ওসমানের প্রভাব ও প্রস্তুতি'; *নিসর্গ* (সম্পা. সরকার আশরাফ), বাণী প্রকাশনী, বগুড়া, ১৯৯১, পৃ. ১০৮।

৬৪. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬৯।

৬৫. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭৪।

৬৬. সানজিদা আকতার, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১।

৬৭. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৯-২৬০।

৬৮. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪২।

৬৯. ড. মো. আব্দুর রশীদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮১।

৭০. চঞ্চল কুমার বোস, *বাংলাদেশের ছোটগল্পের শিল্পরূপ*, বাংলা একডেমি, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ১৩৩।

৭১. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৪।

৭২. বুলবন ওসমান, *কথা-সাহিত্যে শওকত ওসমান*, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৪, পৃ. ৬১।

৭৩. ড. মো. আব্দুর রশীদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৭।

৭৪. এ. এফ সালাউদ্দীন এবং অন্যান্য, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নানা প্রসঙ্গ*, মুক্তিযুদ্ধ গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ১৫।

৭৫. ড. মো. আব্দুর রশীদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৮।

৭৬. ড. মো. আব্দুর রশীদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৮।

Dhaka University Institutional Repository

৭৭. সৈয়দ আবুল মকসুদ, 'সহজিয়া কড়চা : সংসদীয় গণতন্ত্রের পক্ষ ও বিপক্ষ'; দৈনিক প্রথম আলো', ২৭ ডিসেম্বর ২০১১, ঢাকা, পৃ. ১২।

৭৮. হারুন-অর-রশিদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬।

৭৯. ড. মো. আব্দুর রশীদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬০।

৮০. ড. মো. আব্দুর রশীদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬১।

৮১. অনীক মাহমুদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬২।

৮২. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'জন্ম যদি তব বঙ্গে' (*জন্ম যদি তব বঙ্গে*), পৃ. ৫৯।

৮৩. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'আলোক-অন্বেষা'; পৃ. ৪৮৩।

৮৪. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'আলোক-অন্বেষা'; পৃ. ৪৮৩।

৮৫. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'আলোক-অন্বেষা'; পৃ. ২৭৫।

৮৬. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'ক্ষমাবতী', পৃ. ৫০৫।

৮৭. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'ক্ষমাবতী', পৃ. ৫০৬।

৮৮. শওকত ওসমান, *পূর্ণ স্বাধীনতা চূর্ণ স্বাধীনতা*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯০, পৃ. ৯০-৯১।

৮৯. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'জননী : জন্মভূমি', পৃ. ৫১৪।

৯০. অনীক মাহমুদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৪।

৯১. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'রক্ত চিহ্ন', পৃ. ৪৯৭-৪৯৮।

৯২. শওকত ওসমান, *জন্ম যদি তব বঙ্গে*, প্রথম সংখ্যা, ঢাকা, ১৯৭৫, 'বারুদের গন্ধ লোবানের ধোঁয়া', পৃ. ১২।

৯৩. শওকত ওসমান,পূর্বোক্ত, 'বারুদের গন্ধ লোবানের ধোঁয়া', পৃ. ৪৮৫।

৯৪. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'দুই ব্রিগেডিয়ার', পৃ. ৫০১।

৯৫. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'দুই ব্রিগেডিয়ার', পৃ. ৫০২।

৯৬. A.F.Salahuddin Ahmed, *The emergence of Bangladesh : Historical Background*, 'S.R.Chakravarty and Virendra Narain (ed), 'Bangladesh', South Asian Publishers, New Delhi, 1986, P. 143.

৯৭. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'ওয়াগন ব্রেকার', পৃ. ৫১৮।

৯৮. অনীক মাহমুদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৮।

Dhaka University Institutional Repository

৯৯. ড. মো. আব্দুর রশীদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮৯।

১০০. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'দস্যু-দারোগা-সংবাদ', (*পুরাতন খঞ্জর*), পৃ. ৬৩০।

১০১. ড. মো. আব্দুর রশীদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯১-২৯২।

১০২. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'তিন মির্জা', পৃ. ৫২৫।

১০৩. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'তিন মির্জা', পৃ. ৫২৮।

১০৪. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী', পৃ. ৬৩৭।

১০৫. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী', পৃ. ৬৩৯।

১০৬. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'জনপদে', পৃ. ৬৬৯।

১০৭. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'কেন মৌন', পৃ. ৬৮২।

১০৮. বিশ্বজিৎ ঘোষ, 'বাংলাদেশের উপন্যাস', 'সাহিত্য পত্রিকা', ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২৮শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, আষাঢ়-আশ্বিন, ১৩৯১, পৃ. ২৬।

তৃতীয় অধ্যায়

শওকত ওসমানের ছোটগল্পের আঙ্গিক

আধুনিক জীবনের যন্ত্রণা থেকে ছোটগল্পের সৃষ্টি ও বিকাশ। অসঙ্গত সমাজের সঙ্কট এবং সেই সমাজ-বিধৃত মানুষের নানা টানাপোড়েন আধুনিক ছোটগল্পের মুখ্য উপাদান হিসেবে গণ্য হয়। দেশ, কাল, সমাজ ও সমাজের গোষ্ঠিবদ্ধ জীবন-সাহিত্যের প্রত্যক্ষ উপকরণ হলেও তা নির্মাতার সৃষ্টি কৌশলে সমকালীনতার সীমা অতিক্রম করে চিরকালীন জগতে উত্তীর্ণ হয়। "প্রবহমাণ সময়কেই ধারণ করে শিল্প-সাহিত্য লাভ করে নতুন রূপাঙ্গিক এবং এর সাথে যুক্ত হয় লেখকের মানস প্রবণতা। এভাবেই লেখকের শিল্প মানস, স্বাতন্ত্রতার পরিচয় চিহ্নিত হয় এবং এ থেকেই একজন সাহিত্যিকের শিল্পকৌশল অপর সাহিত্যিক থেকে সহজেই পৃথক করা সম্ভব হয়। শওকত ওসমানের শিল্পকৌশলও প্রবহমাণ সময়-স্রোতের সাথে একাঙ্গিক হয়ে গড়ে উঠেছে।"[১] শিল্পসৃষ্টির প্রশ্নে ক্রমাগত নতুনতর বিষয় ও রীতিকে অনুসরণ করার প্রবণতা শওকত ওসমানের ছোটগল্পে লক্ষ করা যায়। চল্লিশের দশকের গ্রামীণ জীবন সংগঠন নিয়ে মূলত কাহিনি-প্রধান গল্পের যে ধারা সৃষ্টি হয়, শওকত ওসমান ছিলেন তার প্রধান পুরুষ। কিন্তু প্রথাগত বৃত্ত ভেঙ্গে যে কোন স্বতন্ত্র শিল্পরীতির সন্ধান যে কোন সৃজনশীল লেখকেরই মৌল ধর্ম। শওকত ওসমান এই শিল্পভাবনায় স্নাত। চোখে দেখা মানুষকে তিনি বহুকৌণিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

শওকত ওসমানের আর্থ-সামাজিক চিন্তার ব্যাপকতা পরিদৃষ্ট হয় তৎসৃষ্ট ছোটগল্পে। ঔপনিবেশিক সমাজ কাঠামোর অন্তরাল থেকে বাংলাদেশের আশির দশকের সমাজবীক্ষণের প্রচ্ছাপ পর্যন্ত তাঁর গল্পের পরতে পরতে ছড়িয়ে আছে। যদিও শওকত ওসমানের কথাসাহিত্য বিষয়বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ, তবুও বিষয় নির্বাচনে তাঁর বিশেষ প্রবণতা হল তিনি সমকালীন জীবন ও সমাজের বাইরে যেতে চাননি। এবং এই সমকাল সচেতনতা সাধারণ মানুষের জীবন ও কর্মের ব্যাপ্তিতে রেখায়িত। কাহিনি অনুযায়ী গল্পের আঙ্গিক হয়। গণজীবনবোধের দীপ্তিতে সমুজ্জল বিষয়কেই তিনি তাঁর গল্প-উপন্যাসের উপজীব্য হিসেবে প্রাধান্য দিয়েছেন। আর তাই বাস্তবতা বিবর্জিত সাহিত্য রচনা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। যেখানে সত্য প্রকাশে অসুবিধা ও বাধার সম্মুখীন হয়েছেন, সেখানে রূপক ও প্রতীকী অর্থে দেশ-কালের কথা বলে গল্পের আঙ্গিক রচনা করেছেন। একজন সমালোচক বলেছেন:

> সাধারণ মানুষের প্রতি আন্তরিক দরদ এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক ভন্ডামির ওপর দ্বিধাহীন কষাঘাত তাঁর গল্পের অনন্য সাধারণ বৈশিষ্ট্য।[২]

তাঁর গল্পে ক্ষুধা-অভাব-দারিদ্র্য-দুর্ভিক্ষ, শোষণ-বঞ্চনা, সামাজিক অবক্ষয়, অবরুদ্ধ শিক্ষার পরিবেশ, নারীনিগ্রহ ও নারীনির্যাতন, পারিবারিক জীবনের নানা অম্লমধুরতা, শ্রেণিচেতনা ও শ্রেণিসংগ্রাম এবং ধনতান্ত্রিক বিচ্ছিন্নতাবাদ আর্থ-সামাজিক চেতনা-নির্ভরতায় পরিস্ফুটিত।

ক্ষুধা-অভাব-দারিদ্র্য-দুর্ভিক্ষের অকৃত্রিম রূপকার শওকত ওসমান। *জননী* ও *বনী আদম*-এ বাঙ্গালির গ্রামীণ দারিদ্র্যের চিত্র আমরা দেখেছি। একই সঙ্গে গল্প রচনা করতে গিয়ে ঔপনিবেশিক আমলের দারিদ্র্য-পীড়িত মানুষের মৌলিক চাহিদার প্রসঙ্গটিকে তিনি পাশ কাটিয়ে যেতে পারেন নি। শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন:

> শওকতের সাহিত্য জীবন শুরু কবি ও রোমান্টিক গল্প লেখক হিসেবে। নিটোল রোমান্টিক গল্প 'পদ্মফুল'- এর শওকত ওসমান একদা অসাধারণ খ্যাতি অর্জন করেন। পরে ধীরে ধীরে এর মানসিকতায় রূপান্তর ঘটতে থাকে।[৩]

প্রবহমান সময়কে ধারণ করে লেখকের মানস প্রবণতা সমৃদ্ধ হয়ে শিল্প-সাহিত্য নতুন রূপাঙ্গিক লাভ করে। আর তাই একজন লেখকের শিল্পকৌশল অন্যজন থেকে ভিন্ন হয়। শওকত ওসমানের শিল্পকৌশলও প্রবহমান সময়-স্রোতের একাত্ম হয়ে গড়ে উঠেছে। তিনি গল্পের বিষয়-বিণ্যাসে যেমন ছিলেন নিরীক্ষাধর্মী,

Dhaka University Institutional Repository

তেমনি শৈলীবিচারে ছিলেন পরীক্ষাপ্রবণ। শওকত ওসমানের গল্পগুলোকে ব্রিটিশ কালপর্ব, পাকিস্তান কালপর্ব এবং বাংলাদেশ কালপর্ব- এই তিনভাগে ভাগ করা যায়। ব্রিটিশ কালপর্বের কয়েকটি গল্প চরিত্র প্রধান তবে অধিকাংশ গল্প ঘটনাপ্রধান। ব্রিটিশ কালপর্বের প্রথম দিকের গল্পে কাহিনী বর্ণনায়, চরিত্র সৃষ্টিতে, পরিচর্যারীতিতে ভিক্টোরীয় প্রকরণ-শৈলীকে ব্যবহার করলেও শেষ দিকের গল্পে রূপক-প্রতীক-সঙ্কেত ব্যবহার করেছেন। পাকিস্তান কালপর্বে অর্থাৎ পঞ্চাশ-ষাটের দশকের রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনের আতঙ্ক-শিহরিত রূপ শিল্পীর অর্ন্তদ্বন্দ্বের কারণ-যা শওকত ওসমানের গল্পে বিদ্যমান। এ পর্বের গল্পসমূহে দ্বন্দ্বজটিল জীবনের নানামাত্রিক আয়োজন প্রকাশিত যা গল্পের বিষয় বৈচিত্র্য এবং শিল্পকৌশলে প্রকাশিত হয়েছে। বাংলাদেশ কালপর্বের গল্পসমূহের বিষয় বৈচিত্র্য এবং শিল্পকৌশলে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ এবং তৎপরবর্তী ঘটনা প্রভাব বিস্তার করেছে। কারণ মুক্তিযুদ্ধের সফলতার মধ্য দিয়ে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ জন্ম লাভ করেছিল। রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে সাহিত্য তথা সাহিত্যিকদের দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তনের সুর ধ্বনিত হয়। এই সময় লেখকেরা ভিন্নতর প্রকরণ কৌশলে তাদের রচনা সমৃদ্ধ করেন।

১৯৪৭-১৯৫৭ কালপর্বে শওকত ওসমানের *পিঁজরাপোল* (১৯৫০), *জুনু আপা ও অন্যান্য গল্প* (১৯৫০), *সাবেক কাহিনী* (১৯৫৩) এবং *বিগত কালের গল্প* (১৯৮৭) প্রভৃতি গ্রন্থে মূলত গ্রামজীবন-আশ্রয়ী নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত মানুষের ইতিকথাই অঙ্কিত হয়েছে। ঘটনা, উপকরণ ও চরিত্র নির্বাচনে লেখক গ্রামীণ অভিজ্ঞতা-নির্ভর। "এ পর্বের অধিকাংশ গল্পের কাহিনী বিণ্যাস বর্ণনাত্মক এবং দীর্ঘ। এ পর্বে তিনি ছোটগল্পের আখ্যান রচনায়, ঘটনাবিণ্যাসে এবং ব্যঞ্জনাসৃষ্টিতে বর্ণনাধর্মী, ঘটনাধর্মী, প্রতীকী, নাট্যিক, কাব্যিক পরিচর্যা, আত্মজৈবনিক এবং ফ্ল্যাশব্যাক রীতির সার্থক প্রয়োগ করেছেন। এছাড়াও তিনি কিছু গল্পে স্মৃতিকে গল্পের কাহিনি বিণ্যাসে গুরুত্বের সাথে তুলে ধরেছেন।"[৪] শওকত ওসমানের ব্রিটিশ কালপর্বের রচনসমূহের শিল্পরীতির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে রফিকউল্লাহ খান উল্লেখ করেছেন:

> প্রথম পর্বের রচনাসমূহের বিষয় ও শিল্পরূপের বৈশিষ্ট্য সন্ধান করলে দেখা যাবে জীবনের সমগ্রতায় বিশ্বাস, সামন্ত জীবনমূল্যমান অতিক্রমের আন্তরিক প্রচেষ্টা, বুর্জোয়া জীবনচিন্তা-তথা স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ববোধে আস্থা, সামাজিক দায়িত্বচেতনা, ভিক্টোরীয় প্রকরণরীতি অনুসরণ-এবং-অবলোকনে এর প্রয়োগ শওকত ওসমানের জীবননীতি ও শিল্পরীতির বৈশিষ্ট্য।[৫]

এপর্বে কাহিনির দীর্ঘসূত্রিতা গল্পের একরৈখিকতাকে ব্যাহত না করলেও একঘেঁয়েমি তৈরি করে। ব্রিটিশ কালপর্বে রচিত *পিঁজরাপোল* (১৯৫১), *জুনু আপা ও অন্যান্য গল্প* (১৯৫১), *সাবেক কাহিনী* (১৯৫৩) *এবং বিগত কালের গল্প* (১৯৮৭) গ্রন্থের অধিকাংশ গল্প আয়তনগত বিচারে দীর্ঘ। "বর্ণনাত্মক এসব গল্পের

Dhaka University Institutional Repository

বিস্তার দীর্ঘ হলেও একটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর জীবনায়তন ও জীবনাবেগ রূপায়ণে এ জাতীয় কাহিনী-বিণ্যাস লেখকের প্রকরণ-সতর্কতার সাক্ষ্য বহন করে।[৬] এ জাতীয় গল্পগুলো ঘটনাপ্রধান নয়, কাহিনিপ্রধান। এরূপ বিশাল ক্যানভাসের গল্প পড়তে পাঠকের মনে একঘেয়েমি আসলেও গল্পকার শেষ পর্যন্ত গল্পের আকর্ষণ ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। যার কারণে বিপন্ন হয়নি গল্পের একমুখী বৈশিষ্ট্য। অর্থাৎ একটা জটিলতার আবহ গল্পকে অনিবার্যভাবে পরিণতির দিকে নিয়ে গেছে। এ গল্পগুলোর মধ্যে *পিঁজরাপোল* গল্প গ্রন্থের 'দাতব্য চিকিৎসালয়ের ইতিহাস', 'আলিম মুয়াজ্জিন', *জুনু আপা ও অন্যান্য গল্প* গ্রন্থের 'সাদা ইমারত', *সাবেক কাহিনী* গল্প গ্রন্থের 'মোজেজা', 'প্রতীক্ষা', 'বিবেক', *বিগতকালের গল্প* গ্রন্থের 'চুহা-চরিত', 'ব্যবধান' প্রভৃতি গল্প উল্লেখযোগ্য। "শওকত ওসমান এপর্বে সংক্ষিপ্ত পরিসরেও কিছু গল্প রচনা করেছেন। তবে, দীর্ঘ কাহিনিধর্মী গল্প রচনার পরে এ ধরণের গল্পরচনা গল্পকারের 'গ্রন্থিমোচন' হিসেবে কাজ করেছে বলে মনে হয়। তাছাড়া পরবর্তী কালপর্বের গল্পের অবয়বগত স্বল্পতা এ জাতীয় গল্পশরীরে থাকা অস্বাভাবিক নয়।"[৭] এ জাতীয় বৈশিষ্ট্য সমৃদ্ধ গল্পগুলোর মধ্যে 'কাঁথা', 'বকেয়া', 'দেনা', 'তুচ্ছ স্মৃতি' উল্লেখযোগ্য।

ব্রিটিশ কালপর্বের গল্পের মধ্যে শওকত ওসমান সার্থকভাবে দুর্ভিক্ষের প্রেক্ষাপট তুলে ধরেছেন। এ জাতীয় গল্পের শুরু এবং শেষটা গল্পকার আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করেছেন। যেমন– 'ভাগাড়' (সাবেক কাহিনী) গল্পের শুরুটা হয়েছে এভাবে:

> পশুবলি নরবলি আদিম মানুষের ত্রাস ও শঙ্কার আখ্যায়িকা। এবার-কার বকর-ঈদে মনসব আলির কোরবানী দেওয়ার নিয়ত এমনই ভয়প্রসূত, ভক্তি প্রসূত নয়।[৮]

এরপর মনসব আলির অতীত স্মৃতিমন্থন, দুর্ভিক্ষের চিত্র, কালো বাজারি, অভুক্ত মানুষের মাঝে মাংস বিতরণ এবং ভাতের অভাবে বিতরণকৃত মাংস ভাগাড়ে নিক্ষেপের মাধ্যমে মনসব আলির মনে অভুক্ত জনগণ কিভাবে ভীতির সঞ্চার করেছিল তা গল্পকার সার্থকভাবে উপস্থাপন করেছেন:

> আরো ভিড় জমে। শাণিত ব্যঙ্গভরা কৌতুহল দৃষ্টি চারিদিকে। ভয় পায় মনসব আলি।
> এত মানুষ কেন এক জায়গায় জমে?
> তহশীলদার তাকে ভিড়ের বাইরে টেনে আনলো।
> মাথার উপরে পাখনার শাঁই-শাঁই শব্দ আকাশে মুখ তুলে তাকায় মনসব আলি।
> বহু পাখনার শাঁই শাঁই শব্দ আরো একদল শকুন পড়ল ভাগাড়ে।[৯]

Dhaka University Institutional Repository

ছোট ছোট বাক্য ব্যবহারের মাধ্যমে নাটকীয় পরিবেশ সৃষ্টি করে কাহিনি বিণ্যাসে গতি সঞ্চার করেছেন– 'কাঁথা' (*পিঁজরাপোল*), 'হুকুম নড়ে না' (*সাবেক কাহিনী*) এবং 'চুহা-চরিত' (*বিগত কালের গল্প*) গল্পে। যেমন- 'কাঁথা' গল্পে নাটকীয়তা এসেছে বরু-বিবি কর্তৃক পুরনো কাঁথার মধ্যে একটি নতুন কাঁথা আবিষ্কারের মাধ্যমে। 'হুকুম নড়ে না' গল্পে মন্বন্তরকালে শহর থেকে কন্যাশিশু ক্রয়, আবার পরবর্তীকালে বিয়ের আসরে আজিম মল্লিকের পালিত কন্যা নূর জাহানের প্রকৃত পিতার নাম বলতে না পারায় নাটকীয়তার সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়াও 'চুহা-চরিত' গল্পে লেখক ইতর প্রাণিকে মানুষের সমান্তরালে ব্যবহার করে নাটকীয়তা সৃষ্টি করেছেন।"[১০]

শওকত ওসমান এ পর্বে কিছু সংখ্যক গল্পে স্মৃতিকে গল্প পরিচর্যায় ব্যবহার করেছেন। এ জাতীয় বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন গল্পের মধ্যে 'জুনু আপা' (*জুনু আপা ও অন্যান্য গল্প*), 'মো'জেজা' (*সাবেক কাহিনী*), 'দীর্ণ পত্র' (*সাবেক কাহিনী*), 'তুচ্ছ স্মৃতি' (*সাবেক কাহিনী*) অন্যতম। "এ গল্পগুলোর শুরুতেই গল্পকার বর্তমান সময়কে প্রাধান্য দিয়েছেন। কিন্তু লেখক গল্পকে এগিয়ে নিয়েছেন ফ্ল্যাশ ব্যাক রীতির মাধ্যমে, তবে সেখানে অনিবার্যভাবে স্থান করে নিয়েছে স্মৃতিময়তা।"[১১] 'জুনু আপা' (*জুনু আপা ও অন্যান্য গল্প*) গল্পে কাহিনি বিণ্যাসে লেখক ফ্ল্যাশ ব্যাক রীতির সার্থক প্রয়োগ করেছেন–

> ছেলে-বেলায় আমাদের অ অ আ ক খ শেখানোর ভার ছিল তার উপর। ধমক দিত না সে কাউকে, কিন্তু এমন চালে কথা বলত, আমরা ভয়ে চুপ বসে থাকতাম। আবার হাসির পালা শুরু হোলো, কেউ পাল্লা দিতে পারত না জুনু-আপার সঙ্গে। শুধু হাসি নয়, পরিবেশ-রচনার কৌশলও ছিল তার অপরূপ।[১২]

শওকত ওসমান সমকালীন তথ্যের ভিত্তিতে গল্পের কাহিনি বিণ্যাস করেছেন সার্থকভাবে। বিগত কালের গল্প গ্রন্থের 'চুহা-চরিত' গল্পে মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসপন্থী রাজনৈতিক নেতাদের চরিত্র উন্মোচণে – চল্লিশের দশকের দাঙ্গা-হাঙ্গামা, ১৯৪৩ সালের মন্বন্তর এবং বাংলাভাগের চিত্র উপস্থাপন করেছেন:

> দাঙ্গা চলিতে লাগিল। শান্তি কমিটি গজাইতে লাগিল। অনেক লোক চিচিং ফাঁক হইয়া গেল। চিচিং ফাঁক, চিচিং ফাঁক রবে এক শুভ প্রভাতে ব্রিটিশের বুটের ধাক্কায় স্বাধীনতার দরজা খুলিয়া গেল। পনরই আগস্ট ১৯৪৭।[১৩]

যদিও 'চুহা-চরিত' গল্পটি লেখকের ব্যঙ্গাত্মক কৌশলে নির্মিত, তবুও এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়– ১৯৪৩ সালের মন্বন্তর, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং বাংলাভাগের মত উল্লেখযোগ্য বিষয়ের যথাযথ উপস্থাপন করেছেন এ গল্পে ব্যঙ্গ রচনার একটি প্রধান উদ্দেশ্য ব্যক্তি-রাষ্ট্র-সমাজকে সমালোচনার মাধ্যমে শোধন করা। "ব্যঙ্গ রচনা মানুষকে হাসালেও এর অন্ত:স্রোতে প্রবাহিত হয় বিবেকের তাপদাহ, যার আগুনে পুড়ে ব্যক্তি-

Dhaka University Institutional Repository

রাষ্ট্র-সমাজ শুদ্ধতার পথে ধাবিত হয়।"[১৪] 'চুহা-চরিত' গল্পের নামকরণের মাধ্যমেই গল্পকার ব্যঙ্গ রসের ছোঁয়া এনেছেন। 'চুহা-চরিত' শব্দের অর্থ ইঁদুরের জীবনকথা বা মূষিকের জীবনকথা। গল্পে দেখা যায়, মুসলিম লীগের অফিস কক্ষে একটি চুহা অর্থাৎ মূষিক এবং কংগ্রেস-এর রাজনৈতিক অফিস কক্ষে অপর চুহা আশ্রয় নিয়েছে। দুই রাজনৈতিক দলের অফিস কক্ষে অবস্থান নিয়ে মূষিকদ্বয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মিথ্যাচার প্রত্যক্ষ করে এবং আরও প্রত্যক্ষ করে নিজেদের স্বার্থে তারা এক ও অভিন্ন রাজনৈতিক আদর্শে বিশ্বাসী। অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন দলের নেতারা ভিন্ন ভিন্ন বক্তব্য উপস্থাপন করলেও তারা ছিলেন স্ব-গোত্রীয় এবং তারা প্রজাহিতৈষী ছিলেন না– যা উক্ত গল্পে মূষিকদ্বয়ের বক্তব্যের মাধ্যমে লেখক স্পষ্ট করেছেন:

> দুই সহোদরের দুই মনিব গলাগলি করিয়া দন্ডায়মাণ। ঘরে চেয়ারে বসিয়া একে অপরের সিগারেট জ্বালাইয়া দিল।[১৫]

মুসলিম লীগ নেতার স্বার্থবাদী চরিত্র তার স্ত্রীর বক্তব্যে প্রকাশ পায়– "বিবি। ইসলাম কইয়্যা তো মিটিং ফাডাও, পোলাপানে পাডাও আংরেজের স্কুলে। হ বুঝছি তোমার মুখ আর কথা-এক না।"[১৬] এছাড়া শুধু গল্পকারের বর্ণনায় নয়, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের আচরণ, কথোপকথন এবং তাদের ব্যবহৃত পোশাক-পরিচ্ছেদের মধ্যেও গল্পে হাস্যরসের সৃষ্টি হয়েছে। গল্পের ভাষায়:

> আমার মনিব অহিংসার ভক্ত। তবে মাছ-মাংসে অরুচি নেই।...মনিবের কণ্ঠস্বর ফেনাইয়া উঠিল। ইংরাজী-বাংলা মিশাইয়া পূর্ব্ব-পশ্চিম এক হইয়া গেল। কিপলিং নরক হইতে বোধ হয় চিৎকার করিতে লাগিল। মনিব চিৎকার দিয়া গলা ফাটাইলেন। "উই আর মুসলমান-পৃথিবী জয় করবে।"[১৭]

মুলত এ গল্পে হাস্যরসের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়েছে সমকালীন রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের বিভিন্ন দিক।

পিঁজরাপোল, জুনু আপা ও অন্যান্য গল্প, সাবেক কাহিনী এবং *বিগত কালের গল্প* গ্রন্থে তাঁর বহুব্রজ জীবনদৃষ্টি ও শিল্পচৈতন্যের প্রকাশ ঘটেছে। আলোচ্য গ্রন্থের গল্পসমূহে মুলত গ্রামীণ সমাজমূলস্পর্শী নিম্ন ও মধ্যবিত্ত মানুষই মূখ্য হয়ে উঠেছে। "গ্রামীণ জীবনের পটভূমিকায় রচিত এ পর্যায়ের গল্পে ঘটনাগত দ্বন্দ্ব, সংঘাতই প্রধানত চিত্রিত হয়েছে। লেখকের সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ-আশ্রয়ী এবং ঘটনা-নির্ভর গল্পসমূহ বিধৃত হয়েছে সরল বর্ণনায়।"[১৮] ভিক্টোরীয় যুগের কথাসাহিত্যে শিল্প-প্রকরণের ক্ষেত্রে যে রীতির ব্যবহার লক্ষ করা যায়, চল্লিশের ও পঞ্চাশের দশকে বাংলা কথাসাহিত্যে সে শিল্পরীতিই অনুসৃত হয়েছে। চরিত্রকে সহানুভূতির আলোকে আদর্শায়িত করা এবং বিশ্লেষণাত্মক পরিচর্যারীতি বর্জন করা ভিক্টোরীয় শিল্পরীতির অন্যতম লক্ষণ।

Dhaka University Institutional Repository

চরিত্রায়ণরীতির ক্ষেত্রে শওকত ওসমান ভিক্টোরীয় শিল্পাদর্শের অনুকার। *পিঁজরাপোল* গ্রন্থের 'থুতু', 'ইলেম', 'দাতব্য চিকিৎসালয়ের ইতিহাস', *জুনু আপা ও অন্যান্য গল্প* গ্রন্থের 'জুনু আপা', 'নতুন জন্ম' প্রভৃতি গল্পের "চরিত্রগুচ্ছ আদর্শায়িত, তত্ত্বাশ্রয়ী, কখনো বা নৈতিক আবেগে প্রাণিত। আদর্শিক অনুভব এবং বাস্তবতার মিশ্র ব্যঞ্জনায় গল্পের চরিত্রগুলো সমাজ মানসেরই প্রতীক হয়ে উঠেছে।"[১৯]

'থুতু' (*পিঁজরাপোল*) গল্পের ফাদার জোহানেস এবং ভৃত্য মনসুর চরিত্র দুটি প্রতীককল্প। শুভ ও অশুভ, কল্যাণ ও অকল্যাণের বিপ্রতীপ মানসিকতা রূপ লাভ করেছে চরিত্র দুটিতে। মানবতার সেবক ফাদার জোহানেসের সংযম, ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও ঔদার্য তার ব্রত ও আদর্শের সঙ্গে সুসঙ্গত। এমনকি গৃহভৃত্য মনসুর যখন ফাদারের খাবারে যক্ষ্মার জীবানুযুক্ত থুতু মিশিয়ে দেয়, তখনও ফাদার জোহানেসের ধৈর্য্য ও মানবিক উদারতা ক্ষুন্ন হয় না। মনসুর চরিত্র সৃজনে লেখকের শৈল্পিক সমগ্রতাবোধ ও অসাধারণ শিল্পসংযমের প্রকাশ ঘটেছে। মনসুর চরিত্রটি নির্মিত হয়েছে জীবনের সমগ্রতাবোধে। লেখক গল্পে দেখিয়েছেন মনসুরের গোপন চৈতন্যে জাগ্রত রয়েছে দারিদ্র্য ও বঞ্চিতের অন্তর্যন্ত্রণা। ফাদার জোহানেসের খাবারে থুতু মিশানোর কারণ হিসেবে মনসুর বলেছে:

> মেরা বহেন কো আপনে দেখা। বেগায়ের খানা মেরা দেশকা বহুৎ আদমী---মেরা মা।[২০]

মনসুর-যে শৈশবাবধি অশুভ কল্যাণ ও বিনাশের প্রতীক হয়ে উঠেছে তার নিহিত কারণ অপচয়ী সমাজের বিরূদ্ধে তার তীব্র ঘৃণা।

পিঁজরাপোল গল্পগ্রন্থের 'দাতব্য চিকিৎসালয়ের ইতিহাস' গল্পের ডেপুটি মুস্তাফিজ চরিত্র আদর্শায়িত এবং নৈতিক চেতনাতাড়িত। মুস্তাফিজ চরিত্র চিত্রণে লেখক দীর্ঘ বর্ণনার আশ্রয় নিয়েছেন। চোরাচালান প্রতিরোধ করে নিরন্ন জনগোষ্ঠিকে মুস্তাফিজ করাল মৃত্যুর ছোবল থেকে বাঁচাতে চায়, শুধু তাই নয়– কলেরা আক্রান্ত মানুষকে রক্ষার জন্য একটি হাসপাতাল তৈরির স্বপ্নও দেখে সে। ভাগ্যবিড়ম্বিত মানুষের দৈন্যদশায় আলোড়িত মুস্তাফিজের মনোভাবনা এ কারণে আবেগময় বিশ্লেষণী রূপ লাভ করেছে।

> নদীর পাড় ছেড়ে মাইল দূরেই কত না গ্রাম রয়েছে, আর রয়েছে গ্রামের সরল অবোধ মানুষ। কিছুই জানে না তারা। তাদের অসহায় অজ্ঞতার সুযোগে ফসল দেশ-দেশান্তরে যায়। মুষ্টি অন্ন তাদের নিকট পৌঁছায় না। তবু অসন্তোষের আগুন দাউ দাউ জ্বলে উঠে না কেন? মুস্তাফিজ কি সন্তুষ্ট হোতো সেই দাবানল জ্বললে? ডেপুটি সে। সরকারের প্রতিনিধি। আগুন যদি জ্বলবে, তবে তার প্রতিনিধিত্বের কি প্রয়োজন আছে? খামাখা তো সরকার তার মাইনা গোনে না। আনমোনা মুস্তাফিজ তার চিন্তার জট খোলে।[২১]

Dhaka University Institutional Repository

মুস্তাফিজ চরিত্রের চিন্তা ও কর্মের মধ্যে যে অগ্রগতি রয়েছে– "তা ফুটিয়ে তুলতে গল্পকার কখনও সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণাশ্রয়ী, আবার কখনও চরিত্রের প্রেক্ষণবিন্দু ব্যবহার করেছেন। এছাড়া পেশাগত দায়িত্বসচেতনতা, মানবিক স্বার্থচিন্তা এবং বাস্তবতার সংমিশ্রণে ডেপুটি মুস্তাফিজ চরিত্রের সৃষ্টি।"[২২] এ সম্পর্কে চঞ্চল বোস বলেছেন:

> ডেপুটির আদর্শিক আবেগ চিত্রণে লেখক পৌনঃপুনিক বর্ণনার আশ্রয় নিয়েছেন। চরিত্রটি আবেগাশ্রয়ী এবং সমগ্র গল্পে তার ভাবপ্রবণ প্রেক্ষণবিন্দু ব্যবহার করা হয়েছে।[২৩]

গল্পের অন্তিম পর্যায়ে ডেপুটি মুস্তাফিজের প্রগাঢ় আশাবাদী চেতনা ভিক্টোরীয় শিল্পাদর্শেরই অনুরূপ। গল্পকারের ভাষায়:

> মুস্তাফিজ অনুভব করে, তার চারপাশে শুধু মানুষ। তাকে ঘিরে উল্লাস-ধ্বনি করে-তাদের মুঠি অন্ন নেই মুখে, পরিচ্ছন্ন নেই রৌদ্রবৃষ্টিস্নাত দেহে; তবু তাদের পর্বতগ্রাসী প্রাণ-বন্যার শক্তি অপরিসীম যার ঢেউ পৃথিবীর গলিত কুষ্ঠ-রূপ নিশ্চিহ্নে মুছে দেবে একদিন।[২৪]

ভিক্টোরীয় শিল্পরীতিতে চরিত্র নির্মাণের একটি কৌশল হল– অধ্যাত্মবাদ, বিশ্বাস এবং নৈতিকতাকে আশ্রয় করে চরিত্র নির্মাণ করা– যা শওকত ওসমানের *বিগত কালের গল্প* গ্রন্থের 'শেখজী' গল্পে বিদ্যমান। শেখজী চরিত্রে গল্পকারের জীবনবোধের আদর্শরূপের সাথে ব্যক্তিগত বিশ্বাসের ছায়াপাত ঘটেছে– যা শেখজীর ভাবনা-চিন্তায় প্রকাশিত:

> তবে, মানুষগুলো ভাল। মনুষত্ব আছে ওদের। বেকায়দায় পড়ে অনেক খারাপ কাজ করে, কিন্তুঈমান আছে ওদের। এদের ধুলো-কাদা মাখা ছেলেগুলো যদি মানুষ করা যেত ঠিকমত। দুনিয়ার রং ফিরে যেত।[২৫]

বাংলাভাগ পূর্ববর্তী বা ব্রিটিশ কালপর্বের গল্পগুলোতে গ্রামজীবন নির্ভর চরিত্রের প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। সমাজের নিচু তলার এবং মধ্যবিত্ত মানুষের জীবনচিত্র অঙ্কনে শওকত ওসমানের নিবিষ্টতা প্রতিভাসিত হয়। লেখক এপর্বে "সমাজের মাত্রা ও ব্যক্তি মাত্রাকে তিনি অভিন্ন বোধের কেন্দ্রে স্থাপন করতে সমর্থ হয়েছেন।"[২৬] এ পর্বের গল্পগুলোর অধিকাংশ চরিত্র গ্রামীণ নিম্নবিত্ত এবং নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতিনিধি। স্বাভাবিক আবেগধর্মিতা এবং দারিদ্র্যের কষাঘাতে গল্পের চরিত্রগুলো পর্যুদস্ত। চরিত্রগুলোর অবস্থান নাগরিকতার বা আধুনিকতার ছোঁয়া থেকে বেশ দূরে। তাছাড়া চরিত্রের অর্ন্তজটিলতা অপেক্ষা বাহ্য সঙ্কট, স্বপ্ন আকাঙ্ক্ষাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। কিছু গল্পে গল্পকার পাশাপাশি বিপরীতধর্মী চরিত্র সৃজনে তৎপর ছিলেন। যেমন : *পিঁজরাপোল* গল্পগ্রন্থের 'থুতু' গল্পের ফাদার জোহানেস এবং মনসুর, 'পিঁজরাপোল' গল্পের মারুমিয়া

Dhaka University Institutional Repository

এবং বাসেদ, 'দাতব্য চিকিৎসালয়ের ইতিহাস' গল্পের ডেপুটি মোস্তাফিজ এবং জোতদার পুলিন সাহা-এ সকল চরিত্র নির্মাণে গল্পকারের মূল অভীপ্সা ছিল জীবনচেতনার অনুষঙ্গে ব্যক্তি ও সমাজের বিপ্রতীপ অবস্থানকে চিহ্নিত করার মাধ্যমে শ্রেণি অবস্থানকে সুস্পষ্ট রূপদান করা।

'থুতু' গল্পের মনসুর, 'পিঁজরাপোল' গল্পের বাসেদ চরিত্র দুটিতে একই সাথে আদর্শবাদ এবং প্রতিবাদী রূপটি লক্ষ করা যায়। শৈশব থেকে দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত মনসুর বঞ্চিতের অর্ন্তযন্ত্রণা থেকে মুক্তির উপায় হিসেবে তার মনিব ফাদার জোহানেসের খাবারে জীবাণু মেশায়। অন্যদিকে আবাল্য দারিদ্র্যপিষ্ট বাসেদও মনসুরের অনুরূপ কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত গরুর দুধ পান করিয়ে শোষক শ্রেণিকে ধ্বংস করতে চেয়েছে।

ব্রিটিশ কালপর্বে শওকত ওসমান উল্লেখযোগ্য কিছু নারী চরিত্র নির্মাণ করেছেন। "পিতৃতান্ত্রিক সমাজগহ্বরে বন্দী নারী অস্তিত্বের ক্রন্দন ও অর্ন্তগত রক্তপাত উন্মোচনে শওকত ওসমানের শিল্পীর নিরাসক্তি ও জীবনাসক্তি বিস্ময়কর।"[২৭] *জুনু আপা ও অন্যান্য গল্প* গ্রন্থের 'জুনু আপা' গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র রূপায়ণে গল্পকার উত্তম পুরুষ এবং চরিত্রের দৃষ্টিকোণ ব্যবহার করেছেন। জুনু আপার অন্তর্জগতের চিত্র অপেক্ষা বাহ্যিক পরিবেশ নির্মাণে লেখকের তৎপরতা দেখা যায়। পঞ্চাশোর্ধ মালেক সাহেবকে বিয়ে করে সুখের বাসর রচনার আকাঙ্ক্ষা এবং ধর্মীয় মূল্যবোধ জুনু আপা চরিত্রের অর্ন্তদহনের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে:

> অনেক জায়গায় আশ্রয় ছেড়ে এখানেই রয়ে গেলাম চিরজন্মের মতো। শুধু দয়ার বন্ধনের জন্য।... খোদার কাছে মুখ দেখাতে হবে, তাই আত্মহন্ত্রীর সাথেই নিজের জীবনকে বেঁধেছি। আর কি উপায় আছে?[২৮]

'জুনু আপা' গল্পের জুনু চরিত্র নির্মাণে শওকত ওসমানের অপরিণত শিল্পশক্তির প্রকাশ ঘটেছে। ঘটনা ও আচরণের স্বাভাবিক প্রবণতায় এ চরিত্র গড়ে উঠেছে বলে মনে হয় না। জুনুআপা মূলত ঘটনাচালিত এবং লেখকের মনোভাবতাড়িত।

জুনুর সঙ্গে তাঁর চাচাতো ভাই জসিমের প্রেম পারিবারিক বাধায় সাফল্য লাভ করেনি। পাড়াগাঁয়ের এই স্বতঃস্ফূর্ত মেয়েটির জীবন তাতে ব্যর্থ হয়ে যায়। সে আশ্রয় নেয় পঞ্চাশোর্ধ মালেক সাহেবের এক নির্বান্ধব পুরীতে। পরে মালেক সাহেবই তাকে বিয়ে করে। এর আগে অবশ্য আর একবার বিয়ে হয়েছিলো তার, কিন্তু সে বিয়ে টেকে নি। জুনুর জীবনের এত সব ঘটনার সাক্ষী তার এক ছোট ভাই, যার জবানিতে গল্পের কাহিনি বিবৃত হয়েছে। হয়তো প্রথম দিকের গল্প বলেই এর কাহিনির প্রতিটি পদক্ষেপে লেখকের কষ্টকল্পনা হোঁচট খেয়ে চলতে চলতে এমন এক ভাববিলাসের রাজ্যে অবস্থান নেয় যার সমাপ্তির বিষয়টি

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যযুগীয় গাঁথা সাহিত্যের কথাকেই স্মরণ করিয়ে দেয়, যা কোনক্রমেই আধুনিক শিল্পের মানদণ্ডে পরীক্ষোত্তীর্ণ নয়। এই রোমাণ্টিক গল্পটিতে লেখকের পূর্বসুরীদের প্রেমের গল্পের প্রভাব পড়েছে। আবার পাঠকের মনে করুণ রস সৃষ্টির চেষ্টাও লেখকের মধ্যে প্রতক্ষ্য করা যায় :

> নির্ব্বাসিতের জীবন জুনু-আপার। এই জানালায় দাঁড়িয়ে জুনু আপা হয়ত কত চোখের পানী ফেলে। কেউ সাক্ষী থাকে না তার। বন্ধ্যা, ধূসর মরু জীবন। অথচ এই জীবনে কত কিছু না বিকাশের সম্ভাবনা ছিল। প্রাণদায়িনী সঙ্গিনী, পুত্র-বৎসল জননী, স্নেহ-উৎসধারিনী ভগিনী, সেবা-পরায়ণা রমণী। সব মুছে গেল। সংসারের সামগ্রিক ক্ষতি কেউ উপলব্ধি করে না। মানুষের চেতনায় তার ছায়া পড়ে না।[২৯]

'কাঁথা' গল্পে বরুবিবি চরিত্র নির্মাণে গল্পকার সার্থকতার পরিচয় দিয়েছেন। বরুবিবির সহজাত রসিকতা, সন্তানবাৎসল্য-দারিদ্র্যপীড়িত সংসারে খাদ্য ও বস্ত্রসংকটের মধ্যেও প্রাণাবেগ সঞ্চার করেছে। নারীর অসীম ধৈর্য, শতকষ্ট-যন্ত্রণার সহিষ্ণুতার প্রতীক হিসেবে বরুবিবি চরিত্রটি উজ্জ্বল। অন্যদিকে *বিগত কালের গল্প* গ্রন্থের 'ব্যবধান' গল্পে বিধবা নুরী বিবির চরিত্রাঙ্কনের মাধ্যমে একজন নারীর বেদনাময়-অবমাননাকর প্রতিচ্ছবি তুলে ধরেছেন। নিঃসন্তান ননদকে নিজ পুত্র রাসেদীকে পোষ্য-পুত্র হিসেবে দান করার মধ্যে নুরী বিবির চারিত্রিক দৃঢ়তা যেমন প্রকাশিত, তেমনি পরবর্তীকালে সন্তানকে কোনভাবে সাহায্য করতে না পারার ব্যর্থতাজনিত মাতৃহৃদয়ের হাহাকার গল্পে উপস্থাপিত। বিরূপ সময় ও সমাজবন্দি নর-নারীর অন্তর্জাগতিক জটিলতা চিত্রণে গল্পকার বিশ্লেষণাত্মক পরিচর্যার আশ্রয় নিয়েছেন। যেমন :

> কয়েদীর মতো সময় সময় খাবার দিয়ে যায়। হাত-খরচা বলে দুটো পয়সাও দেয় না। ছেলেগুলোকে যেন ভাড়া করে রেখেছে দুই বউ।[৩০]

এ দেশীয় সমাজ-ব্যবস্থায় নারীমনের চাওয়া-পাওয়া, আশা-আকাঙ্ক্ষা চিরদিনই উপেক্ষিত থেকেছে তা গল্পকার নুরীবিবি চরিত্র সৃষ্টির মাধ্যমে তুলে ধরেছেন।

আঞ্চলিক ভাষার বা উপভাষার বিশিষ্ট প্রয়োগ এ পর্বের গল্পগুলোকে যেমন বিশিষ্টতা দান করেছে, তেমনি চরিত্রগুলোকে দিয়েছে পৃথক মহিমা। ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের ভাষা ব্যবহারে বিভিন্ন চরিত্র একটি বিশেষ অঞ্চলের বা বিশেষ পেশার প্রতিনিধিত্বশীল চরিত্র হিসেবে গল্পে আত্মপ্রকাশ করেছে। এ জাতীয় চরিত্র নির্মাণে আঞ্চলিক ভাষাই চরিত্রের নিয়ন্ত্রণ শক্তি বা চালিকা শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। যেমন 'নতুন জন্ম' (*জুনু আপা ও অন্যান্য গল্প*) গল্পের ফরাজ আলির সংলাপ বা বক্তব্যের মাধ্যমে লেখক তার পেশা এবং অঞ্চলকে চিত্রিত করেছেন। যেমন:

Dhaka University Institutional Repository

ফরাজ আলির মুখ বন্ধ হয় না : "দুলা বাইয়ের লগে মসকরা করতাছস? আঁই মরদ। বুজ্ছনি হালী? মহাজনের কেরায়া নাউ, নইলে দ্যাহাইতাম হালী নাউ চালান কারে কয়।"[৩১]

এ ধরনের বৈশিষ্ট্যে বিচার্য চরিত্রের মধ্যে 'থুতু' (*পিঁজরাপোল*) গল্পের মনসুর, 'ইলেম' (*পিঁজরাপোল*) গল্পের জহির মিয়া, 'কাঁথা' (*পিঁজরাপোল*) গল্পে বরুবিবি ও লতিফ উল্লেখযোগ্য।

'নতুন জন্ম' গল্পের ফরাজ আলি চরিত্রের অন্তর্ময় প্রকৃতি-প্রতিক্রিয়ার উন্মোচনে লেখক আঞ্চলিক ভাষার সার্থক ব্যবহার করেছেন। বস্তুত আঞ্চলিক ভাষার অনবদ্য ব্যবহার শওকত ওসমানের চরিত্রায়ণরীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ফরাজের ভিটেমাটি এবং তার জ্যেষ্ঠ সহোদরের প্রাণহরণকারী রাক্ষুসী গোমতীর প্রতি ফরাজ তাই অকপটে ব্যবহার করে অশালীন উক্তি –

হালীরে কৈ, হালী – আঁর কি আছে। ক্ষেইপ্যা উঠস্, ক্ষেইপ্যা ওঠ। যা' হালী বাঁধ ভাইঙ্যা কুমিল্লা শহরৎ – ওহানে বড় বড় সাব আছে – পীরিত মজাসে করতা পারবি। সাব মটোর চড়াইবো, শরাব পিলাইবো যা, হালী যা' – ওহানে ইমারত মিল্বো – পাতার ঘরে আসস্ ক্যা – হালী হুন্ল কৈ[৩২]

গল্পকার শওকত ওসমান এখানে বাংলাদেশের নদী এবং মানুষের মধ্যে নিবিড় সম্পর্কের একটি অনবদ্য চিত্রকল্প তৈরি করেছেন, গোমতী আসলে যে প্রকৃতি-কন্যা, এই চিত্রকল্প পাঠককে সে কথা ভুলিয়ে দেয়। বিমুগ্ধ পাঠক গোমতীর শারীরিক উপস্থিতি লক্ষ করে বাংলাদেশের নদীর অন্য একরূপ প্রত্যক্ষ করে, সেই রূপ চিরন্ততার মাহাত্ম্য-ব্যঞ্জক।

পঞ্চাশের দশকে প্রকাশিত *সাবেক কাহিনী* গ্রন্থে জীবন নির্বাচনে ও চরিত্র সন্ধানে লেখক গ্রামীন সমাজ-আশ্রয়ী। প্রথাগত আঙ্গিক ও আয়তন-অনুসারী এ-গ্রন্থের গল্পসমূহে ঘটনাশাসিত বহির্জীবনই সরল ফ্লাট বর্ণনায় উপস্থাপিত হয়েছে। শওকত ওসমানের মানবজীবনভিক্ষা, সমাজ পর্যবেক্ষণশক্তি ও তীক্ষ্ণ জাগ্রত চৈতন্যে *সাবেক কাহিনী*-এর চরিত্রগুচ্ছ বিকশিত। 'মোজেজা' গল্পে জেলা বোর্ডের সদস্য পদপ্রার্থী মুস্তফা খান এবং কেবলা পীর চরিত্রচিত্রনে লেখকের তীব্র শ্লেষ ও বাস্তবতাবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। ভোট পাওয়ার কৌশল হিসেবে মুস্তফা নিজের পোশাক ও অবয়বে অভাবিত পরিবর্তন আনে। লেখকের শাণিত শ্লেষ লক্ষণীয়:

আমার বিরুদ্ধ পক্ষ ত আমাকে ঘায়েল করে দিয়েছে। ওরা বলে মিয়ার বয়স চল্লিশ, মিয়ার দাড়ির বয়স ছ'মাস।[৩৩]

Dhaka University Institutional Repository

কেবলা পীর চরিত্রাঙ্কনে লেখকের শিল্পদৃষ্টির সূক্ষ্মতা ও লোকচরিত্রজ্ঞান উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

উত্তম পুরুষের জবানীতে লেখক গল্পের কাহিনী বিবৃত করেছেন। তাঁর বন্ধু ইলেকশনে দাঁড়িয়েছে। ভোট-সংগ্রহে ব্যস্ত। এদিকে বেশি ভোট পেতে হলে হুজুর কেবলা অর্থাৎ পীর সাহেবের সুপারিশ প্রয়োজন। বন্ধু হয়তো তার জন্যে আগে থেকেই একটা বোঝাপড়া করে নিয়েছে।

পরদিন লেখকের কেবলা-দর্শন হয়। ইনি নাকি বন্যার জলের উপর দিয়ে মাইলের পর মাইল হেঁটে পার হয়ে যান। এক বিন্দু পানিও তার পবিত্র খড়মকে স্পর্শ করতে পারে না। শেষ পর্যন্ত লেখক এই পীর কেবলার পরিচয় পান। এক যুগ আগে তাঁদের গ্রামে শতচ্ছিন্ন লুঙ্গি পরিহিত এক যুবক এস উপস্থিত হয়। মক্তবের মৌলবী সাব তাকে দয়াপরবশ হয়ে কোরান তালিম দেন। জহুর তখন একজন ইলেমদার হয়ে বহু অলৌকিক কেরামতি লাভ করে। জিব্রাইল একদিন স্বয়ং তাকে দেখা দিয়েছে বলে প্রচার করে। অতঃপর এই সিদ্ধ পুরুষের কাছে আতুর, পীড়াগ্রস্ত, জীবন-বিতৃষ্ণ, ব্যর্থকাম ও বঞ্চিত মানুষের ঢল নামে। গ্রাম যেন তীর্থে পরিণত হলো। শত টাকার নোট ছুড়ে মারা হয়। তহবন আর সুন্দর তসরের পাঞ্জাবী পরা ওলিউল্লাহ জহুর সাহেব তখন, –

> আর কক্ষের বাহির হন না। মৌলবী সাহেবের মক্তব বন্ধ। তিনিই এখন জহুরের সাগরেদ বনিয়াছেন। উস্তাদের গুণ আছে।[৩৪]

তারপর একদিন দেখা গেল, –

> জহুর সাহেব গায়েব। কোথায় গায়েব হইলেন? নানা রকম জবাব। কেউ স্বচক্ষে দেখিয়াছে তিনি সোনার উড়োজাহাজে আকাশে উড়িয়া গেলেন। তার পাখার আওয়াজ নাই। কেউ দেখিয়াছে সোনার সিঁড়ি। তিনি উঠিতে উঠিতে ধীরে ক্রমশঃ মেঘলোকে বিলীন হইয়া গেলেন।[৩৫]

এবং আরো অনেক দিন পরে লেখকের কাছে প্রমাণিত হলো সেই 'জহুর সাহেব'ই এখন হুজুর সাহেব হয়েছেন এবং তিনি আজকাল এই ভিন্ দেশে এসে আস্তানা গেড়ে বন্ধুটির মতো বহুজনকে নিয়ে বেশ আড়ম্বরের সঙ্গে মুরিদানের ব্যবসা ফেঁদেছেন। যা হোক –

> আমার সাচ্চা মুরীদান আপনাদের মতই আমার পেয়ারা। পীর-ভাইয়ের ইজ্জত আপনারা রক্ষা করিবেন বলিয়া আমি আশা করি।[৩৬]

Dhaka University Institutional Repository

পীর সাহেবের এই সুপারিশ যোগাড় করে বন্ধুটি অতঃপর বিজয়ের আনন্দে ভোট-কেন্দ্রের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়।

সূক্ষ্মপর্যবেক্ষণশীল গল্পকার শওকত ওসমান শানিত শ্লেষ এবং বাস্তবতাবোধের সমন্বয়ে ধর্মব্যবসা ও রাজনীতি ব্যবসার চিত্র– মুস্তাফা খান ও মৌলবী জহুর মিয়া চরিত্রের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন। লেখক সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণের ব্যবহারে চরিত্র দু'টি তুলে ধরেছেন:

> বন্ধুর মুখে দেখিলাম ফরাসী-ছাটাই এক গুচ্ছ শ্মশ্রু। সে-দিকে আঙ্গুল বাড়াইয়া বলিলাম, ওগুলো কী ভোটের আগে আবাদ করেছ?
>
> বন্ধু জবাব দেওয়ার আগে একচোট হাসিয়া লইলেন।
>
> -শোনো। কি করা যায়। ভোট সংগ্রহের মতো ন্যাষ্টি জিনিস আর নেই। করতে হোলো বাধ্য হোয়ে।[৩৭]

মৌলবী জহুর মিয়া চরিত্রটি সাধারণ মানুষের দৃষ্টিকোণ থেকে বিকশিত হয়েছে। এ সম্পর্কে চঞ্চল কুমার বোস বলেন:

> হঠাৎ করে জহুর পাগলার ওপর জিব্রাইলের ভর এবং রাতারাতি তার ওলিউল্লাহ্য় রূপান্তর গ্রামীণ সমাজ-মানসিকতারই প্রতিফলন। শওকত ওসমান পীর চরিত্র-চিত্রণে ব্যবহার করেছেন অশিক্ষিত, ধর্মভীরু, অজ্ঞ গ্রামীণ মানুষের সরল ধর্মবিশ্বাসকে।[৩৮]

সমাজ এবং ব্যক্তিস্বার্থে ধর্মকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে মুস্তাফা খান এবং মৌলবী জহুর মিয়া চরিত্র অঙ্কনে গল্পকার সার্থক। অপরদিকে 'দাতব্য চিকিৎসালয়ের ইতিহাস' (*পিঁজরাপোল*) গল্পের জলিল তরফদার, 'ভাগাড়' (*সাবেক কাহিনী*) গল্পের মনসব আলি চরিত্র চিত্রণে গল্পকার জোতদার এবং শোষক শ্রেণির প্রতিনিধি হিসেবে তাদের অমানবিক রূপটি অঙ্কন করেছেন। শওকত ওসমান মনসব আলি চরিত্রের মনোজগতের চিত্রায়ন করেছেন:

> গ্রামে এলে মনে পড়ে তার কুইনাইন গুদামের কাহিনি। এক পাউণ্ড কুইনাইন সে পাঁচ শ ছ'শ টাকায় বেচেছে। শুধু কুইনাইন? চাল, আটা, চিনি কত রকমের ব্যবসা তার গঞ্জে, শহরে। টাকা লুটেছে সে হাজার, লাখ। লুটের মরশুম আরো কিছুদিন থাকলে হয়ত সে ভয়ের হাঙ্গামা চুকে যেত।...দশ খানা গাঁয়ে সেইত একমাত্র মাথা।[৩৯]

তবে, "দুর্ভিক্ষকেন্দ্রিক রচিত গল্পে দুর্ভিক্ষের শিকার চরিত্রের বা প্রান্তিক শ্রেণি চরিত্রের নাম পাওয়া যায় না। হয়ত মন্বন্তরপীড়িত-ছিন্নমূল মানুষগুলোকে নামহীন রেখে তাদের উন্মুলিত হওয়ার বিষয়কেই লেখক প্রাধান্য দিয়েছেন।"[৪০] 'দাতব্য চিকিৎসালয়ের ইতিহাস' (*পিঁজরাপোল*), 'ভাগাড়' (*সাবেক কাহিনী*), 'চুহা-

Dhaka University Institutional Repository

চরিত' (*বিগত কালের গল্প*) প্রভৃতি গল্পে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। এসব গল্পের চরিত্রগুলোকে গল্পকার– 'বিরাট', 'অগণিত', 'অসংখ্য', 'হাজার হাজার', 'বহু' প্রভৃতি শব্দের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। মুলত এসব শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে গল্পকার সমষ্টির দুর্ভোগকে প্রাধান্য দিয়েছেন। গল্পকারের ভাষায়:

> বিরাট মিছিল এগিয়ে আসছে। মানুষের মিছিল? না, মানুষ নয়। নরাকার মানুষের ভগ্নাংশেরা শোভাযাত্রা করে এগিয়ে চলছে। বিকলাঙ্গ, ভগ্নস্বাস্থ্য পাঁজর-নির্গত গ্রামের মানুষ।[৪১]

'চুহা-চরিত' (*বিগত কালের গল্প*) গল্পের চরিত্র চিত্রণে শওকত ওসমান চুহাকে (ইঁদুর বা মূষিক) চরিত্রের মর্যাদা দিয়ে চিত্তাকর্ষকভাবে গল্পের কাহিনি বর্ণনা করেছেন। এ সম্পর্কে নারায়ন গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন:

> শিক্ষা ও আনন্দ এই যুক্তবেণীতেই মানুষের গল্পরচনা আরম্ভ। নীতিগল্পের জন্যে সে প্রধানত আশ্রয় করেছে জীবজন্তুর রূপককে: আর আনন্দের প্রয়োজনে এসেছে রাক্ষস-খোক্কস, অত্যাচারী, বন্য হিংস্র জন্তু অথবা জিঘাংসু সরীসৃপের শত্রুতা, শঠতা ও প্রতিবন্ধকতাকে জয় করে সুখ সৌভাগ্য লাভের কাহিনি।[৪২]

চরিত্র হিসেবে পশু-পাখির ব্যবহার সুদূর জাতক কাহিনি থেকে। এ সম্পর্কে নারায়ন গঙ্গোপাধ্যায় আরও বলেছেন:

> সমস্ত গল্পের জন্মভূমি ভারতবর্ষ। জাতক, পঞ্চতন্ত্র, বৃহত কথা, দশকুমার চরিতের গৌরবিনী জননী। এইখান থেকে কীভাবে গল্পকথা পৃথিবীতে বিচ্ছুরিত হয়ে পড়েছিল, তার প্রামাণ্য ইতিবৃত্ত বর্ণনা করে গেছেন ম্যাকসমূলার থেকে আরম্ভ করে রবিনসন পর্যন্ত বহু বিশ্রুতকীর্তি পণ্ডিত।[৪৩]

তবে, "আলোচ্য গল্পে শওকত ওসমান মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসপন্থী দুটি চুহা-চরিত্র সৃষ্টি করেছেন কোন আদর্শ প্রচারের জন্য নয়– বরং এ দুটি চরিত্রসৃষ্টি ও তাদের দৃষ্টিকোণ ব্যবহার করে গল্পকার মুসলিম লীগ, কংগ্রেস নেতাদের নীতিহীন-রাজনীতি ও মানবিকতা বিবর্জিত ক্রিয়াকর্ম, ১৯৪৩ এর মন্বন্তর, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং বাংলাভাগের আসন্ন ভাঙনকেই উজ্জ্বল রেখায় ফুটিয়ে তুলেছেন। গল্পকার মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস-এর লেবাসি এবং স্বার্থবাদী মুখোশ উন্মোচনে চুহাদ্বয়কে যেভাবে চিত্রিত করেছেন তা অবশ্যই প্রশংসার যোগ্য।"[৪৪] গল্পকারের ভাষায়:

> গান্ধীজী নেংটি পরে। তার তুলনায় এরাতো পোকা-মাকড়। সুতরাং ন্যাংটো থাকা উচিত।[৪৫]

Dhaka University Institutional Repository

শওকত ওসমানের ঘটনান্যিাস ও চরিত্র-পরিকল্পনায় প্রকৃতির প্রবর্তনা ব্যাপক নয়, নাগরিক পরিপ্রেক্ষিতে নির্মিত চরিত্রসমূহে প্রকৃতির নিগূঢ় সংবেদনা ক্রিয়াশীল নয়। গ্রামীণ পটভূমিকায় নির্মিত কাহিনি ও চরিত্রসমগ্রে প্রকৃতির উপস্থিতি সীমিত হলেও তা বৃহত্তর আবেদন নিয়ে উজ্জ্বল। ঘটনাবিন্যাসের আবশ্যিক প্রয়োজনে প্রকৃতি কখনোবা পটভূমি হিসাবে উপস্থাপিত হয়েছে। কখনোবা চরিত্রের অন্তর্ময় জটিলতা ও মনোভাব চিত্রণে প্রকৃতির চিত্র ব্যবহৃত হয়েছে। *সাবেক কাহিনী* গ্রন্থের 'বকেয়া' গল্পে প্রকৃতির ব্যবহার ঘটেছে পটভূমিকা হিসাবে। 'বকেয়া' গল্পে পাঁচু চরিত্রের বিপন্ন সময় ও পরিস্থিতি চিত্রণে লেখক প্রকৃতির যে পরিপ্রেক্ষিত উপস্থাপন করেছেন তা' চিত্রময় ও সঙ্কেতধর্মী। নিরন্ন গৃহে জ্বরে মুমূর্ষু তিন বছরের মেয়ে টুনি প্রতিক্ষারত; তাকে দেখার জন্য পাঁচুকে শীঘ্র ঘরে ফিরতে হবে। পাঁচু চরিত্রের এই প্রান্তিক মুহূর্তে হিংস্র বর্ষা-প্রকৃতির রূপ চেতনাময় চিত্রধর্মী :

> আষাঢ়ের আকাশ এতক্ষণ নীরব ছিল। আবার বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি নামিল। নদীর ধারে মাটি খুব নরম, একটু চাপে ধ্বসিয়া যাইবে, তাই খুব সন্তর্পণে পা বাড়াইতে হয়। দ্রুত হাঁটারও পথ বন্ধ। আর নদীর পথ সমান নয়। কোথাও ঢালু, কোথাও পথ নদীগর্ভে সমাহিত---সেখানে বন-বাদাড় ভাঙ্গিয়া পথ করিয়া লইতে হয়। বর্ষাকালে এই অঞ্চলে সাপের জুলুম বাড়ে। পাঁচুর সে-সব ভয় নাই। সে খুব দ্রুত পা চালাইতেছিল। বাবলা বনের কাঁটা ভরা সারি, শিয়ালকুলের গহন, খালখোন্দলের দুর্গম সড়ক, বহু সহস্র যোজন তার সম্মুখে। ...এইখানে নদীপথ অল্প চওড়া, স্রোতের গতি মন্থর। তখনও বৃষ্টি পড়িতেছিল। বৃষ্টির জল ও ঘাস দুই-ই পাঁচুর শরীরে মিশিয়া গিয়াছে। পরিশ্রান্তি তার বড় কম হয় নাই। কিন্তু পাঁচুর নিজের দিকে কোনো লক্ষ ছিল না। সে শুধু বাড়ী পোঁছাইতে চায় মাত্র।[৪৬]

কিন্তু *পিঁজরাপোল*, *জুনু আপা ও অন্যান্য গল্প*, *সাবেক কাহিনী* প্রভৃতি গ্রন্থে চরিত্র সৃজনে কখনো কখনো গল্পকারের অসংযম চরিত্রের বিকাশ ও পরিণতিকে ব্যাহত করেছে। নৈর্ব্যক্তিকতা পরিহার করে গল্পকার আত্মকথন প্রয়াসী হলে চরিত্রের সংহতি ও ব্যঞ্জনা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। *সাবেক কাহিনী* গ্রন্থের 'সে কিরুপে স্বর্গে গেল' গল্পে আবেদালি চরিত্রটি ত্রুটিমুক্ত নয়। দুই প্রহর রাতে নিঃস্ব আবেদালি মারা যায় এবং তার স্ত্রী কুলসুমের একটি শাড়ি দিয়ে তার কাফনের ব্যবস্থা হয়। আবেদালির এই মর্মন্তুদ পরিণাম রূপায়ণে গল্পকারের শৈল্পিক নিরাশক্তি সংযমের শৃঙ্খল অতিক্রম করেছে এবং উচ্চকিত হয়ে উঠেছে তাঁর ব্যক্তিক ভাষ্য ও আবেগ :

> আবেদালি জানিত না, পৃথিবীতে আসার সময় সকলে উলঙ্গ হইয়া আসে। বাবা আদমও এমনই আসিয়া ছিলেন। বেহেশতের লেবাস তখন খুলিয়া পড়িয়াছিল। এখন বেহেশতে যাওয়ার সময় খুলিয়া পড়ুক না, দুনিয়ার লেবাস। তাতে কি আসে যায়। দিনেও মরিতে পারিত আবেদালি। এমন দূরদৃষ্টির অযথা প্রয়োগ প্রয়োজন ছিল না।[৪৭]

Dhaka University Institutional Repository

অন্যদিকে 'প্রতীক্ষা' গল্পে বাকেরের মৃত্যুকে অমোঘ ও অবশ্যম্ভাবী করে তোলার লক্ষ্যে গল্পকারের স্বপ্ন-বর্ণনা অতিনাটকীয় বা মেলোড্রামাধর্মী :

> বাকের স্বপ্ন দেখে: কে যেন তাহার দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সফেদ লেবাস, পরনে তহমন, পিরহান, মাথায় সাদা পাগড়ী, মুখ-ছাওয়া সাদা দাড়ি। হাতে তার লাল তসবীহ। মুখে মধুর-মধুর হাসি। বাকের কদমবুছী করিতেছে। লোবানের খোশবু, সুরেলা এলহানে কো'রান মজিদের সূরাহ পাঠ শোনা যায়।[৪৮]

শওকত ওসমান ছিলেন জীবনের সত্যাদর্শী রূপকার। সময় ও দেশকালের রূপান্তরশীল অনুষঙ্গে তাঁর শিল্পভাবনারও হয়েছে বিবর্তন। এ সম্পর্কে সৈয়দ আলী আহসান বলেছেন:

> সে (শওকত ওসমান) লিখত সাধারণ মানুষের কথা। গ্রামীন যে দুর্দশার মধ্যে সে বড় হয়ে উঠেছে সেই দুর্দশার পটভূমিতে সাধারণ মানুষকে সে দেখতে চাইতো। এদর মধ্যে কৃষক ছিল, জননী ছিল, জমিদার ছিল, মাঝি ছিল, মহাজন ছিল এবং বারবনিতাও ছিল। সকলকেই সে মানুষ হিসেবে আবিস্কার করার চেষ্টা পেয়েছে।[৪৯]

'পিঁজরাপোল' গল্পে মহারাজা গান্দ্রেরীরামের পিজরাপোল প্রতিষ্ঠার প্রতি লেখকের তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ লক্ষ করা যায়। একটি সাদা গাভীর মৃত্যুতে মহারাজা শোকাচ্ছন্ন হয়ে প্রতিষ্ঠা করেন পিঁজরাপোল-পশুর রোগ-ক্লেশ নিবারনী প্রতিষ্ঠান। এখানে নাইট উপাধিধারী আসাদ আলীর গাভি থাকে মশারির মধ্যে অথচ কর্মরত শ্রমিকদের কোন মশারি দেয়া হয় না। এজন্য গল্পের নায়ক বাসেদ প্রতিবাদ করে বলে :

> তুমি চুপ করো বড় মিয়া। গা-ঢাকা আধাঁর হোলে আমি মশারি খুলে আনব। ভোর বেলা আবার দিয়ে আসব। আমাদের মশা খায়, গাই-গরু মশারির ভেতর। শালাদের জামাই না জরু।[৫০]

শোষক চরিত্রের ভন্ডামি ও মুখোশ উন্মোচনের চিত্র ফুটে উঠেছে এই 'পিঁজরাপোল' গল্পে।

'কাঁথা' গল্পে গ্রামীণ নিম্নবিত্তের বহুসমস্যার, দুঃখ-কষ্টের মর্মস্পর্শী চিত্র ফুটে উঠেছে। অভাবের সংসারে সামান্য শীতবস্ত্র কিংবা কাঁথা-বালিশ জোটান কি যে সমস্যা তা ভুক্তভোগীরাই জানেন। তাই গল্পের নায়ক লতিফের স্ত্রী বরু বিবি আক্ষেপ করে বলে :

> মানুর তরে খুইল্ছিলাম। ওর কাঁথা বানামু। শক্ত ছিল কাপড়খান্। নিজের কামে লাগাইলাম। একডা পুলা। হেও থলি গায়ে দি'রাত কাটায়। আমারে মা কও।[৫১]

Dhaka University Institutional Repository

জুনু আপা ও অন্যান্য গল্প গ্রন্থে 'জুনু আপা', 'নতুন জন্ম' প্রভৃতি গল্পের চরিত্রগুচ্ছ আদর্শায়িত তত্ত্বাশ্রয়ী, কখনো বা নৈতিক আবেগে প্রাণিত। আদর্শিক অনুভব এবং বাস্তবতার মিশ্র ব্যঞ্জণায় গল্পের চরিত্রগুলো সমাজ-মানসেরই প্রতীক হয়ে উঠেছে। এ গ্রন্থে গ্রাম-নদীর পটভূমিকায় নর-নারীর সুখ-দুঃখ, প্রেম-বিচ্ছেদ, সঙ্কট-সংঘাত এবং তাদের প্রাতিস্বিক অস্তিত্ব সংগ্রামের গৌরবময় জীবনাভিজ্ঞতা শিল্পস্বরূপ লাভ করেছে।

কোনো "চরিত্রের বিশেষ মানস-পরিস্থিতির উন্মোচনে কিংবা আসন্ন কোন ঘটনার আভাস নির্মাণে প্রকৃতি-আশ্রয়ী পটভূমির ব্যবহার চল্লিশ-পঞ্চাশ দশকের গল্পে প্রথার মতো গৃহীত হয়েছে। এ জাতীয় পটভূমির-পরিপ্রেক্ষিতের ব্যবহার কখনো কখনো গল্পে এনেছে শ্রাব্যকল্পময়তা, চিত্রধর্ম। রেখায়িত প্রকৃতির উপস্থাপনা কাহিনিতে চরিত্রপ্রতিম হয়েছে।"[৫২] শওকত ওসমানও তাঁর গল্পে প্রকৃতিকে চরিত্র বিকাশের সহায়ক হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। তিনি 'ব্যবধান' (*বিগত কালের গল্প*) গল্পে রাসেদীর অন্তর্বেদনাকে তুলে ধরতে গিয়ে প্রকৃতির ব্যবহার করেছেন। যেমন :

> রাসেদী দহ্লিজের মধ্যে একটি কার্পেটের উপর শুইয়া পড়িল। ক্ষুধা-ক্লান্ত শরীরে ঘুমের তীব্রতাও বেশি। দহ্লিজের আলো এককোণে মিটমিট করিয়া আলোক বিতরণ করিতেছিল।[৫৩]

নিঃসন্দেহে বলা যায়– "নিরীক্ষাধর্মী পরিব্রাজকের দৃষ্টি দিয়ে শওকত ওসমান মানবজীবন ও সমাজ-চৈতন্যের নানা প্রান্তকে উন্মোচন করার প্রয়াসী। সময়, সমাজ ও ইতিহাসের নিবিড় শুশ্রূষায় তাঁর গল্পের জীবন বিমিশ্র। জীবনের বিচিত্র কল্লোল ও কোলাহলে তাঁর গল্পের মানুষেরা উচ্চকিত। ... গ্রামীণ সমাজমূলস্পর্শী মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত মানুষ তাঁর গল্পে মখ্য হয়ে উঠেছে। লেখকের গভীর জীবনবোধে চরিত্রগুলো হৃদয়স্পর্শী। বাঙালি জীবনের একান্ত অনুষঙ্গে তাঁর সৃষ্ট মানুষেরা মুখরিত।"[৫৪] ব্রিটিশ কালপর্বে শওকত ওসমান বিভিন্নমুখী চরিত্র সৃষ্টির মাধ্যমে বিভিন্ন ঘটনা, পরিবেশ পরিস্থিতি এবং সমাজ ব্যবস্থার নানা অনুষঙ্গ আমাদের সামনে সার্থকভাবে উপস্থাপন করেছেন।

সমকালীন সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ঘটনাপ্রবাহ একটি বিশেষকালের শিল্পকে স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট করে তোলে– যা একজন লেখকের শিল্পদৃষ্টির মাধ্যমে প্রকাম পায়। "ব্রিটিশ কালপর্বের গল্পে লেখক বিভিন্ন ধরণের দৃষ্টিকোণ ব্যবহারের মাধ্যমে ঘটনা-চরিত্রের অন্তর্বাস্তবতা অপেক্ষা বহির্বাস্তবতা অঙ্কনে বেশি তৎপর ছিলেন।"[৫৫] ছোটগল্পের শিল্পরীতির গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো দৃষ্টিকোণ। কারণ ব্যক্তির অস্তিত্ব-আকাঙ্ক্ষা রূপায়ণের জন্য দৃষ্টিকোণের ব্যবহার গল্পের এক গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। শওকত ওসমান গল্প-

Dhaka University Institutional Repository

প্রকরণসৃষ্টির ক্ষেত্রে দৃষ্টিকোণের সার্থক ব্যবহার করেছেন– "ব্রিটিশ কালপর্বের গল্পে গ্রামীণ বৃত্তে আবর্তিত জীবন, বাঙালি মুসলিম সমাজ-জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষা ও সংকট, নিু মধ্যবিত্তের আবেগীয় মূল্যবোধ, বুর্জোয়া ও প্রান্তিক চরিত্রের অবস্থান, শ্রেণি-সংঘাত, ধর্মজীবীদের মুখোশ উন্মোচনে শওকত ওসমান সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ (Omniscient point of view), উত্তম পুরুষের দৃষ্টিকোণ, ব্যঙ্গাত্মক দৃষ্টিকোণ (Comedy structure) এবং চরিত্রের প্রেক্ষণবিন্দু ব্যবহার করেছেন।"[৫৬]

ছোটগল্পের শিল্পরীতিতে সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণের ব্যবহার সম্পর্কে চঞ্চল কুমার বোস বলেন:

> কাহিনি বিন্যাসে আবেগময নাটকীয়তা ও ঘটনা বর্ণনার ক্ষেত্রে সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণের ব্যবহার চল্লিশ ও পঞ্চাশ দশকের গল্পের মৌল বৈশিষ্ট্য। ফ্লাটধর্মী একাধিক কাহিনির বিন্যাসে স্বভাবতই এই পর্বের লেখকেরা সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণের আশ্রয় নিয়েছেন। সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণের পাশাপাশি অনেকক্ষেত্রে গল্পকাররা কথক চরিত্রের (Teller character) মাধ্যমে ঘটনা বর্ণনা করেছেন।[৫৭]

শওকত ওসমানের ব্রিটিশ কালপর্বের অধিকাংশ গল্পে সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণের সার্থক প্রয়োগ ঘটেছে। গল্পগুলোর মধ্যে– *পিঁজরাপোল* গল্পগ্রন্থের 'পিঁজরাপোল', 'আলিম মুয়াজ্জিন'; *জুনু আপা ও অন্যান্য গল্প* গ্রন্থের 'সাদা ইমারত', 'গেঁহু'; *সাবেক কাহিনী* গ্রন্থের 'বকেয়া', 'সে কিরূপে স্বর্গে গেল', 'প্রতীক্ষা', 'তুচ্ছ স্মৃতি', 'দেনা' এবং *বিগত কালের গল্প* গ্রন্থের 'ব্যবধান' গল্পগুলো উল্লেখযোগ্য। শওকত ওসমান *সাবেক কাহিনী* গ্রন্থের 'দেনা' গল্পে সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণের ব্যবহার করেছেন:

> মাঠে কোথাও-কোথাও ক্ষেত শূন্য। ফসলের মৌসুম শুরু হোয়েছে। পল্লীর কিনারায় খামারে খামারে উঁচু ধানের গাদা। দূর থেকে চাষীদের উঠান আর খামার চিত্রপটের মত স্বপ্নের আবেশ তোলে। শীতঋতুর বিষণ্ন বৈকাল-ছাওয়া বাংলাদেশের গ্রাম।[৫৮]

শওকত ওসমান "এ কালপর্বে রচিত ২৬টি গল্পের মধ্যে ১৩টি গল্পেই নিখুঁত সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণের ব্যবহার করেছেন। গল্পকারের সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ ব্যবহারের মাধ্যমে নিস্তরঙ্গ গ্রামীণ জীবনপ্রবাহ, প্রবহমাণ সময়-সমাজ ও ঘটনার বাহ্যিক বিবরণ, বুর্জোয়া-মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্ত-প্রান্তিক মানুষের জীবনপ্যাটার্ণ এবং অস্তিত্বসংগ্রামরত মানুষের স্থানিক পরিচয় ফুটে উঠেছে।"[৫৯] সরল বর্ণনার পাশাপাশি সর্বজ্ঞাশ্রয়ী দৃষ্টিকোণের ব্যবহার এ পর্বের গল্পে দেখা যায়– যা শওকত ওসমানের প্রথাগত দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় বহন করে।

Dhaka University Institutional Repository

ব্রিটিশ কালপর্বের কয়েকটি গল্পে গল্পকার উত্তম পুরুষের দৃষ্টিকোণকে ব্যবহার করেছেন। এ জাতীয় গল্পের মধ্যে 'জুনু আপা' (*জুনু আপা ও অন্যান্য গল্প*) এবং 'চুহা-চরিত' (*বিগত কালের গল্প*) উল্লেখযোগ্য। 'জুনু আপা' গল্পের জুনু চরিত্রের মধ্য দিয়ে এক নারীর অন্ধকার জীবনের আখ্যান বর্ণিত হয়েছে। বাঙ্গালি হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে মিথ্যে কৌলিন্য অনেক সময় নারীর অমর্যাদার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। জুনু আপার জীবনেও এরকম অন্ধকার নেমে আসে প্রেমে প্রত্যাখাত হবার পর। উত্তম পুরুষের (সেলিম নামক চরিত্র) বিবরণে রচিত এ গল্পে জুনু আপার, দুঃখময় জীবন, স্বামীর কাছ থেকে তালাকপ্রাপ্তির পর নিজের বাড়ি থেকে অকস্মাৎ নিরুদ্দেশ হওয়া এবং শেষ পর্যন্ত পঞ্চাশোর্ধ ক্ষয়িষ্ণু জমিদার মালেক সাহেবের সঙ্গে বিয়ে হওয়া এবং জনমানবহীন প্রায় জীর্ণ পরিত্যক্ত বাড়িতে তার নিস্তরঙ্গ জীবনযাপন নাট্যিকরীতিতে চিত্রিত হয়েছে। জুনু আপার বিপর্যস্ত জীবনের স্বরূপ অঙ্কনে লেখক ব্যবহার করেছেন উত্তম পুরুষের দৃষ্টিকোণ এবং এই দৃষ্টিকোণ-পরিচর্যা গীতময় এবং চিত্রধর্মী:

> তারপর কয়েকদিন আপার মুখে উজ্জ্বল হাসি ছিল না। ডাগর চোখের কোণে বিষন্নতা জমাট বেঁধেছিল। সুঠাম শরীরে তার গম্ভীর মূর্ত্তি মনে হতো যেন কাজল পয়স্বিনী-ভরা শ্রাবণের আকাশ– শুধু অশ্রু বর্ষনের প্রতীক্ষায় রয়েছে।[৬০]

ব্যক্তির স্বপ্ন ও বিনষ্টির কল্পময় অনুভবে 'জুনু আপা' গল্পটি বেদনাবহ হলেও ব্যক্তির অনমনীয় শক্তির উদ্বোধনে 'নতুন জন্ম' গল্পটি বিশিষ্ট। 'নতুন জন্ম' গল্পের ফরাজ আলি চরিত্রটি নদীবিধৌত সংগ্রামশীল মানুষের আশাবাদী অস্তিত্বের প্রতীক। গোমতীর তীব্র প্লাবনকে উপেক্ষা করে ফরাজ আলি প্রথমে বাঁধে আশ্রয় নেয়। নতুন জীবনের অন্বেষায় শহরে যাবে বলে সে অপেক্ষা করে বাঁধের ওপর– নতুন ভোরের প্রতীক্ষায়:

> আকাশ আরো পরিষ্কার হোয়ে আসে। মেঘ-মুক্তির আস্বাদে জ্যোৎস্না ফুটফুটে রোশনাই ছড়ায়। কাঠের কয়েকটা মোটা-গুঁড়ি পড়েছিল চওড়া কাঁধের একপাশে। তারই উপর পুনর্বসতির মহড়া। সব গুছিয়ে রাখল্ ফরাজ আলি।[৬১]

কাহিনি-বর্ণনবিচারে কিছু গল্প অসাধারণ শিল্পরূপ পেয়েছে। "এ জাতীয় বৈশিষ্ট্য ধারণকারী গল্পে ঘটনার ঘনঘটা গল্পগুলোকে নাটকীয় করে তুলেছে। অবশ্য এর পেছনে আছে কাহিনী বিন্যাসের অভিনবত্ব, উপস্থাপনের নতুনত্ব ও প্রকরণের কঠিন সংযত সৌষ্ঠব। গল্পে সরল বর্ণনার মধ্যে হঠাৎ করে নাটকীয়তা সৃষ্টি করে কাহিনি বিন্যাসে জটিলতা আনয়ন গল্পকারের স্বভাবজাত।"[৬২] যেমন, 'আলিম মুয়াজ্জিন' (*পিঁজরাপোল*) গল্পে আলিম মুয়াজ্জিনের হঠাৎ পাগল হয়ে যাওয়া, 'কাঁথা' (*পিঁজরাপোল*) গল্পে ছেঁড়া কাঁথার মধ্য থেকে বরু-বিবির একটি নতুন শাড়ি আবিস্কার করা, 'নতুন জন্ম' (*জুনু আপা ও অন্যান্য গল্প*) গল্পে পুত্র আক্কাসের তিরস্কারের মধ্য দিয়ে পিতা ফরাজ আলির মানসজগতের আমূল পরিবর্তন নাটকীয় সংবেদনা বিন্যাস লাভ

Dhaka University Institutional Repository

করেছে। অর্থাৎ গল্পকার পুত্র আক্কাস চরিত্রের দৃষ্টিকোণ ব্যবহার করে পিতা ফরাজ আলির ভবিষ্যৎ মানস-জগতের পরিমাণ ব্যক্ত করেছেন :

> তারপর জোর করে রুষ্ট পুত্রকে পাশে বসিয়ে বলে, "বয়। ঠিক কইছস। বিয়ান আইতে দে। আমিও যামু তর লগে। মহাজনের নাউ দিয়া দিমু।"[৬৩]

ব্যঙ্গাত্মক দৃষ্টিকোণের ব্যবহার শওকত ওসমানের একটি সহজাত বৈশিষ্ট্য। তিনি এ বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে সমাজের অসঙ্গতি এবং ব্যক্তির অসামঞ্জস্য দিক উপস্থাপন করেন। *বিগত কালের গল্প* গ্রন্থের 'চুহা-চরিত' গল্পে ব্যঙ্গাত্মক দৃষ্টিকোণের ব্যবহার দেখা যায়– যার মাধ্যমে গল্পে বাস্তব পরিবেশ মূর্ত হয়ে ওঠে:

> মহকুমা মুসলিম লীগের অফিস। এক কোণে গর্তের ভিতর বিনা ভাড়ায় আমি কয়েক বছর বাস করিতেছি।...আমার বাসার মালিক লীগের লোকাল প্রেসিডেন্ট। স্বামী না হইলেও গৃহস্বামী, এই জন্যে তাহার নাম উচ্চারণ করিতে পারিলাম না। বহুদিন তাহার নিমক খাইয়াছি। আজ লবণ-হারামি করিতে চাই না।[৬৪]

ব্রিটিশ কালপর্বের অধিকাংশ গল্পে কাহিনি নির্ভর গীতময় বিবরণধর্মী আবেগীয় পরিচর্যা রীতি বিন্যস্ত হয়েছে। গল্পের দীর্ঘ কাহিনি, দীর্ঘ বাক্য এবং সাধু গদ্যের ব্যবহার বিবরণধর্মী পরিচর্যারীতির সাধারণ বৈশিষ্ট্য। যে সব গল্পে বিবরণধর্মী পরিচর্যা প্রাধান্য পেয়েছে তার মধ্যে– *পিঁজরাপোল* গল্পগ্রন্থের 'থুতু', 'পিঁজরাপোল', 'দাতব্য চিকিৎসালয়ের ইতিহাস', 'আলিম মুয়াজ্জিন', *জুনু আপা ও অন্যান্য গল্প* গ্রন্থের 'সাদা ইমারত', 'গেঁহু', 'দুই চোখ কানা', *সাবেক কাহিনী* গল্পগ্রন্থের 'সে কিরূপে স্বর্গে গেল', 'প্রতীক্ষা', 'বিবেক', *বিগত কালের গল্প* গ্রন্থের 'শেখজী', 'ব্যবধান' প্রভৃতি গল্প উল্লেখযোগ্য। শওকত ওসমানের 'প্রতীক্ষা' গল্পে বর্ণনাত্মক পরিচর্যার ব্যবহার দেখা যায়:

> সে মরিয়া যাইবে, তা দিনের আলোর মতই সত্য।...ছোট অন্ধকার একটি ঘরে ছেঁড়া কাঁথার উপর বাকের শুইয়া থাকে। ম্যালেরিয়া জ্বরে ছ'মাস সে ভুগিতেছে। আজ জ্বর নাই। জ্বর ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার শরীরের নির্যাসটুকু অন্তর্হিত হইয়াছে। হাতী-খাওয়া বেলের মত কাঠামো বজায় আছে মাত্র। আজকাল তাহার উঠিবার শক্তিটুকু নাই। অন্ধকার ঘরে সে শুইয়া থাকে।[৬৫]

ব্রিটিশ কালপর্বের গল্পে কাব্যিক পরিচর্যার ব্যবহার দেখা যায়। এ সব গল্পে গীতধর্মী-কাব্যিক পরিচর্যা উপমা-উৎপেক্ষা অলংকার-আশ্রয়ী। হয়ত শওকত ওসমানের সাহিত্যিক জীবনের প্রথম দিকের কবিতা রচনার ঝোঁক এ পর্বের গল্পের পরিচর্যা রীতিতে প্রভাব বিস্তার করেছিল। তাঁর 'ইলেম' এবং 'থুতু' গল্পে কাব্যিক পরিচর্যার দৃষ্টান্ত রয়েছে:

Dhaka University Institutional Repository

(ক) রাত্রির কৃষ্ণছায়া জিভ মেলিতেছি। মেঘের আনাগোনা শুরু হইয়াছে পুনরায়। বর্ষার অনিশ্চিত আকাশ। ঝড়ের ছোঁয়াচ লাগিতে কতক্ষণ? দিগন্তে ঘন অন্ধকারের নিঃশব্দ বিস্তার রাঙা মাটির গিরিশ্রেণির ধূসর স্তব্ধতায় বিভীষিকার প্রলেপ আঁকিতেছে। পাতলা মেঘরাশি পাহাড়ের শীর্ষে; প্রস্তর ও তরুশ্রেণির কায়ালোক প্রতিবেশীর মমতাসন্ধানী। চকিত ইশারায় সঙ্গীহীন একটি নক্ষত্র অস্তিত্বের পরিচয় দিয়া পুনরায় হাবসী জুলুমের মুখে আত্মসমপর্ণ করিল।[৬৬]

(খ) অব্যক্ত কাৎরানি তবু ফাদার জোহানেসের বুকে। সূচীভেদ্র অন্ধকার বাইরের পৃথিবীতে। ঘরের জানালা উন্মুক্ত। নিষ্প্রব তারকার ইশারা হারিয়ে যায় বাগানের ওপারে। দূরে পাহাড়তলীর বুকে বনানীর কালো কার্পেট। তারই পটভূমি জুড়ে গীর্জার উত্তুঙ্গ ক্রেষ্ট অসীমের ইঙ্গিত রেখে দূরে বিলীয়মান। জানালায় নিশ্চল প্রতিমার মত স্থির হোয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন বৃদ্ধ শ্রমণকুল-তিলক। অরণ্যব্যাপী দাবানলের পূর্বে স্ফুলিঙ্গের জোনাকি দেখতে লাগলেন ফাদার জোহানেস রাত্রির স্তিমিত তরঙ্গে।[৬৭]

তাছাড়া শওকত ওসমানের গল্পে কাব্যিক পরিচর্যার সাথে প্রকৃতি ব্যবহারের প্রবণতা দেখা যায়। জীবনের সরল-জটিল প্রাত্যহিক নানারূপ প্রকাশে নান্দনিক ব্যঞ্জনা নিয়ে প্রকৃতি প্রতিফলিত হয়– 'দীর্ণ পত্র' এবং 'দেনা' গল্পে প্রকৃতির ব্যবহার লক্ষ করা যায়:

(ক) ঝড় উঠেছিল ঈশান কোণে। ঠিকানা হীন আশ্বিনের মেঘ। কালো হোয়ে গেল গ্রামের চতুর্দ্দিক নিমিষে। গোঠের গরু-ছাগল হাম্বা-রব তুল্‌ছিল। ঝঞ্ঝায় পৃষ্ঠারোহী বৃষ্টির পর বর্ষণ শুরু হোতে পারে, তারই ভয়ে গাছ-পালা স্তব্ধ-অকস্মাৎ কেঁপে উঠল। রাখাল ছেলেরা ত্রস্ত ধাবমান গো-পালের পশ্চাতে।[৬৮]

(খ) একটেরে আবিদন বিবির ঘর। তারপর মাঠের অভিসার দিগন্তের দিকে। ফসল-ভরা প্রান্তরের কোলে ওপারের গাঁ-গুলো রূপ-কথার দেশের মত হাতছানি দেয়। বাতাসে রূপ-সাগরের তরঙ্গ আত্মোৎসর্গের উন্মাদনায় সঙ্গীত-কল্লোল রচনা করে। আবিদন বিবি শুধু ক্লান্ত পাঁজরের দিগ সীমানায় প্রান্তরের হাহাশ্বাস শোনে।[৬৯]

শওকত ওসমান তাঁর ব্রিটিশ কালপর্বের গল্পে প্রতীকী পরিচর্যাকে ইঙ্গিতধর্মীতায় পরিণত করে দূরাগত অর্থের হাতছানিকে ব্যঞ্জনাময় করে তুলেছেন। এ সম্পর্কে চঞ্চল কুমার বোস বলেন:

গল্পকার গল্পে মৌলিক বোধ, অভিপ্রায় কিংবা পরিণামী বাস্তবতাকে দ্যোতিত করার তাগিদে প্রতীকতার আশ্রয় নেন।[৭০]

জুনু আপা ও অন্যান্য গল্প গ্রন্থের 'নতুন জন্ম' গল্পে এ বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। গল্পের ভাষায়:

Dhaka University Institutional Repository

ঠাণ্ডায় হি হি কাঁপে আক্কাস। ফরাজ আলি সস্নেহে তাকে কাঁথার ভিতর মুড়ি দিয়ে নিতে-নিতে অপরাধীর মত বলে "সরম না করস। আঁই তোয়ার পোলা ন, বা-জান? বিবস্ত্র পিতার পাশে গামছা-পরিহিত পুত্র। দুই জনে ভোরের প্রতীক্ষা করে।[৭১]

এ ছাড়া *বিগত কালের গল্প* গ্রন্থের 'ব্যবধান' গল্পে রাসেদীর উপর মাতৃস্নেহের কথা ব্যক্ত করতে গিয়ে প্রতীকী পরিচর্যার ব্যবহার লক্ষণীয়:

সম্মুখে ধূসর প্রভাতের দিগন্ত। তাহারা তিনজন হাঁটিতেছে। আয়াৎ আত্তাহিয়াত্যের পর সালাম ফিরাইতেছে যেন রাসেদী। দুই স্কন্ধে-পার্শ্বে দুই জননীর সহিত তাহার চোখাচোখি হইল।[৭২]

এ পর্বের গল্পে ঘটনাধর্মী পরিচর্যা বিশেষভাবে প্রকাশিত। তবে গল্পে ঘটনাধর্মী পরিচর্যার সাথে নাট্যিক পরিচর্যা একই সুত্রে গাথা। "মূলত গল্পকার নাট্যিক পরিচর্যার মাধ্যমেই গল্পে ঘটনাধর্মিতা আনয়ন করেছেন– এর ফলে গল্পের আখ্যান লাভ করেছে গতি, চরিত্র হয়ে উঠেছে প্রাণবন্ত, পরিবেশ অঙ্কিত হয়েছে সাবলিল ধারায়। যেমন 'ইলেম' (*পিঁজরাপোল*) গল্পে নদীপথে কাস্টমস পুলিশ কর্তৃক জহির মাঝির গ্রেপ্তার হওয়া, পরে উৎকোচ প্রদানের মাধ্যমে মুক্তি লাভের মধ্যে যেমন নাটকীয়তা বিদ্যমান, তেমনি ইলেমের প্রতি ঘৃণাবোধ থেকে পুত্রের পুস্তক ছেঁড়ার মধ্যেও গল্পে নাটকীয়তা প্রগাঢ় রূপ পেয়েছে। 'বকেয়া' (*সাবেক কাহিনী*) গল্পে পাঁচুর মেয়ে টুনির মৃতদেহ কলা গাছের ভেলাতে জমিদারের পুকুরে ভাসানোর মধ্যে যেমন নাটকীয়তা রয়েছে– তেমনি তাকে কলা গাছের ভেলা থেকে উদ্ধার করে দেবীরূপে পূজা-অর্চনার মধ্যে নাটকীয়তা আরও ঘনীভূত হয়েছে।[৭৩]

তবে, নাটকীয়তার মধ্যে ঘটনাধর্মিতা প্রাধান্য পেয়েছে যে সব গল্পে তার মধ্যে 'ভাগাড়' গল্প অন্যতম। গল্পের ভাষায়:

ভিড়ের ভেতর থেকে একজন কৃশ লোক এগিয়ে এলো : আমরা মানুষ নই? কন্ চাই।...মনসব আলি ভেতরে ভেতরে তেতে উঠে রীতিমত। অগ্নিগিরি তার বুকে ফেঁসে টানে। গুশত দিলেন। ভাবলাম খাওনের কবাল নাই। হালায়, আল্লার জানোয়ারে খা'ক। কুত্তা, গিধ, শকুন। মনসব আলি এবার দিগ্বিদিক শূন্য ক্রোধে ফেটে পড়ে। ব্যাটা তোরা আল্লার জানোয়ার না? তা ঠিগ হুজুর। আল্লার জানোয়ার পেডে বা'ত নাই, জানোয়ার ই ত। তা ঠিগ। কিন্তু কাঁচা গোশত খাইতে পারি না।...বহু পাখনার শাঁই শাঁই শব্দ আরো একদল শকুন পড়ল ভাগাড়ে।[৭৪]

Dhaka University Institutional Repository

ছোটগল্পের শৈলীবিচারে ভাষা একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। শওকত ওসমান ব্রিটিশ কালপর্বের ছাব্বিশটি গল্পের মধ্যে তেরটি গল্পে সাধুভাষা এবং তেরটি গল্পে চলিত ভাষা ব্যবহার করেছেন। এ সম্পর্কে অনীক মাহমুদ বলেন:

> প্রথম দিকের গ্রামীণ নিস্তরঙ্গ জীবনচেতনায় সাহিত্য রচনা করতে গিয়ে ভাবের সাধুতা আর গভীরতার সংমিশ্রণ ঘটাতে তিনি সাধুরীতির ব্যবহার করেছেন।[৭৫]

শওকত ওসমান ব্রিটিশ কালপর্বে যে সব গল্পে সাধু ভাষা ব্যবহার করেছেন সেগুলোর মধ্যে– *পিঁজরাপোল* গল্পগ্রন্থের 'ইলেম', 'কাঁথা', *জুনু আপা ও অন্যান্য গল্প* গ্রন্থের 'সাদা ইমারত', *সাবেক কাহিনী* গল্পগ্রন্থের 'মো'জেজা', 'বকেয়া', 'সে কিরূপে স্বর্গে গেল', 'প্রতীক্ষা', 'বিবেক', *বিগত কালের গল্প* গ্রন্থের 'শেখজী', 'চুহা-চরিত', 'ব্যবধান' প্রভৃতি গল্প উল্লেখযোগ্য। *জুনু আপা ও অন্যান্য গল্প* গ্রন্থের 'সাদা ইমারত' গল্পে সাধুগদ্য ভাষার প্রয়োগ করেছেন গল্পকার– যা চিত্রধর্মী এবং অলঙ্কারমন্ডিত:

> হাসিনা সাদা ইমারতের দিকে আবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। অচেনা অজানা অন্য কোন মানুষের নীড় তার বুকে আঁকা হইয়া যায়। হাসিনা যেন রহস্য-পুরীর দিকে চাহিয়া আছে।...দূরে সাদা প্রতীক-মাণ ইমারত, থমথমে স্তব্ধ রাত্রির প্রাঙ্গণে অভিসারিকা যেন তরুলতার ফাঁক দিয়া হাতছানি দিতেছে। হাসিনার মন ভারাক্রান্ত। শ্রাবণের মেদুর আকাশে মত তার মুখে কালো ছায়া।[৭৬]

শওকত ওসমান সাহিত্য জগতে প্রবেশ করেন কবিতা চর্চার মধ্য দিয়ে– যা পরবর্তী ছোটগল্প রচনার ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করেছিল। তাই তিনি ছোটগল্পের ভাষাকে বিভিন্ন মাত্রায় ব্যবহার করে ব্যঞ্জনার সুষ্টি করেছেন। *পিঁজরাপোল* গ্রন্থের 'পিঁজরাপোল' গল্পে ভাষা ব্যবহারের চমৎকারিত্ব উপস্থাপন করেছেন:

> আম্র-বিথীর উপর দিয়ে চন্দ্রিকার জোয়ার চল্‌ছে। নিচে আদিম প্রাগৈতিহাসিক অন্ধকার। আদমের কোন শিশু নেই আজ এইখানে। ঝিল্লী-স্বরে রাত্রির পেয়ালা শুধু ভরে উঠে।[৭৭]

বাল্যকালে গ্রামের মাদ্রাসায় এবং কলকাতার আলিয়া মাদ্রাসায় পড়াশুনা করেছেন শওকত ওসমান। এ কারণে আরবি ভাষার সঙ্গে পরিচিত হন এবং উর্দু, হিন্দি, ফারসি শব্দ রপ্ত করেন– যা পরবর্তীকালে তাঁর ছোটগল্পের ভাষায প্রয়োগ করেন। এ সম্পর্কে আজহার ইসলাম মন্তব্য করেন:

> ইসলাম ধর্মের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে নিবিড় পরিচয় তাঁর মননের গভীরে যে প্রভাব বিস্তার করেছে তারই বহিঃপ্রকাশ রূপে তাঁর গল্প-উপন্যাসে ধর্মীয় শব্দসমূহের এমন স্বতঃস্ফুর্ত ব্যবহার সম্ভব হয়েছে।[৭৮]

Dhaka University Institutional Repository

তাছাড়া এ বিষয়ে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য:

যখন তিনি বিদেশী শব্দ প্রয়োগ করেন– এ কেবল ভাষাকে গহনা পরানোর সখ মেটানো, তীব্র-প্রতিক্রিয়াকে শানিত করে বলাই এ ধরনের শব্দ ব্যবহারের একমাত্র লক্ষ।[৭৯]

এ ধরনের ভাষা গল্পের প্লট গঠনে যেমন সহায়ক হয়েছে তেমনি গল্পের নিয়ন্ত্রক শক্তি হিসেবেও উপস্থাপিত হয়েছে। *পিঁজরাপোল* গল্পগ্রন্থের 'থুতু', 'পিঁজরাপোল', *সাবেক কাহিনী* গল্পগ্রন্থের 'দেনা' গল্পের ভাষায় এ বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান:

(ক) মনসুর, তোমরা থাইসিস কা বিমারী হ্যায়?

–দীক্ কা বিমারী? হাঁ, ফাদার।

–হাম্‌কো কাহে নেহি বোলা?

–নোক্‌রি ছুট জায়েগা, ইসি-ওয়াস্তে।

...তোম মেরা খানামে থুক্ দেতা?

–কভি কভি, ফাদার।

–কিঁউ এয়সা কাম করতা?

–মেরা বহেন কো আপনে দেখা। বেগায়ের খানা মেরা দেশকা বহুৎ আদমী– মেরা মা।[৮০]

(খ) কাম না কারি হো?

...সরকার কা পয়সা খাই হো, না কাম কারি হো?

...বড়ো মিয়া সরকার কোন্? খানে দেতা হ্যায়? বিশ রুপেয়া মে জরু-বাচ্চা খা সাক্‌তা হ্যায়?

জেয়সা পয়সা ঐসা কাম।[৮১]

(গ) –ঢাঁই রুপেয়া।

...এই বুড়টী, তোম খরিদে-গা?পয়সা দেনে সাকে-গা?

সলজ্জ কণ্ঠে বুড়ি জবাব দেয়: আর বছর।

...আদায় হোগা তো?

...ও হাম কেইসে বোলে গা?

–তব নেহি বেচে-গা।[৮২]

Dhaka University Institutional Repository

আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহারেও শওকত ওসমান ছিলেন সিদ্ধহস্ত। যার কারণে এ পর্বের গল্পগুলোর কিছু কিছু চরিত্র পৃথক মহিমায় উদ্ভাসিত। শওকত ওসমানের ছোটগল্পের চরিত্র চিত্রনে আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার সম্পর্কে অনীক মাহমুদ মন্তব্য করেন:

> কলকাতাকেন্দ্রিক সাহিত্যজীবনে উপভাষার ব্যবহার তাঁর রচনায় লক্ষ করা যায় না। পূর্ব বঙ্গে আসবার পর থেকে গল্প-উপন্যাসের কথোপকথনে তিনি বরাবর পূর্ববঙ্গের আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার করেছেন।[৮৩]

যে সব গল্পের মধ্যে তিনি আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার করেছেন সে গুলোর মধ্যে *পিঁজরাপোল* গল্পগ্রন্থের 'ইলেম', 'কাঁথা' প্রভৃতি গল্প উল্লেখযোগ্য। এ সব গল্পে আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহারের নমুনা:

(ক) –বা'লো হয়ি বইয়ো, মিয়াঁ।
...চুপ বইয়ে? মন তোয়াঁর খারাব, অ মিয়াঁ?
...আঁঅর মন আছে? ইডা কি কও, মিয়াঁ? হফ্তা পারায়। গ'রৎ একগুয়া চৈল ন আছিল।[৮৪]

(খ) হালার কবাল দ্যাহো। একডা পোলা, তারও গায় কাঁথা জোডে না।[৮৫]

শওকত ওসমান সচেতনভাবে নিম্নবিত্ত মানুষের মুখে আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার করে একদিকে মানুষগুলোর শ্রেণি অবস্থানকে স্পষ্ট করেছেন, অন্যদিকে তাদের বাস্তব অবস্থার চিত্র তুলে ধরেছেন। *জুনু আপা ও অন্যান্য গল্প* গ্রন্থের 'নতুন জন্ম' গল্পে দেখা যায়– "ফরাজ আলির এক প্রতিবেশী প্রায় বলত, চলেন মিয়া যাই চইলা যাই এহান থেইক্যা।"[৮৬]

এ কালপর্বের গল্পে একাধিক ধরনের অলঙ্কারের ব্যবহার করেছেন শওকত ওসমান– যা গল্পের কাহিনি বা চরিত্রের সার্থকতা বহন করে। *পিঁজরাপোল* গল্পগ্রন্থের 'থুতু', 'ইলেম', 'আলিম মুয়াজ্জিন', *জুনু আপা ও অন্যান্য গল্প* গ্রন্থের 'জুনু আপা', 'নতুন জন্ম', *সাবেক কাহিনী* গল্পগ্রন্থের 'সাদা ইমারত', গল্পে উপমা অলঙ্কারের ব্যবহার দেখা যায়:

(ক) জানালায় নিশ্চল প্রতিমার মত স্থির হোয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন বৃদ্ধ শ্রমণকুল-তিলক।[৮৭]

(খ) চকিত ইশারায় সঙ্গীহীন একটি নক্ষত্র অস্তিত্বের পরিচয় দিয়া পুনরায় হাবসী জুলুমের মুখে আত্মসমর্পণ করিল।[৮৮]

(গ) নর্তকীর মত ইশারার ঝিলিকের পর মিষ্টি হাসি চেপে মুখের উপর পাৎলা মেঘের ওড়না টেনে দিচ্ছে।[৮৯]

(ঘ) ঝর্ণা-স্রোতের মত সহস্র তরঙ্গ-ভঙ্গে আলো ঠিকরে পড়ছে কামরায়।[৯০]

Dhaka University Institutional Repository

(ঙ) শ্রাবণের মেদুর আকাশের মত তার মুখে কালো ছায়া।[৯১]

শওকত ওসমানের কিছু গল্পে সমাসোক্তি এবং উৎপ্রেক্ষা– অলঙ্কারের ব্যবহার প্রত্যক্ষ করা যায়। সমাসোক্তির ব্যবহার:

(ক) রাত্রির কৃষ্ণচ্ছায়া জিভ মেলিতেছে।[৯২]

(খ) গোমতী যেখানে বাইজীর মত কোমর বাঁকায় নৃত্য-ছন্দে।[৯৩]

(গ) খড় বোঝাই কয়েকটি নৌকা কেবল প্রতীক্ষমান তখনও।[৯৪]

(ঘ) কালো মেঘ-জালে সূর্যের মৃত্যু-দৃশ্য ঢাকা পড়িয়া থাকিবে।[৯৫]

উৎপ্রেক্ষার ব্যবহার:

(ক) চেতনা যেন উটের মত ঝড়ো নিঃশ্বাসের গন্ধ পায়।[৯৬]

(খ) বাইরের আকাশ বাতাস যেন উৎসুক দৃষ্টিতে তার দিকে দৈত্যের মত মুখ-গহবর মেলে চেয়ে আছে।[৯৭]

(গ) দূরে সাদা প্রতীক্ষ-মান ইমারত, থমথমে স্তব্ধ রাত্রির প্রাঙ্গণে অভিসারিকা যেন তরুলতার ফাঁক দিয়া হাতছানি দিতেছে।[৯৮]

ব্রিটিশ কালপর্বের গল্পে জীবনের নানামাত্রিক রূপ এবং শিল্পাঙ্গিক উপস্থাপিত হয়েছে। জীবনবৈচিত্র্য এবং বিষয় নির্বাচনের মতো– এ পর্বের গল্পের শিল্পকৌশলও সমকালকেন্দ্রিক গল্পের প্রধান প্রধান চরিত্র গ্রামীণ পটভূমিকায় উপস্থাপিত। ভাষার বিশিষ্ট প্রয়োগে গল্পগুলো সমৃদ্ধ। বিশ শতকের তিরিশ চল্লিশের দশকের সমাজ ও সময়ের বিকাশের সাথে শওকত ওসমানের জীবনবোধ ও শিল্পাদর্শ একাত্ম হয়ে তাঁর গল্পগুলোকে শিল্পোত্তীর্ণ করেছে।

একজন শিল্পী তাঁর সময়-সমাজ-ঐতিহ্যবোধকে আত্মস্থ করে তাঁর শিল্পের জগৎ নির্মাণ করেন। পাকিস্তান কালপর্বে অর্থাৎ বাংলাভাগোত্তবকালে শওকত ওসমানের ছোটগল্প লেখকের জীবনদৃষ্টি সমাজ-রাষ্ট্র, ধর্মচিন্তা, সমকালীন সংগ্রাম, ব্যক্তির অস্তিত্ব সংকট প্রভৃতি বিষয়কে ধারণ করে বিন্যস্ত হয়েছে। সমকালীন রাষ্ট্রব্যবস্থা ও সমাজজীবনের নানা সংকট-সংগ্রামকে কেন্দ্র করে তাঁর সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে। এ সম্পর্কে মিজানুর রহমান খান মন্তব্য করেন:

Dhaka University Institutional Repository

জীবনের অন্তহীন রূপ ও অবিরাম রূপান্তরের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সমৃদ্ধ হয় একজন শিল্পীর সমগ্র চৈতন্য। এর সঙ্গে যুক্ত হয় কালজ্ঞান, পরিবেশ-সচেতনতা, ইতিহাস-ঐতিহ্যবোধের পরাকাষ্ঠা এবং অর্জিত হয় সমাজ-প্রতিবেশ সৃষ্ট বিশ্বাস ও মূল্যবোধের গভীরতা। শিল্পীর ব্যক্তিচৈতন্য ও শিল্পীমানস প্রবহমাণ সময় ও দ্বন্দ্বমুখর সমাজের যোগফল।[৯৯]

পাকিস্তান কালপর্বে শওকত ওসমান সংক্ষিপ্ত আকারে রূপক-প্রতীকের আশ্রয়ে তাঁর ছোটগল্প রচনা করেছেন। "পঞ্চাশ-ষাটের দশকের রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনের আতঙ্ক-শিহরিত রূপ যে-কোনো সৎ শিল্পীর জন্যই অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণ হতে বাধ্য। ফলে, তাঁর গল্পসমূহ দ্বন্দ্বজটিল জীবনের নানামাত্রিক আয়োজনে যেমন ঋদ্ধ, তেমনি বিষয় বৈচিত্র এবং শিল্পকৌশলে বিবিধ প্রয়োগে সমৃদ্ধ।"[১০০]

১৯৪৭ সালের 'দ্বি-জাতি তত্ত্ব' অর্থাৎ যুগচৈতন্যের অন্তর্দ্বন্দ্ব, রক্তক্ষরণ, বেদনার ইতিহাসকে শওকত ওসমান তাঁর ছোটগল্পের শিল্পরূপে প্রতিফলিত করেছেন। এ বিষয়ে চঞ্চল কুমার বোস মন্তব্য করেন:

ভারতবিভাগের মধ্য দিয়ে বাঙালি মুসলিম লেখকদের স্বতন্ত্র শিল্পচর্চার সুযোগ ঘটে কেবল ভৌগোলিক স্বাতন্ত্র্য নয়, শিল্পের ক্ষেত্রেও তাদের আত্মপরিচয় নির্মাণ এবং স্বাধীন সত্তা বিকশিত হবার সুযোগ তৈরি হয়।...শিল্পের যে কোন আদল বা রূপকল্প মুখ্যত গড়ে ওঠেসমকালীনতার ক্যানভাসে, তবে ঐতিহ্যের অঙ্গীকার এবং রূপান্তরের আন্তর গরজে শিল্পের অবয়ব ক্রমাগত বদলে যায়। বিষয়ের প্রয়োজনে আঙ্গিক ও প্রকরণ্নোসে পালাবদল। [১০১]

ষাটের দশকে প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ সমূহ– *প্রস্তর ফলক* (১৯৬৪), *উভশৃঙ্গ* (১৩৭৫), *নেত্রপথ* (১৯৬৮)। পাকিস্তান কালপর্বের কিছু গল্পে ব্রিটিশ কালপর্বের ভিক্টোরীয় শিল্প কৌশলের প্রভাব পড়েছে– সেগুলোর মধ্যে *প্রস্তর ফলক* গ্রন্থের 'দুই মুসাফির', 'উভসঙ্গী', 'পিতাপুত্র', 'চূর্ণলয়', 'আজবজীবিকা', *নেত্রপথ* গল্পগ্রন্থের ''দেশ কাল পাত্র', 'শকুনের চোখ' প্রভৃতি গল্প উল্লেখযোগ্য। ভিক্টোরীয় প্রকরণরীতি অনুসারে 'দুই মুসাফির' গল্পে কাহিনি বিন্যাসে সময়ের সুস্পষ্ট ব্যবহার প্রত্যক্ষ করা যায়। অন্যদিকে কাহিনীর ধারাবাহিকতাও লক্ষ করা যায়:

আমি ভেবেছিলাম, আজ রাত্রি কেন, বহু রাত্রি তোমাকে বন্দী থাকতে হবে এখানে। তা তো থাকার যো নেই। আমি বলে এসেছি, ইহলোকে একদিন থাকব। আজ ভোরেই নিজের ঠিকানায় পৌঁছব। বাইরে আসার নাম করে, চলে এলাম। ওই শুকতারা উঠছে। চলো, বাতাসে মিলিয়ে যাই।[১০২]

ব্রিটিশ কালপর্বের গ্রামজীবনমুখীতা পাকিস্তান কালপর্বের গল্পে নাগরিক জীবনের স্বরূপের সন্ধানে পরিবর্তনশীল। আর এ রূপান্তর শওকত ওসমানের শিল্পীমানসে প্রভাব বিস্তার করেছিল। রফিকউল্লাহ খান বলেন:

Dhaka University Institutional Repository

সমাজ শর্তলগ্ন হয়েও একজন শিল্পী আন্তরজাগতিক অভিপ্রায় ও অভিজ্ঞানে, বোধ ও সংবেদনায়, আকাঙ্ক্ষায় ও মনস্তত্ত্বে, অস্তিত্বচেতনা ও জীবনদর্শনে অর্থাৎ নান্দনিক অনুভবে পৃথক।[১০৩]

ছোটগল্পের কাহিনি বিন্যাসে সমকালীন প্রেক্ষাপট শওকত ওসমানের মনের মধ্যে সবসময় ক্রিয়াশীল ছিল। এ সম্পর্কে জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী মন্তব্য করেন:

ঘাত-প্রতিঘাত-সংঘাতময় জীবন শওকত ওসমানকে দিয়েছিল এক চারিত্রিক দৃঢ়তা, যার প্রমাণ মেলে দেশের রাজনীতির বিরুদ্ধ পরিবেশে তাঁর সাহিত্যিক আচরণে। একাত্তরের পূর্বেকার স্বৈরশাসনের যুগ, আবার পঁচাত্তর-পরবর্তী বাংলাদেশে স্বৈরাশাসন ও অপশাসনের দুই দশক ছিল সাহিত্য ও শিল্পীকর্মীদের জন্য এক চরম পরিক্ষার ফল। এসময় অনেকে বিশ্বাসের শুদ্ধতা রক্ষা করতে পারেননি। অনেকেই নিজের সঙ্কীর্ণ স্বার্থসিদ্ধির জন্য ক্ষমতার নান্দী পাঠ করেছেন। অনেকেই রাজনৈতিক বাস্তবতা থেকে মুখ ফিরিয়ে থেকেছেন। প্রবল ব্যতিক্রম ছিলেন শওকত ওসমান। যিনি স্বৈরশাসনের প্রকৃত স্বরূপ দেখেছিলেন ও তাঁর সাহিত্য উপলব্ধির প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন।[১০৪]

সমকালীন রাজনৈতিক উত্তাল পরিস্থিতিতে শওকত ওসমানকে গল্পের কাহিনি বিন্যাসে অর্থাৎ বক্তব্য প্রকাশে কৌশলের আশ্রয় নিতে হয়েছিল। "পাকিস্তান কালের ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ ঘটনাপ্রবাহের আন্তর্বাস্তবতা এবং বহির্বাস্তবতার স্বরূপ নির্মাণে রূপক-প্রতীকের দিকে ঝুঁকে পড়েন। আর এভাবেই চিত্রকল্প ও প্রতীকের সহায়তায় আপন ভাবনাকে অনায়াসে তিনি উপস্থাপন করেন গল্প-শরীরে।[১০৫]

শওকত ওসমানের মানস চেতনা সম্পর্কে সৈয়দ আকরম হোসেন বলেন:

শওকত ওসমানের প্রতীকাশ্রয়ী মানসচেতনার জন্ম স্বকাল-সংকট থেকে নিরাপত্তা লাভের জন্যই। শওকত ওসমানের কৃতিত্ব তিনি তাঁর পলাতক চেতনাকে নিরীক্ষাধর্মী শিল্পরূপে উদ্ভাসিত করতে সমর্থ হয়েছেন।[১০৬]

পাকিস্তান কালপর্বের গল্পে যে রূপক-প্রতীকের ব্যবহার হয়েছে– তা *প্রস্তর ফলক* গল্পগ্রন্থের 'গোরনিদ্রা' গল্পে উপস্থাপিত হয়েছে সার্থকভাবে। 'গোরনিদ্রা' গল্পে দেখা যায় যে– পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী এ দেশের জনজীবন অস্থির করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল, কিন্তু তারা জানতো না যে এদেশের অত্যাচারিত জনগণ সঠিক সময়ে মুক্তি-সংগ্রামে জাগ্রত হয়। গল্পকার নাটকীয় পরিচর্যার মাধ্যমে তা তুলে ধরেছেন:

বিস্ময় বিস্ফোরিত নেত্রে দেখলাম, ...সদ্য-জীবিত লাশ কিন্তু দ্রুত আমার করমর্দন করতে করতে বললে, "ঘাবড়াচ্ছেন কেন? ভূত নই। ঘুমিয়ে গিয়েছিলাম মাত্র। আমি জ্যান্ত। আসলে ও গুলো মড়া, দাঁও-মত আমাকে বয়ে আনছিল। আসুন, দেখুন–।"[১০৭]

Dhaka University Institutional Repository

এ ছাড়া পাকিস্তান কালপর্বের আরও যেসব গল্পে রূপক-প্রতীকের ব্যবহার হয়েছে সেগুলোর মধ্যে *প্রস্তর ফলক* গল্পগ্রন্থের 'শিকারী', *নেত্রপথ* গল্পগ্রন্থের 'উভশৃঙ্গ', 'শৃগালস্য' প্রভৃতি গল্প উল্লেখযোগ্য। "এ জাতীয় বৈশিষ্ট্য ধারণকারী গল্পের বক্তব্য ইঙ্গিতধর্মী, ভাষা ব্যবহার প্রতীকধর্মী, প্লটের স্বাভাবিক গতিস্রোতের মধ্যে আকস্মিক নাটকীয় পরিচর্যা রূপক-প্রতীকধর্মীতাকে স্পষ্ট করে তোলে।"[১০৮]

লেখক পাকিস্তান কালপর্বে ব্রিটিশ কালপর্বে রচিত দীর্ঘ আয়তনযুক্ত গল্প-রচনা থেকে বের হয়ে আসেন এবং সংক্ষিপ্ত আয়তনযুক্ত গল্প-রচনায় মনোযোগ দেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বোধ এক সময় পাঠককে বড় বোধে উপনীত করে– এ সত্য উপলব্ধি করে তিনি *উপলক্ষ্য* (১৯৬৫) এবং *নেত্রপথ* (১৯৬৮) নামক দু'টি গল্পগ্রন্থ রচনা করেন। দু'টি গ্রন্থের রচনাসমূহ ছিল সংক্ষিপ্ত আয়তনযুক্ত। এ সম্পর্কে লেখক বলেছেন:

> বহুব্যস্ত পাঠকের ঈষৎ মনোরঞ্জনের আশায় এই লেখার সূত্রপাত।[১০৯]

তবে গল্পের অবয়বগত সংক্ষিপ্ততা সম্পর্কে শওকত ওসমান *রাজপুরুষ* গল্পগ্রন্থের 'স্বজন স্বজাতি' গল্পে যে বর্ণনা দিয়েছেন তা হল– "গল্প ত স্বল্প চৌহদ্দির মধ্যে থাকা উচিত। ...যদি পদে পদে শব্দের টীকা কাটতে বা ব্যাখ্যা দিতে হয়, তাহলে গল্প বেচারা মার খায়।"[১১০]

পাকিস্তান কালপর্বের কিছু গল্পে কাহিনি বিন্যাসে ফ্ল্যাশ ব্যাক রীতির সাথে স্মৃতিময়তা যুগলবন্দি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। গল্পগুলোর মধ্যে *প্রস্তর ফলক* গল্পগ্রন্থের 'বর্ণামৃত', 'ভ্রূণাঙ্ক, 'সেলুন', *নেত্রপথ* গল্পগ্রন্থের 'একটি বহস', 'জন্তুগাথা', *উভশৃঙ্গ* গল্পগ্রন্থের 'সৌদামিনী মালো' প্রভৃতি গল্প উল্লেখযোগ্য। 'ভ্রূণাঙ্ক' গল্পে গল্পকার ফ্ল্যাশ ব্যাক রীতি এবং স্মৃতিময়তার উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

আমার জনক-জননীরা পরস্পরকে ভালবেসে ছিল। হাজারি গলির সেই ছেলেটি, সেই মেয়েটি। বহুদিনের চেনাচেনি, জানাজানি তাদের। তার কতশত প্রমাণ আছে। এক সন্ধ্যার কথাই বলা যাক :

> মেয়েটি হাসতে লাগল। 'আহ্, যেন ধুলোয় গড়িয়ে পড়ো না', সঙ্গী ছেলেটি খোঁচা দিয়ে বললে।
>
> –তোমার কথা মনে করে সত্যি হাসি পায়।
>
> –কিন্তু এত হাসি কেন?
>
> –তোমার ত সেই পণ্ডিতের দশা।
>
> –কোন পণ্ডিত?

Dhaka University Institutional Repository

–সেই গল্পের পণ্ডিত।[১১১]

শওকত ওসমান এ পর্বের কিছু গল্পের শুরু এবং সমাপ্তি আকর্ষণীয় এবং গল্পের আখ্যানভাগ নাটকীয়ভাবে উপস্থাপন করেছেন। "ফলে নাটকীয় বিন্যাসরীতিতে ঘটনা-কালের পরম্পরায় গল্পগুলো ব্যঞ্জনাময়রূপ লাভ করেছে।"[১১২] এ ধরনের গল্পের মধ্যে *প্রস্তর ফলক* গল্পগ্রন্থের 'দুই মুসাফির', 'শিকারী', 'ভ্রূণাঙ্ক' , *নেত্রপথ* গল্পগ্রন্থের 'একটি বহস', 'নেত্রপথ', 'হিংসাধার', 'দ্রব্যগুণ', 'ব্ল্যাক মার্কেট', 'শরিকান', 'জিহ্বাহীন', *উভশৃঙ্গ* গল্পগ্রন্থের 'জাতক কাহিনী' প্রভৃতি গল্প উল্লেখযোগ্য। "প্রতিটি গল্পের মধ্যে সময়ের নিখুঁত বিন্যাস এ জাতীয় গল্পের শিল্পসার্থকতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসেবে চিহ্নিত। যেমন, 'দুই মুসাফির' গল্পে সময়ের বিন্যাস দুপুর থেকে ভোর রাত পর্যন্ত, 'শিকারী' গল্পের পর্বকাল 'একবেলা', 'ভ্রূণাঙ্ক' গল্পে সময়ের ব্যাপ্তি 'অপারেশন টেবিলের অবস্থানকাল', 'উপলক্ষ্য' গল্পের সময় পরিসর দুই মিনিট, 'একটি বহস' গল্পের সীমাকাল 'সন্ধ্যা থেকে রাত', 'নেত্রপথ' গল্পের সময়ের ব্যাপ্তি 'দুপুর থেকে বিকেল', 'গিরগিটি' গল্পের 'একটি রাত', 'দ্রব্যগুণ' গল্পের পর্বকাল 'দেড় ঘন্টার', 'জাতক কাহিনী' গল্পের সময়সীমা 'চব্বিশ ঘন্টা'। এভাবে সময়ের নিখুঁত অনুভবময়তার চূড়ান্ত বিস্তার লাভ করেছে এ পর্বের গল্পে।[১১৩]

'নেত্রপথ' গল্পের উদাহরণ:

> সেদিন দুপুরের পরই অনেক দূর গিয়ে পড়েছিলাম। ঘন্টা দুই বাদ আবার নিজের আস্তানায় ফিরছি। একটা গরুর গাড়ী তখন শহরতলীর দিকে এগোচ্ছে।[১১৪]

যে সব গল্পে চরিত্রের দৃষ্টিকোণ ব্যবহৃত হয়ে চরিত্রের সাথে সাথে গল্পের পরিবেশও জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছে, সে সব গল্পের মধ্যে *নেত্রপথ* গল্পগ্রন্থের 'জনারণ্যে' গল্প অন্যতম। 'জনারণ্য' গল্প থেকে উদ্ধৃতি:

> সমাজ-শকটে আমার জায়গা ইন্টার ক্লাসে। একদম বাথরুমের কাছাকাছি। অর্থাৎ আমি নিম্ন-মধ্যবিত্ত। অবশ্যই ভদ্রলোক। আমার অফিসের মেজ-সেজো বড় সাহেবেরা কী মনে করেন জানি না। কিন্তু পিয়ন-সম্প্রদায় এবং আমার গ্রামের চাষিবাসি, মাঝিমাল্লা সকলে আমাকে মিয়া-সাহেব বলেই সম্বোধন করে। আমি ভদ্রলোক হোলেও আমার কিছু ভাণ-ভণ্ডামি আছে। আমাদের সাবেক জন্মদাতা ইংরেজ আমল থেকেই তা চলে আসছে। সুতরাং বেশী ফিরিস্তি দেওয়া বাহুল্য।[১১৫]

সাহিত্যের মানদন্ডে গল্পের নামকরণ গুরুত্বপূর্ণ। পাকিস্তান কালপর্বের গল্পে নামকরণের ক্ষেত্রে শওকত ওসমান রূপক-প্রতীকাশ্রয়ী। এ পর্বে রূপক-প্রতীকের আশ্রয়ে যে সব গল্পের নামকরণ করা হয়েছে

Dhaka University Institutional Repository

তার মধ্যে– *প্রস্তর ফলক* গল্পগ্রন্থের 'শিকারী', 'বর্ণামৃত', 'ভ্রুণাঙ্ক', 'দীক্ষায়ণ'. 'চূর্ণলয়', জিহ্বাহীন' এবং *নেত্রপথ* গল্পগ্রন্থের 'হিংসাধার', 'গিরগিট' প্রভৃতি গল্প উল্লেখযোগ্য। পাকিস্তান কালপর্বের চরিত্রায়ণের ক্ষেত্রেও শওকত ওসমান রূপক-প্রতীকের আশ্রয় নিয়েছেন। "এ পর্বে চরিত্রের বাহ্যজটিলতা অপেক্ষা স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষা-অন্তর্জটিলতার চিত্রই নানামাত্রিক আয়োজনে উপস্থাপিত। তাছাড়া বহির্বাস্তবতার সাথে অন্তর্বাস্তবতার রসায়ন এ পর্বের চরিত্রগুলোকে বিশিষ্ট করে তুলেছে।"[১১৬]

পাকিস্তান কালপর্বের চরিত্রসমূহ কুসংস্কার ও ধর্মব্যবসার নিষ্পষণে আলোড়িত ছিল। "এ পর্বের চরিত্রসমূহ পাকিস্তানি শোষকের নিষ্পেষণে পদদলিত কিন্তু দেশমাতৃকার স্বাধীনতা-চিন্তায় আন্দোলিত এবং স্বদেশভাবনায় অতন্দ্র প্রহরী।"[১১৭] এ সম্পর্কে চঞ্চল কুমার বোস বলেছেন:

> লেখকের এ-কালপর্বের চরিত্রায়ণরীতি সর্বতোভাবে প্রথাগত নয়। রূপকধর্মী চরিত্রের মাধ্যমে লেখক জীবনের গভীর দার্শনিক উপলব্ধিকে ব্যক্ত করেছেন, তেমনি সমাজের স্থবিরতা ও পচনশীলতাকে তীব্র শ্লেষবিদ্ধ করেছেন কোনো কোনো গল্পে।[১১৮]

প্রস্তর ফলক গল্পগ্রন্থের 'দুই মুসাফির', 'শিকারী', 'ভ্রুণাঙ্ক', *নেত্রপথ* গল্পগ্রন্থের 'চিড়িমার', 'জিহ্বাহীন' প্রভৃতি গল্পে উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।

'দুই মুসাফির' গল্পের চরিত্রকল্পনা রূপকধর্মী। "একদিকে পার্থিব বস্তুর অনিত্যতা ও তুচ্ছতা, অন্যদিকে বস্তুনিরপেক্ষ হৃদয়-সম্পদের নিত্যতা, অবিনশ্বরতা এই বিপ্রতীপ বোধের পার্থক্যকে গল্পকার দুটি কল্পিত চরিত্র সোব্হান জোয়ার্দার এবং লোকখ্যাত লালন ফকির চরিত্রের মাধ্যমে রূপদান করেছেন।"[১১৯] গল্পের শেষ পর্যায় লালন ফকিরের উক্তির মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে গল্পকারের নৈতিক দার্শনিকতা। গল্পে দেখা যায়, পৃথিবীতে সোব্হান জোয়ার্দরের অর্জন বস্তুগত এবং লালন ফকিরের অর্জন অবস্তুগত ছিল। সে কারণে সম্পত্তিলিপ্সু সোব্হান জোয়ার্দারকে লক্ষ করে লালন ফকির বলেছেন :

> দেখলে না? দেখলে না, একদিন তোমার কত কি, কত কে ছিল, আমার কিছুই ছিলনা। আজ আমার সব আছে-অথচ তোমার কিছুই নেই।[১২০]

জীবনের দার্শনিক মূল্যচেতনার পরিপ্রেক্ষিতে উপরিউক্ত চরিত্রদ্বয়ের পরিকল্পনা অভিনব।

Dhaka University Institutional Repository

'শিকারী' গল্পে গল্পকার শওকত ওসমান তাজু খান চরিত্র নির্মাণ করেছেন বিশেষ কৌশলে। "লেখকের সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যক্তির মনস্তাত্ত্বিক ও অবচেতনাগত নিগূঢ় সংকটের উন্মোচণ ঘটলেও চরিত্রের প্রেক্ষণবিন্দু স্বগতকথনের ভঙ্গিতে বিমিশ্র হয়েছে লেখকের সর্বজ্ঞতার সাথে।[১২১] 'শিকারী' গল্পে তাজু খান চরিত্র রূপায়ণে অবলম্বিত নাট্যরীতি ও আকস্মিকতা সমস্ত গল্পের পরিবেশনা সূত্রে বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠেছে। তাজু খান চরিত্র কল্পনায় এক ধরনের নিয়তি চেতনা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

'খুনীরা এইভাবে খুন হয়'[১২২] –তাজু খানের এই উক্তির মধ্য দিয়ে লেখকের এক বিশেষ অভিপ্রায় স্পষ্টতা পেয়েছে। প্রকৃতির সুখ ও সৌন্দর্য হরণকারীও একদিন প্রকৃতির অমোঘ বিধানে বিনষ্ট হয়, এ রকম এক তাত্ত্বিক বক্তব্যই যেন তাজু খান চরিত্রের মধ্য দিয়ে বিম্বিত হয়েছে। এ গল্পে নিজের গুলিতে তাজু খানের মৃত্যুকে দেখানো হয়েছে প্রতীকী অর্থে এবং পরিণামে তাজু খান চরিত্রটিও প্রতীকধর্মী হয়ে উঠেছে। যার কারণে এ চরিত্রের পরিণাম আকস্মিক হলেও তা ঘটনা-পরস্পরার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

'ভ্রূণাঙ্ক' গল্পের চরিত্রনির্মাণ কৌশলও ভিন্ন মাত্রিক। "মাতৃজঠর থেকে ভূমিষ্ঠ হয়নি, এমন এক সুপ্ত মানবভ্রূণ গল্পকারের অনিন্দ্য শিল্পকল্পনায় চরিত্রকল্প হয়ে উঠেছে। সমাজ-অস্বীকৃত এক অবৈধ সন্তানের তীব্র সামাজিক ও মানবিক অসহায়ত্ব উন্মোচনের মৌল অভীপ্সা থেকেই লেখক উত্তম পুরুষে কাহিনি বর্ণনা করেছেন।"[১২৩] এ গল্পে রাফেজা ও হাবিবের অসংযত প্রণয়ের প্রসূন সন্তানটির দায়ভার বহনে প্রত্যেকে অক্ষম। এরকম পরিস্থিতিতে সেই মানবভ্রূণই যেন প্রাজ্ঞ চরিত্রের ন্যায় উচ্চারণ করেছে প্রজ্ঞাময়বাণী। মানুষ ও মনুষ্যবিদ্বেষী সমাজের বিরুদ্ধে গর্ভস্থ শিশুর তীব্র ঘৃণা উচ্চারিত হয়েছে আবেগময় ভাষায় :

> তোমার সার্জেনকে বলো, তার সাঁড়াশিটা আরো জোরে বসিয়ে দিক্ আমার বক্ষতালু ছিন্নভিন্ন করে দিতে, মস্তিষ্কের সব-কোষ লন্ডভন্ড উপড়ে ফেলতে। আমার কোন দু:খ থাকবে না। তোমার মত আমারও অসংখ্য সান্ত্বনা তারই মধ্যে নিহিত। জীবন্ত মাংস আবার নিস্প্রাণ। যা-ই হোক, আমি আর তখন চেতনা সমন্বিত নরশিশু নই, তোমার সন্তানত নই-ই। আল্লাকে ধন্যবাদ, আমার এখনও জন্ম হয়নি।[১২৪]

এ গল্পে সমাজ-অস্বীকৃত এক অবৈধ সন্তানের তীব্র সামাজিক ও মানবিক অসহায়ত্ব উন্মোচনের আকাঙ্ক্ষা থেকেই যেন লেখক উত্তম পুরুষে কাহিনি বর্ণনা করেছেন। গল্পকারের অনবদ্য শিল্পনৈপূণ্যে মাতৃগর্ভস্থ শিশু-ভ্রূণটি শক্তিমান চরিত্রের মত উজ্জ্বল।

Dhaka University Institutional Repository

'আজব জীবিকা' গল্পে কাহিনী বর্ণিত হয়েছে উত্তম পুরুষের স্মৃতিচারী কথনে। উত্তম পুরুষ এ গল্পের কথক চরিত্র হলেও গল্পের মূল ঘটনা বিবৃত হয়েছে নফিস চরিত্রের উচ্চারণে। তেরশ' পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষের ইতিবৃত্ত বর্ণনায় লেখক উত্তম পুরুষের স্মৃতি ও অতীতমগ্নতার আশ্রয় নিয়েছেন:

> তেরশ' পঞ্চাশ বঙ্গীয় সন। মন্বন্তর থাবা মেলে মেলে নিঃশব্দে জনপদ গ্রাস করছে। তখনই এই জায়গায় মাত্র এক রাত্রির জন্যে আমি ঠেকে গিয়েছিলাম।...এইখানে বসে বসে দেখা যায়, দূরে জনপদের মেঠো পথ ধরে নরনারী শিশুর মিছিল অনবরত চলছে। শহরত আর শহর নেই। তখন চুম্বকে পরিণত হয়েছে। মানুষ আর মানুষ নেই। জড়, লোহা বা ঐ জাতীয় শক্ত নিরেট কিছু। মানুষকে তাই টানছে শহর-যেখানে বাঞ্ছাতরু চাল-ডাল সাজিয়ে রেখেছে। তার বেশী ত আর কারো কিছু প্রয়োজন নেই।[১২৫]

নফিসের উচ্চারণে ব্যক্ত হয়েছে দুর্ভিক্ষপীড়িত বুভুক্ষু নরনারীর আত্মহননের মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা। সমগ্র গল্পে বর্ণনার ক্ষেত্রে কোন বাহুল্য নেই, লেখক নফিসের মধ্যে নির্মাণ করেছেন জীবন-মৃত্যু সম্পর্কে নির্বিকার এক মানবমূর্তিকে।

'চিড়িমার' গল্পে সামরিক অক্টোপাশে বন্দি মানুষের অবরুদ্ধ চিত্রকে গল্পকার প্রতীক-আঙ্গিকে উপস্থাপন করেছেন। "লেখকের সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণে স্বৈরশাসনের শৃঙ্খলে বন্দি মানুষের যন্ত্রণার রূপকধর্মী চরিত্র হিসেবে 'গানের পাখি' (ডাহুক, ঘুঘু, শ্যামা, টিয়া, মণিয়া,কোকিল, দোয়েল) এবং শাসকশ্রেণির প্রতিনিধিত্বশীল চরিত্র হিসেবে 'চিড়িমার' (শিকারী) আত্মপ্রকাশ করেছে।"[১২৬] এ দুই প্রতীকী চরিত্র অর্থাৎ 'গানের পাখি' এবং 'চিড়িমার' চরিত্র চিত্রণের মাধ্যমে যথাক্রমে দেশপ্রেমিক মানুষ এবং নির্যাতনকারী শাসকশ্রেণির প্রতিনিধিদের রূপ উপস্থাপন করেছেন। গল্পের ভাষায়:

> এরা গান গাইলে, গান শুনে শুনে জঙ্গলের সমস্ত পাখি নড়েচড়ে, লাফালাফি করে। আমাদের তো ব্যবসা মাটি। তখন পাখি ধরব কি করে? তার আগে এগুলো ধরলাম।[১২৭]

শওকত ওসমান *নেত্রপথ* গল্পগ্রন্থের 'জিহ্বাহীন' গল্পে ভাষাহীনের মুখে ভাষা দিয়ে জটিল চরিত্র নির্মাণে রূপকধর্মিতার আশ্রয় নিয়েছেন। এ চরিত্রসৃষ্টিতে গল্পকার রূপকধর্মিতাকে উপজীব্য করে ভাষার গুরুত্ব বর্ণনা করেছেন। লেখকের সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণের সাথে চরিত্রের স্বগতকথন একীভূত হয়ে স্বতন্ত্র পরিচর্যারীতি লাভ করেছে। গল্পের ভাষায়:

Dhaka University Institutional Repository

ফিরিয়ে দাও আমার ভাষা। মহামানব সাগর সঙ্গম-তীর্থের পরিব্রাজক হোতে চাই। বিদ্যুতের মশাল সাহায্যে আমি চন্দ্রলোকের গিরি-গহ্বর জরিপ-প্রয়াসী। আমার ভাষা ফিরিয়ে দাও। আমি অশেষ। কিন্তু আমি অনিত্য। তাই আমি অনন্তের হাতে রাখী বন্ধনের দুঃসাহসী অভিযাত্রী। শুধু আমার ভাষা ফিরিয়ে দাও, ফিরিয়ে দাও...।[১২৮]

মানব চরিত্রসৃষ্টিতে শওকত ওসমান ছিলেন বহুদর্শী। অর্থাৎ তাঁর চোখে দেখা মানুষকে তাঁর গল্পের চরিত্রে রূপদান করতেন সার্থকভাবে। এ সম্পর্কে চঞ্চল কুমার বোস বলেন:

রক্তমাংসে নির্মিত অস্তিত্বশীল মানুষ তাঁর গল্পে ব্যঞ্জনাময় হয়ে উঠেছে। বিষয়-বৈচিত্র্য শওকত ওসমানের গল্পে বিভিন্ন মাত্রার চরিত্রসৃজনে সহায়ক হয়েছে। লোভে, ভোগে, ঈর্ষায় ও প্রতারণায় আলোড়িত যে মানুষ, বস্তুগত প্রাপ্তিতে যারা উন্মুখ–সেই বাসনা-প্রণোদিত মানুষ তাঁর গল্পে বিভিন্ন বর্ণে ও রেখায় চিত্রিত।[১২৯]

পাকিস্তান কালপর্বের গল্প নিম্নবিত্ত অর্থাৎ প্রান্তিক চরিত্র অঙ্কনে গল্পকার পূর্বের সেই ভিক্টোরীয় শিল্পাদর্শকে (চরিত্রকে সহানুভূতির আলোকে উপস্থাপন করা) আশ্রয় করেছেন। এ সব নিম্নবিত্ত চরিত্রে রয়েছে– নরসুন্দর, পালিশ মিস্ত্রী, কেরানি, চোর, ডাকাত, বারবণিতা, জেলে মাঝি, চা-বিক্রেতা প্রভৃতি। এ সব নিম্নবিত্ত চরিত্রগুলো ছিল স্বমহিমায় উজ্জ্বল।

প্রস্তর ফলক গ্রন্থের 'সেলুন' গল্পে নরসুন্দর গৌর হরি শীল এবং *নেত্রপথ* গ্রন্থের 'হিংসাধার' গল্পের পালিশ মিস্ত্রীর বিপর্যস্ত জীবনের কথা উত্তম পুরুষে চিত্রিত হয়েছে। মুলত গৌর হরি শীল এবং পালিশ মিস্ত্রী চরিত্র দুটি টাইপ চরিত্র বা এক রৈখিক চরিত্র। তবে গৌর হরি শীলের মধ্যে বিদ্যমান দৈশিক ভাবনা তার চরিত্রের একটি উজ্জ্বল দিক। অন্যদিকে 'হিংসাধার' গল্পে পালিশ মিস্ত্রী চরিত্রটি গল্পের পরিণতিতে দ্বিমাত্রিক চরিত্রে রূপলাভ করেছে। গল্পের ভাষায়:

হঠাৎ আমার চোখে পড়ল, চেয়ারের উপর একটা বড়বড়-লোম কুকুর শুয়ে শুয়ে বাইরের দিকে তাকাচ্ছে। দুই থাবার মধ্যে ভর দিয়ে মাথাটা উঁচু করে আছে প্রাণীটি। আমি সেই দিকে চেয়ে রইলাম। এই ঠাণ্ডায় শুকনা জায়গার মূল্য কত, আমি জানি। কুকুর বৃষ্টি দেখছে। আহ্, কত আরামে, কত, কত নিশ্চিন্তে। তখন আমার মনে হোলো, ওইখানে পৌঁছতে পারতাম।[১৩০]

পাকিস্তান কালপর্বের প্রান্তিক চরিত্র সৃষ্টিতে গল্পকার কথক চরিত্র এবং প্রান্তিক চরিত্রের দৃষ্টিকোণ ব্যবহার করেছেন। নিম্নবিত্ত বা প্রান্তিক চরিত্র সৃষ্টির মাধ্যমে তিনি তাদের জীবনচিত্র, সামাজিক ও অর্থনৈতিক

Dhaka University Institutional Repository

অবস্থা, আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং শ্রেণী অবস্থানকে চিত্রিত করেছেন। এ প্রসঙ্গে চঞ্চল কুমার বোস মন্তব্য করেছেন:

> শওকত ওসমানের গল্পে সমাজের আলোকিত স্তর থেকেই কেবল চরিত্রগুলো আসেনি, সমাজের অন্তর্গত অন্ধকার থেকেও নানা চরিত্রের মানুষের ভিড় করেছে তাঁর গল্পে। জীবনের কঙ্করময় কঠিন মৃত্তিকা ভেঙ্গে তারা দুঃখ-প্রহত জীবনের সঙ্গীত শোনায়, অভাবে-সংকটে তারা জীবনের ও অস্তিত্বের নিরাপত্তা খোঁজে।[১৩১]

প্রান্তিক চরিত্রসৃষ্টিতে শওকত ওসমান ছিলেন গ্রামীণজীবনাশ্রয়ী, অন্যদিকে মধ্যবিত্ত চরিত্রসৃষ্টিতে তিনি শহরমুখী। যে সব গল্পে মধ্যবিত্ত শ্রেণি-চরিত্রের সন্ধান পাওয়া যায় তার মধ্যে– *প্রস্তর ফলক* গল্পগ্রন্থের 'বর্ণামৃত', 'গন্তব্য','পিতাপুত্র', *নেত্রপথ* গ্রন্থের 'গিরগিট', 'সাবালক', 'পুরস্কার', 'শৃগালস্য', *উভশৃঙ্গ* গ্রন্থের 'বোন-বিবির কেচ্ছা', 'শকুনের চোখ' প্রভৃতি গল্প উল্লেখযোগ্য।

প্রস্তর ফলক গ্রন্থের 'পিতাপুত্র' গল্পে সুযোগসন্ধানী মধ্যবিত্ত চরিত্র অঙ্কন করেছেন– হাসিব সাহেব এবং তার পুত্রদের চরিত্র অঙ্কনের মাধ্যমে। নিজেদের সম্পত্তি রক্ষার জন্য হাসিব সাহেব এ গল্পে হীন কৌশলের আশ্রয় নিয়েছিলেন (বাড়ির চার কোণে চারটি কল্পিত কবর)। গল্পের ভাষায়:

> আব্বা তখন দুই পুত্রের চোখে চোখ রেখে, ঠোঁটে সরু হাসি ঝল্‌কিয়ে জবাব দিলেন, "তোদের বুদ্ধিতে কখনও সম্পত্তি টিক্‌বে? এখন বল, তোরা আমাকে পয়দা করেছিস, না আমি তোদের পয়দা করেছি?" হাসিনা বেগম স্বামীর দিকে চোরা চোখ ঠেরে মুখ টিপে উঠে গেলেন অন্য কামরার দিকে। তিন জনের হাসিতে আরো উচ্ছল হোয়ে উঠল বিকেলের পরিবেশ, ফিস্‌ফিস্ কণ্ঠে হাসিব সাহেব যখন যোগ করলেন, "শোন, কবর-টবর ও সব কিছু না। স্রেফ গুল্-নাম্বার ওয়ান,কাউকে বলিস্‌নে, খবরদার।"[১৩২]

পাকিস্তান কালপর্বের গল্পে শওকত ওসমান মধ্যবিত্ত শ্রেণি চরিত্রের সাথে সাথে মানুষ হিসেবে তাদের বিচিত্র মনোভঙ্গি তুলে ধরেছেন।

'শৃগালস্য' গল্পের ঘটনা বিন্যাস ও চরিত্র কল্পনায় লেখকের সরল প্রতীকতার প্রকাশ ঘটেছে। আলোচ্য গল্পের নামকরণের মধ্য দিয়ে এর প্রধান চরিত্র মনসুর আলির অন্তর্প্রকৃতি উন্মোচিত হয়েছে। গল্পের সূচনাতে লেখক বলেছেন:

Dhaka University Institutional Repository

শৃগাল ছাড়া পাড়াগাঁর কথা ভাবা যায় না। এই পন্ডিতপ্রবর শৈশবের রাত্রি কত রোমান্টিক না করে তোলে প্রহর ডাকে মুর্গী-চোরা ওস্তাদী গলায়। জুলুমে, শোভায় মেশানো এমন জন্তু পৃথিবীতে বিরল। শেয়ালপন্ডিতের কত গল্প না আপনারা জানেন। আমি লক্ষ টাকা বাজি ধরে বলতে পারি, নিম্নোক্ত কাহিনী কেউ কোন দিন শোনেন নি।[১৩৩]

আলোচ্য গল্পে মনসুর আলি যেন গল্পকথার 'শৃগাল পন্ডিত-কুমিরছানা উপাখ্যানের' কুমিরছানার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। মনসুর আলিকে এলাকার বিভিন্ন স্কুল যৎসামান্য অর্থের বিনিময়ে শিক্ষক হিসেবে ভাড়া নিয়ে যায়... উদ্দেশ্য সরকারী অনুদান পাওয়ার ক্ষেত্রে সুবিধে হওয়া। অথচ মনসুর আলির নিজের চাকরি হয় না কোথাও। কুমিরছানার মত তাকে শুধু ব্যবহার করা হয়। মনসুর চরিত্রের এই ভীরু বহুরুপী জীবনের রূপায়ণে লেখক প্রতীকী বর্ণনার আশ্রয় নিয়েছেন:

শৃগাল পন্ডিতের পাঠশালায় কুমীরের সাতটি ছানা। ছয়টি তো সে ছয় দিনে কাবার করিল। কুমীর পাঠশালা ও ছানা দেখিতে আসিল। শৃগাল অগত্যা কি করিবে? পন্ডিত কুমীরকে দূর হইতেই একটি ছানাকেই সাতবার করিয়া দেখাইল।[১৩৪]

'শৃগালস্য' গল্পে শিক্ষার দুবৃত্তায়ন এবং শিক্ষকের দৈন্যদশার কথা মনসুর আলি চরিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়েছে। এ সম্পর্কে অনীক মাহমুদ বলেন– "উভশৃঙ্গ গ্রন্থের 'শৃগালস্য' গল্পের মধ্যে মনসুর আলির বেকার জীবনের দুঃখময়তা এবং শৃগালস্য পাঠশালার পণ্ডিতদের অনৈতিক জীবনের একটি উদ্ভাসন ঘটেছে।"[১৩৫]

মনসুর আলি চরিত্রটির সরূপ তুরে ধরতে গিযে গল্পকার তার স্ত্রীর বক্তব্য তুলে ধরেছেন:

এই জমানায কত অযোগ্য, অক্ষম, চোর বদমাস কত কী হোয়ে গের এই সময় তোমার কিছু না হোলে আর ইহজন্মে কোন আশা নেই।[১৩৬]

পাকিস্তান কালপর্বের গল্পে শওকত ওসমান মধ্যবিত্ত শ্রেণি-চরিত্রের সাথে সাথে মানুষ হিসেবে তাদের বিচিত্র মনোভঙ্গি তুলে ধরেছেন।

পাকিস্তান কালপর্বের কিছু গল্পে উচ্চবিত্ত শ্রেণি-চরিত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। *নেত্রপথ* গ্রন্থের 'আপনি ও তুই' গল্পের অফিসার, 'খরচ তেরিজ' গল্পের সাহেব, 'গ্রেশামং শরণং' গল্পের সেক্রেটারি সাহেব, *উভশৃঙ্গ* গ্রন্থের 'সাহেবালি সাহেব' গল্পের সাহেবালি খান, 'দানসত্র' গল্পের কালাম মজুমদার উল্লেখযোগ্য চরিত্র।

Dhaka University Institutional Repository

'সাহেবালি সাহেব' গল্পে সাহেবালি খান চরিত্র রূপায়ণের মধ্য দিয়ে কলোনিয়াল সময়কেই বিম্বিত করা হয়েছে। সাহেবালির মত অনেকেই তৎকালীন সময়ে ব্রিটিশদের সঙ্গে সহযোগিতার মাধ্যমে প্রভূত যশ ও প্রতিপত্তির অধিকারী হয়েছিল। গল্পের অন্তিমে ইঙ্গিতময় উচ্চারণে সাহেবালি চরিত্রটির মৌল প্রকৃতি উন্মোচিত হয়েছে। ম্যাজিস্ট্রেট নর্টন বদলি হয়ে যাবার পর সাহেবালির 'শালা, পাগলা' উচ্চারণের মধ্য দিয়ে তার চরিত্রের শাণিত চাতুর্য ও উদ্দেশ্যসর্বস্বতা প্রকট হয়ে পড়েছে। সাহেবালি খানের চরিত্র-চিত্রণে স্বার্থ উদ্ধারের সাথে সাথে নৈতিক অধঃপতনের চিত্র তুলে ধরেছেন– যা ঐতিহাসিক যুগ-যন্ত্রণার প্রতিচ্ছবি।

শওকত ওসমান আমলাতান্ত্রিক শোষণের একটি প্রকৃষ্ট বিবরণ দিয়েছেন *নেত্রপথ* গ্রন্থের 'আপনি ও তুই' গল্পে। জেলাবোর্ডের সুপারিন্টেনডেন্ট ও একজন পিয়ন যাচ্ছিল বাসে চড়ে গ্রামে, পরস্পর পরিচয় ছিল না। সুপারিন্টেনডেন্ট ও পিয়ন ভিন্ন ভিন্ন শাখায় চাকুরি করে। পরস্পর পরিচয়ের পরেই সুপার সাহেব পিয়নকে 'তুই' সম্বোধনের দৌরাত্মে নিজের মাল গ্রামের রাস্তায় বহনের উপায় খুঁজে পায়। অন্যদিকে স্যারের উপকার করতে পারলে ধন্য হবে ভেবে পিয়নটা সুপারের ট্যাঙ্ক পাহারার কাজে মনোনিবেশ করে। এ গল্পে দেখা যায়, শোষক সুযোগ পেলেই তার সহজাত স্বভাবের ব্যবহার করে।

এক ভন্ড-দাতার চরিত্র উন্মোচিত হয়েছে *উভশৃঙ্গ* গ্রন্থের 'দানপত্র' গল্পে। ধনী কোটিপতি কালাম মজুমদার অভিনব প্রক্রিয়ায় দান করতে গিয়ে বহুলোকের প্রাণহানি ঘটায়। বিভিন্ন জাতের বেড়া দিয়ে এক মাঠের মধ্যে দান গ্রহণের ব্যবস্থা করেছিল মজুমদার। এক পয়সা থেকে হাজার টাকার নোট নিতে হলে ভিখিরিদের শক্ত কাঠের বেড়া ডিঙিয়ে ঘেরার মধ্যে প্রবেশ করে দান নিতে হবে। দান গ্রহণ শুরু হলে ভীড়ের জন্য বেড়ার ঘষায় রক্তাক্ত হয়ে অনেক ভিখিরি মারা গেল। বাস্তবত বাংলাদেশে দানের ক্ষেত্রে এরূপ ভণ্ডামি লক্ষ করা গেছে। এরূপ একটি ঘটনা ঘটেছিল ১৯৬০ এর দশকে একটি বিড়ি ফ্যাক্টরিতে দান নিতে গিয়ে তিনজন ভিখিরি মারা যায়। ১৯৯০-এ চট্টগ্রামের এই একই ফ্যাক্টরিতে যাকাতের টাকা নিতে গিয়ে ৩৬ জন ভিখিরির প্রাণহানি ঘটে। আহত হয় অনেকে। শওকত ওসমান কোটিপতি কালাম মজুমদারের মাধ্যমে এরূপ হটকারী দাতার চিত্র তুলে ধরেছেন।

প্রস্তর ফলক গল্পগ্রন্থের 'উভসঙ্গী', 'উদ্‌বৃত্ত', *উভশৃঙ্গ* গল্পগ্রন্থের 'সৌদামিনী মালো', 'রাতা' প্রভৃতি গল্পে নারি-চরিত্রের বহুমাত্রিক রূপ অঙ্কিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রস্তর ফলক গল্পগ্রন্থের 'উভসঙ্গী' গল্পে কুহেলী ও সেহেলী–দুই বান্ধবীর চরিত্র-চিত্রণের সাহায্যে কখনও চরিত্রের দৃষ্টিকোণ আবার কখনও সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণের ব্যহার হয়েছে সার্থকভাবে। কুহেলী ছিল জটিল এবং সেহেলী ছিল ফ্লাট চরিত্র। কুহেলী চরিত্রে লেখকের সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যক্তির মনস্তাত্ত্বিক সংকট উন্মোচিত হয়েছে– যার ফলে কুহেলীর স্বগতোক্তির মাধ্যমে তার চরিত্রের অন্তর্যন্ত্রণার হাহাকার উপলব্ধি করা যায়:

> হঠাৎ সে মুখ তুলেছিল আবার। তারপর ডুক্‌রানি থামিয়ে অর্ধ-চিৎকার–"সেহেলী,–সেহেলী-। ঝুট-ট্যুর-।" আয়নার দিকে সটান দৃষ্টি। তখন ক্রুর হাসি হেসে উঠেছিল কুহেলী দাঁতে দাঁতে চেপে-ট্যুর-। তোকে মিথ্যে বলেছি, সেহেলী।[১৩৭]

অন্যদিকে 'উদ্‌বৃত্ত' গল্পে আমিরণ চরিত্রটিকে– কখনও সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ থেকে, আবার কখনও স্বগতোক্তির মাধ্যমে গল্পকার এ চরিত্রের মনোজাগতিক জটিলতা উপস্থাপন করেছেন। গল্পে দেখা যায়, আমিরণের বাবা তাকে বলে– "বিদ্যাশে আল্লা যেন তরে দ্যাহে...।[১৩৮] কিন্তু পিতার এ আশীর্বাদ আমিরণের জীবনে বিপরীত ফল বয়ে নিয়ে আছে। গল্পের ভাষায়:

> আমাকে দেখার লোকের অভাব হয় না। সা'ব বাবু দালাল কন্ট্রাক্টার যাচনদার, বহু আছে আমার অভিভাবক। আছে বাদামতলীর রাজা পাটোয়ারী-শরীফার চোখ-ধরা সোন্দর শাড়ীটা যে কিনে দিয়েছিল। যে দেয়, নেওয়ার অধিকার তারই থাকে... সে ত বস্ত্র কেড়ে নিয়ে আমাকে রোজই দেখে। ঘন্টার পর ঘন্টা...।[১৩৯]

উভশৃঙ্গ গ্রন্থের 'সৌদামিনি মালো' গল্পে লেখকের সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ উদার মানবতাবাদী চেতনার প্রকাশ ঘটেছে। উত্তম পুরুষ কথক চরিত্রের ভূমিকা পালন করেছে এ গল্পে, যদিও গল্পের কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব সৌদামিনি মালো। সৌদামিনি মালো বস্তুত লেখকের অসাম্প্রদায়িক জীবনবোধের প্রতীক। "গল্পের প্রান্তিক পর্বে সৌদামিনি মালোর খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ, সমস্ত সম্পত্তি নিলামে উৎসর্গ, পালিত পুত্র হরিদাসের পলায়ন এবং বিকৃত মস্তিষ্ক হয়ে অল্পকালের মধ্যেই সৌদামিনির মৃত্যু প্রভৃতি ঘটনা অতি দ্রুত, আকস্মিকতাতাড়িত বলে মনে হয়। শিল্পের দৃষ্টিতে নিটোল মনে না হলেও গভীর মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে 'সৌদামিনি মালো' শওকত ওসমানের ছোটগাল্পিক শিল্পশক্তির পরিচায়ক।"[১৪০] মূলত সম্পত্তি নয়, সৌদামিনীর প্রবল মাতৃস্নেহ তার চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। গল্পের ভাষায়:

> সৌদামিনী প্রায় কাঁদত আর চীৎকার দিত। আমাকে ছেড়ে পালিয়ে গেল...। হে যিশু, ও হরি, হে আল্লা, আমার হরিদাসকে ফিরিয়ে দে– ফিরিয়ে দে।[১৪১]

Dhaka University Institutional Repository

উভশৃঙ্গ গল্পগ্রন্থে 'রাতা' গল্পে খাদ্য-সমস্যার মর্মস্পর্শী কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। করিমা বিবি নাতি সাজেদকে নিয়ে মেয়ের বাড়ি যাচ্ছিল। মেয়ের সংসারে দারিদ্র্য অভাব। অধিকন্তু দশ বার জন পোষ্য। তাই নিজের খরচ চালাবার জন্য একটি দুবছরের মোরগ সঙ্গে নিয়েছিল করিমা বিবি। একটি মাত্র রাত থাকবে মেয়ের বাড়িতে। মোরাগটির দাম ৩/৪ টাকা হলে দাদি নাতির খরচ চলে যাবে, কিন্তু পথিমধ্যে সাজেদের হাত থেকে পড়ে রাতাটি ঝিঙ্গে ক্ষেতে ঢোকে। কুঁচো ছেলেদের সহযোগে যখন ধরা পড়ল রাতাটি, তখন তার নাজেহাল দশা। কোন রকমে বটি দিয়ে জবাই করে করিমা বিবি মেয়ের বাড়ির দিকে অগ্রসর হয়। মেয়ের অবস্থা সম্পর্কে বৃদ্ধা নাতিকে বলে:

> হেরাও আমাগো লাহান গরীব, বাই। রাতাডা নইছিলাম। কোন মিয়া বাড়ি বেইচ্যা দু-তিন ট্যাহা পাইবো, আমাগোর খাওয়াইতে কোন তকলীফ অইবো না। মাইয়ার মুখডা দেইখ্যা আসা যাইব। কি অইল, দ্যাহো।[১৪২]

বড় করুণ, বেদনাদগ্ধ এই কাহিনী। গল্পকার 'রাতা' গল্পে দরিদ্র করিমা বিবি চরিত্রে বাস্তবতাবোধ ও মানবতাবোধের সমন্বয় ঘটিয়েছেন সার্থকভাবে এ সম্পর্কে চঞ্চল কুমার বোস বলেন:

> অভাব ও মাতৃত্বের বিপ্রতীপ টানাপড়েন অঙ্কিত এ চরিত্রটি লেখকের চরিত্রসৃজনে সামর্থের শিল্পসাক্ষ্য।[১৪৩]

'রাতা' গল্পে নিম্নবর্গীয় মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের বাস্তবচিত্র সার্থকভাবে উপস্থাপন করেছেন। গল্পকারের ভাষায়:

> নেশাগ্রস্ত জনের মত করিমা বিবি হঠাৎ বলে ফেলে : আজ আর বা'ত পাইবি না ফুফুর ঘরৎ। এত দেরী অইয়ে।
>
> –ক্যান।
>
> –হেরারও ত দিন চলে না। দশ বারো জন খাওয়াইয়া। খাওনের আগে গেলে কিছু থাইকত।
>
> –হের তরে আঁরে খালি তাড়াতাড়ি করতা কইছিলো।[১৪৪]

শওকত ওসমান পাকিস্তান কালপর্বের কিছু গল্পে কিশোর চরিত্র নির্মাণ করেছেন। এগুলোর মধ্যে *নেত্রপথ* গল্পগ্রন্থের 'বালকের মুখ'– গল্পটি উল্লেখযোগ্য। 'বালকের মুখ' গল্পে এক ছিন্নমূল বালক করমালির খাবার নিয়ে হাসাহাসির প্রসঙ্গ আছে। দশ বারো বছরের করমালি একটা মোটর কারখানার কর্মচারী। সে ছিল সরল প্রকৃতির। তার সরলতার সুযোগে রান্না করা মাংস শেষ হবার পর বাবুর্চি পাত্রে পানি দিয়েছে। মাংসের তেল ভেসে উঠেছে পানির উপরে। সরল করমালি ভেবেছে এটাই আসল তরকারি। সে রুটি দিয়ে তৃপ্তি সহকারে খেয়ে গল্পের কথককে বলেছে :

> একটু লবণ কম। নইলে খুব ভাল।[১৪৫]

Dhaka University Institutional Repository

এতে বোঝা যায় করমালির মাংস খাওয়ার কোন অভিজ্ঞতাই ছিলনা। গ্রাম বাংলা কেন, শহুরে ছিন্নমূল অধিবাসীরা স্বাস্থ্যসম্মত খাবার থেকে যুগ যুগ ধরে বঞ্চিত। এ সম্পর্কে চঞ্চল কুমার বোস বলেন:

> কিশোর চরিত্র উপস্থাপনের পরিপ্রেক্ষিতে রয়েছে গল্পকারের বিশেষ সামাজিক দৃষ্টিকোণ। এ চরিত্রগুলো প্রায়শ হয়ে উঠেছে সামাজিক অসঙ্গতিজাত অসহায়ত্বের দ্যোতক। অস্তিত্ব রক্ষায় তারা সংগ্রামশীল, বিরুদ্ধ পরিস্থিতিতে তারা সংকুচিত, শেকড়হীন।[১৪৬]

অসংখ্য চরিত্র অঙ্কনের মধ্যে কিশোর চরিত্র সৃষ্টিতে শওকত ওসমান শিল্পসফল। পঞ্চাশ-ষাটের দশক অর্থাৎ পাকিস্তান কালপর্বের গল্প বর্ণনার ক্ষেত্রে শওকত ওসমান উত্তম পুরুষ এবং কোন কোন গল্পে সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণের ব্যবহার করেছেন। এ পর্বে গল্পকার বহির্বাস্তবতা অপেক্ষা মনোবাস্তবতার প্রতিচ্ছবি পরিস্ফুটনে তৎপর ছিলেন এবং তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল শানিত এবং তীক্ষ্ণ। এ সম্পর্কে ড. আব্দুর রশিদ বলেন:

> ঘটনা অপেক্ষা ঘটনার পূর্ব এবং পরবর্তী প্রতিক্রিয়ার প্রতি গল্পকারের অভিনিবেশ ঐকান্তিক। মনোবাস্তবতার ক্ষেত্রে দৃষ্টিকোণের বহুকৌণিক ব্যবহার নতুন মাত্রা লাভ করেছে– যা লেখকের স্বতন্ত্রতার পরিচয়বাহী।[১৪৭]

ষাট-সত্তর দশকের গল্পকারদের গল্পরচনার ধারা সম্পর্কে চঞ্চল কুমার বোস বলেন:

> বাংলা কথাসাহিত্যের ধারায় ষাট-সত্তর দশকের গল্পকারেরা সময়ের বাস্তবতায় নিরীক্ষার আড়ালে প্রতিবাস্তবতাকে নির্মাণ করেছেন তাদের গল্পের পরোক্ষ পদ্ধতিতে। পূর্ববর্তী দশকের গল্পকারদের নিরূপিত সীমানা প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে এ-দশকের গল্পকাররা পরিবর্তমান সমাজপ্রেক্ষিতের, রাজনৈতিক বাস্তবতার বিপ্রতীপে নির্মাণ করতে চাইলেন অনন্য গল্পভাষা।...সমকালীন অবরুদ্ধ পরিস্থিতি গল্পকারদের নতুন আঙ্গিক নিরীক্ষায় যেমন উদ্বুদ্ধ করে তেমনি বিশ্বসাহিত্যের নানামুখী প্রভাব ও প্রণোদনা এই সময়ের গল্পকারদের শিল্প-অন্বেষাকে আন্তর্জাতিকতায় উন্নীত করে।[১৪৮]

পাকিস্তান কালপর্বে শওকত ওসমান রূপকধর্মিতাকে অবলম্বন করে যে সব গল্প রচনা করেছেন, সেগুলোর মধ্যে *প্রস্তর ফলক* গল্পগ্রন্থের 'শিকারী', 'ভ্রুণাঙ্ক', 'দীক্ষায়ণ', 'গোরনিদ্রা' এবং *নেত্রপথ* গল্পগ্রন্থের 'চিড়িমার' উল্লেখযোগ্য।

দেশভাগের পর নব্য পাকিস্তান রাষ্ট্রে শওকত ওসমান বাংলাদেশের সমকালীন সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতি উপলব্ধি করে রূপক-প্রতীকধর্মিতাকে অবলম্বন করে তাঁর গল্পের বিষয়কে উপস্থাপন করেছেন সার্থকভাবে। মানবমুখী লেখক শওকত ওসমান নিপীড়ক-শাসকের বিরুদ্ধে যথার্থ প্রতীক ব্যবহার করেছেন গল্পের চরিত্র বিন্যাসে– যার ফলে গল্পের অন্তর্গত চরিত্রসমূহ তীব্র সংবেদনা নিয়ে উপস্থিত হয়। যেমন, "*প্রস্তর*

Dhaka University Institutional Repository

ফলক গল্পগ্রন্থের 'শিকারী' গল্পে তাজু খানের নিজের গুলিতে নিজের মৃত্যুবরণ পাকিস্তানি সরকারের আত্মঘাতী সিদ্ধান্তের পরিণতির ইঙ্গিত বহন করে। 'ভুণাঙ্ক' গল্পে অপারেশন টেবিলে ভূমিষ্ঠ হয়নি– এমন এক মানব ভ্রুণের আর্তচিৎকারের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয়কে ব্যঞ্জিত করেছে। 'দীক্ষায়ণ' গল্পে রাতের আঁধারে বলপূর্বক 'ছাগল-ভেড়াকে' মদ খাওয়ানোর মধ্যে পাকিস্তানি রাষ্ট্রের নিয়ম-কানুনকে পদদলিত করার চিত্র প্রকাশিত। 'গোরনিদ্রা' গল্পে 'মৃত লাশ' এর জেগে ওঠার মধ্য দিয়ে বাঙালি শোষক-শ্রেণির বিরুদ্ধে জেগে ওঠার প্রত্যয় উপস্থাপিত।"[১৪৯]

'শিকারী' গল্প থেকে উদ্ধৃতি :

> তাজু খান ঘৃষ্টস্বরে হঠাৎ উচ্চারণ করল, The murderer is murdered thus. খুনীরা এইভাবে খুন হয়। তারপর পাঁজরের এক-পাশ, যেখানে হাত-মুঠি ছিল, খুলে দিলে। দু'-ঝলক রক্ত বেরিয়ে এলো। অতঃপর তাজু খানের বিরাট কদ্ এক ঈষৎ ঝাঁকুনির পর নিথর হোয়ে গেলে। পাশে পড়ে রইল রক্তমাখা বন্দুকটা।[১৫০]

এ কাল পর্বের অধিকাংশ গল্পে শওকত ওসমান উত্তম পুরুষ বা কথক চরিত্রের ব্যবহারের মাধ্যমে নাটকীয় চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করেছেন। *প্রস্তর ফলক* গ্রন্থের 'দীক্ষায়ণ' গল্পে উত্তম পুরুষের ব্যবহার উদ্ধৃত হল:

> মটোরে একমাত্র ড্রাইভার ছাড়া আমরা আর সকলে নেশায় চুর ছিলাম। ফুর্তির আসরে অনেক কিসিমের চিড়িয়া জোটে। তখন বাছ-বিচার অন্যায়।...আমরা পাঁচজন জুটেছিলাম। জন দুই ত ঠিক গোত্রের নয়। তবু তারা ছিল, যেমন তেলের সংগে জল। কিন্তু নেশার অথৈ সমুদ্রে কখন আমরা একাকার হোয়ে গেছি, তার খেয়াল ছিল না।[১৫১]

উত্তম পুরুষের দৃষ্টিকোণের সাথে চরিত্রের দৃষ্টিকোণের সংযোগ ঘটায় *উভশৃঙ্গ* গ্রন্থের 'সৌদামিনী মালো' গল্পে চরম নাটকীয়তা সৃষ্টি হয়েছে। গল্পের ভাষায়:

> কিন্তু সৌদামিনী মালো বাপের বেটী, বাঘের দুধ খেয়েই বোধ হয় মানুষ– বেরিয়ে এল একদম নিরস্ত্র, যদিও বাড়িতে বন্দুক আছে। কিন্তু জনতার সামনে সে এবার বোমা ফাটালে। বোমাও বোধ হয় এত শব্দ তুলতে পারত না। সৌদামিনীর চোখ থেকে শিবের মত আগুন ছড়িয়ে বললে...কি বললে শোন। তার কথাটা মুখ জবানি পেশ করতে হয়। সৌদামিনীর উপর তখন যেন কিছু ভর করেছিল।
>
> "...শোন্ অভাগীর ব্যাটারা, ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠিরের দল...আমার হরিদাস শুদ্রও নয়, ব্রাহ্মণও নয়। শোন্, কী।...ওর আসল বাবা লুঙ্গিপরা দাড়িওয়ালা চাষী...আমার হরিদাস মুসলমান।"[১৫২]

শওকত ওসমান তাঁর কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যকে তুলে ধরতে রূপক-প্রতীকের অন্তরালে নাটকীয় পরিচর্যার আশ্রয় নিয়েছেন। এ ধরণের গল্পের মধ্যে– *প্রস্তর ফলক* গ্রন্থের 'দুই মুসাফির', 'শিকারী', 'ভ্রুণাঙ্ক', *নেত্রপথ*

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থের 'আনারকলি', 'আপনি ও তুই', 'তস্কর সঙ্গীত' প্রভৃতি গল্প উল্লেখযোগ্য। 'দুই মুসাফির' গল্প থেকে উদ্ধৃতি:

> পড়ন্ত দুপুর। রৌদ্রের রিমঝিম উত্তাপ সুরের মোচড়ে মূর্ছনার সঙ্গ-অভিলাশী। বায়ু-তরঙ্গ সকলের বক্ষ– সৈকতে সুরাবেশে বারবার আছড়ে পড়ে।
>
> অনেক লোক জমেছে ইত্যবসরে। সুরের ইন্দ্রজালে কাজ ফেলে এসেছে কতজন। ছোটখাট জমায়েৎ পাড়ের উপর। স্তম্ভিত শ্রোতাদল।
>
> সোলেমান মল্লিক গান থামার পর জিজ্ঞেস করে, জনাব, আপনার– বেয়াদবী মাফ করবেন– আপনার নাম?
>
> –আমার নাম লালন ফকীর।
>
> –কুষ্টিয়ার লালন ফকীর?
>
> –হ্যাঁ, ভাই।
>
> গ্রামের জমায়েৎ লোকদের মধ্যে গুঞ্জন ওঠে। একজন চিৎকার দিয়ে গ্রামের দিকে ছুটতে লাগল, ওরে কে কোথা আছিস। লালন ফকীর ফিরে এসেছেন, ওরে আয়। গান শুন্‌বি। আয় চোখ সার্থক করবি-আয় আয়...।
>
> বিলম্ব হয় না। দলে দলে লোক জুটতে লাগল। ফকীর বিস্মিত।[১৫৩]

'ব্ল্যাক আউট' গল্পে তেরশ' পঞ্চাশের মন্বন্তরে গ্রাম থেকে শহরে আসা নিরন্ন এক যুবতীর নিরস্তিত্ববোধ উত্তম পুরুষের পরিশীলিত উচ্চারণে বর্ণিত হয়েছে। আলোচ্য গল্পে সময়ই হয়ে উঠেছে চরিত্রের প্রতিরূপক। পঞ্চাশের মন্বন্তরে বাংলার অসংখ্য নরনারী করূণ মৃত্যু বরণ করে। নারীর সম্ভ্রম পরিণত হয় সুলভ পণ্যে। চারদিকে মৃত্যুর বিভীষিকা। শওকত ওসমান দুর্ভিক্ষের এই ভয়াল রূপ চিত্রণে যে পরিচর্যারীতির আশ্রয় নিয়েছেন তা চিত্রকল্পময়:

> মৃত্যু তখন কঙ্কাল রূপে লাঠি হাতে ঘুরে বেড়াত, বেড়াত পথে-ঘাটে, মাঠে, শহরের ফুটপাথে অলিতে গলিতে। হাহাকার হাহাকার করে বেড়াত চারদিকে। শুনতে পাওয়া যেত শুধু কান্নার রোল। তারপর তাও ধীরে ধীরে কমতে লাগল। কারণ, কাঁদার জন্যে গলা, গলা লাগে, তাগদ লাগে। তা ফুরিয়ে যাচ্ছে, কান্নাও কমে আসতে লাগল। ধুঁকে ধুঁকে যেটুকু কাঁদা যায়, তা-ই শেষ আশ্রয়। নাকও বেশী দিন সাহায্য করে না। নাকী কান্না হয়ত তবুও বেঁচে ছিল। চারিদিকে কেবল মৃত্যুর প্রতীক্ষা।[১৫৪]

উত্তম পুরুষের বর্ণনার সঙ্গে চরিত্রের সংলাপ সম্পৃক্ত হয়েছে গল্পে, বর্ণনার বাহুল্য নেই, ইঙ্গিতময় উচ্চারণে লেখক গল্পের নিরন্নময় যুবতীটির দেহদানের কথা প্রস্ফুট করেছেন, কিন্তু কোথাও কোন অতিশয়োক্তি নেই। এই বাক্-সংক্ষিপ্তি ও পরিমিতিজ্ঞান শওকত ওসমানের ছোটগাল্পিক শক্তির পরিচায়ক। এ পর্বের কিছু গল্পে নিম্নবিত্ত মানুষের জীবনকাহিনি উপস্থাপনে গল্পকার বিবরণধর্মিতাকে পরিচর্যায় বেছে নিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তান কালপর্বে গল্পকার শওকত ওসমান তাঁর গল্পের ভাষা ব্যবহারে সচেতন ছিলেন। বিষয় অনুযায়ী তিনি গল্পের ভাষারীতির সন্ধান করেছেন– এক্ষেত্রে তিনি তাঁর নিজস্ব মেজাজ মর্জি দ্বারা পরিচালিত। এ পর্বের সাতানব্বইটি গল্পের কাহিনি বর্ণনা করেছেন চলিত ভাষারীতিতে। মূলত চলিত ভাষা রীতিতে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। শওকত ওসমানের ভাষা সম্পর্কে অনীক মাহমুদ মন্তব্য করেন:

(ক) তাঁর কথাসাহিত্যের ভাষা একাধারে বৈদগ্ধ্যপূর্ণ ও অলঙ্কারবহুল। তাঁর বাক্য কখন সরল, কখনবা জটিল ও চাতুর্যপূর্ণ। বিষয় ও বর্ণনার প্রয়োজনে শব্দ নিয়ে তিনি ইচ্ছে মত খেলতে পারেন। শব্দধানুকী কবিত্বপূর্ণ মনোযোগ থাকায় তাঁর বাককুশলতা গল্প-শরীরে প্রকাশমান। [১৫৫]

(খ) তবে, "এ ধরনের বৈশিষ্ট্য-চিহ্নিত ভাষা ব্যবহারকে সাধারণত এপিগ্রামধর্মী ভাষার বা রচনার অন্তর্ভূক্ত করা যায়। এপিগ্রাম ভাষায় বাক্য অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, বুদ্ধিদীপ্ত, ব্যঙ্গাত্মক, প্রশংসাসূচক অথবা জ্ঞানগর্ভ হয়ে থাকে।"[১৫৬]

প্রস্তর ফলক গ্রন্থের 'শিকারী', 'ভ্রুণাঙ্ক' প্রভৃতি গল্পে– এ জাতীয় এপিগ্রাম রচনার বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান:

(ক) তোমার সঙ্গে কথা-শিকার চলে, পাখি শিকার হয় না।[১৫৭]

(খ) কুয়াসা স্বরূপ চত্বর আমার চেতনার এই প্রত্যুষ-বেলা ঝাপসা রেখায় কল্পনার মতো চঞ্চল।[১৫৮]

এ পর্বের কিছু গল্পে আরবি-ফারসি-উর্দু-হিন্দি-ইংরেজি শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। গল্পের পরিবেশ এবং চরিত্রের বাস্তবরূপ দিতে গল্পকার এ সব শব্দ ব্যবহার করেছেন। এ জাতীয় গল্পের মধ্যে *নেত্রপথ* গ্রন্থের 'একটি বহস' এবং *উভশৃঙ্গ* গ্রন্থের 'চিড়িয়া' উল্লেখযোগ্য। 'একটি বহস' এবং 'চিড়িয়া' গল্প থেকে উদ্ধৃতি:

(ক) হুজুর আপলোগ হামারা তো বিশ রুপেয়া ফাইন কিয়া, উধার হামারা দোস্ত লোগ তো সব খা লেগা।[১৫৯]

(খ) হামরা এক ভি জরুরত নেহি।
আমি আরো অবকা!
কিউ নেহি?
মেরা চিড়িয়া ত দেখ লিয়া।[১৬০]

এ কালপর্বে গল্পে চলিত ভাষার ব্যবহার করলেও প্রয়োজন অনুসারে চরিত্রের বিন্যাসে উপভাষা বা আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার করেছেন। *প্রস্তর ফলক* গ্রন্থের 'আজব জীবিকা', 'উদ্‌বৃত্ত', *উভশৃঙ্গ* গ্রন্থের 'রাতা' গল্পে উপভাষার ব্যবহার দেখা যায়:

Dhaka University Institutional Repository

(ক) নদীর পানিতে ব্যুৎ ঠান্ডা লাইগ্‌গে, সাব একডা বিডি দিতে ফারেন নি।[১৬১]

(খ) আহা, মাইয়াডা বড় বালা মাইয়া ছিল। কহতে হব দরিয়ার লাহান ভাসাইয়া নিলো। আর আমিরণ, তর দুলী-ভৈন, দুই দাদা ত কবে মরেছে। কহতের পর ফিরা আইছিল তহন নিলো ব্যারামে আজরাইলে। কহতে নিলে ত বালাই ছিল।... কুলিজা ছিঁইড়া নিছে, আমারডাও নিতো। হেতে আর কওয়ার কিছু ছিল না। আল্লা আশা দিয়া নইরাশ কইল্লেন।[১৬২]

(গ) –বজ্জাৎ রাতা, হের লাইগ্যা এ্যাডে রাখার মন চায় না।
–হব বুঝেছি, দাদী। হ্যাডে জবাই করবা। হের তরে লইয়া যাওনের চাও।...
–খালি হাথৎ মেহমান (অতিথি) যাওণ বালা (ভালো) না। মানুষে কইব কি?...
তাগোরে দিয়া আইবা? হে করতা দিতাম নঅ।[১৬৩]

কবিতা রচনার ন্যায় উপমা, উৎপ্রেক্ষা, সমাসোক্তি অলঙ্কারের ব্যবহারও শওকত ওসমান এ পর্বের গল্পে সার্থকভাবে করেছেন। *প্রস্তর ফলক* গল্পগ্রন্থের 'ভ্রুণাঙ্ক', 'শিকারী', 'দুই মুসাফির' প্রভৃতি গল্প থেকে উপমার উদাহরণ দেয়া হল:

(ক) রক্ত-ঝালর লালিম হে বন্ধনের এই আবেশে আমি কি তবে নিস্তব্ধ?...কুয়াসা স্বরূপ চত্বর আমার চেতনার এই প্রত্যুষ-বেলা ঝাপ্‌সা রেখায় কল্পনার মত চঞ্চল। [১৬৪]

(খ) পারে পারে বনানী-সংঘ নিরেট সবুজে, সিলুয়েটে, ফিকে দুরত্বচকিত তনিমা-শ্বেতে, কৃষ্ণচুড়ার লালে আপন অস্তিত্ব– ঘোষক।[১৬৫]

(গ) নির্জন মাঠ সুরের ঝর্ণাধারাথেকে পানীয় ঠোঁটে নিয়ে, তৃষ্ণা মেটায়। দাবদাহ দূরে সরে যায়।[১৬৬]

প্রস্তর ফলক গল্পগ্রন্থের 'দুই মুসাফির', 'উভসঙ্গী' প্রভৃতি গল্প থেকে উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কারের উদাহরণ দেয়া হল:

(ক) সুরের মোড়কে পৃথিবী যেন শরণার্থী।[১৬৭]

(খ) দেহ থেকে সে যেন সাত-সাত বছর এখনি ঝেড়ে ফেলবে, উপরের পলিমাটি সরিয়ে খুঁজে বের করবে প্রাক্তন জমিন।[১৬৮]

'শিকারী' গল্পে সমাসোক্তি অলঙ্কারের ব্যবহার দেখা যায়:

Dhaka University Institutional Repository

তারপর অনন্তঃ থৈ থৈ টল্‌টলে কাল্‌চে নীল পানির রাজত্ব– যেখানে আকাশ সাঁতার কাটার লোভে হাঁটুজলেও উপুড়; চোখ অনাবিলতার সান্নিধ্যে উদাসীন হোয়ে পড়ে।[১৬৯]

ছোটগল্প রচনার ক্ষেত্রে শওকত ওসমান ছিলেন প্রগতিশীল এবং তাঁর সৃষ্টিধারাও ছিল অবিরাম অব্যাহত। ব্রিটিশ কালপর্বের গল্পের বিষয়ভাবনা থেকে পাকিস্তান কালপর্বের বিষয়ভাবনায় নতুনত্বের সন্ধান করেছেন– যার ফলে এ পর্বের গল্পের শিল্পকৌশল বা আঙ্গিকেও নতুনত্ব এসেছিল। এ সম্পর্কে রফিকউল্লাহ খান মন্তব্য করেন:

সমাজবিকাশ-প্রক্রিয়ার বহুভুজ জটিলতা শিল্পীর আত্মপ্রকাশকেও করেছে তার অনুগামী। ব্যক্তি ও অস্তিত্বের বহুমুখী সংকটে বাংলাদেশের শিল্পচিত্ত হয়ে উঠেছে উদ্বেগাকুল, জাতিসত্তার প্রশ্নে সতর্ক সন্ধানী এবং অভীপ্সার বিচিত্র রূপকল্প সৃজনে ঐকান্তিক। সমাজজীবনের অন্তর-বাহিরের বৈপরীত্যময় সত্যের সমগ্রতা সন্ধানের মধ্যে নিহিত রয়েছে। এ পর্যায়ে রচিত ছোটগল্পের বিষয় ও শিল্পরীতির বৈশিষ্ট্য।[১৭০]

শওকত ওসমান ছিলেন ক্রম-রূপান্তরিত শিল্পী। সমাজ-সময় ও রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে তিনি নতুন বিষয় ও চিন্তাকে আত্মস্থ করে সাহিত্য রচনায় অগ্রসর হয়েছেন। ব্রিটিশ কালপর্বে ঔপনিবেশিক শোষণে নিস্পেষিত মানুষের জীবন-ধারাকে কেন্দ্র করে গল্প রচনা করেছেন। আবার পাকিস্তান কালপর্বে দেশভাগের যন্ত্রনায় কাতর মানুষের চিন্তা চেতনা তাঁর সাহিত্যে রূপলাভ করেছে। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সফলতার মধ্য দিয়ে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটেছিল। "বাংলাদেশের জন্ম–স্বাধীন সার্বভৌম নিজ দেশের জন্য জল-স্থল-অন্তরীক্ষে সর্বাত্মক মরণপণ যুদ্ধ এবং মানুষের মৃত্যু লেখকদের অভিজ্ঞতায় এনে দিয়েছে গুণগত পরিবর্তন। আবার স্বাধীনতা-পরবর্তী মানুষের আশাভঙ্গ, শাসক দলের ব্যর্থতা, দুর্ভিক্ষ, সামরিক অভ্যুত্থান, সামাজিক মেরুকরণ পাল্টে দেয় লেখকচৈতন্য।"[১৭১]

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড তথা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্মম হত্যাকাণ্ড এবং হত্যাকাণ্ড পরবর্তী সামরিক শাসনের কালো ছায়া রাষ্ট্রযন্ত্রকে জটিল করে তুলেছিল। "গোটা আশির দশক জুড়ে দেশে স্বৈরাচার প্রতিষ্ঠিত ছিল। নিপীড়ন ও লুণ্ঠন নিয়মে পরিণত হয়। মিলিটারী ও শাসক গোষ্ঠীর নানা রকম উৎপীড়নে সাধারণ মানুষ ছাড়াও শিল্পী সাহিত্যিকদের স্বাধীনতার কলম অনেকটাই ছিল রুদ্ধ হয়ে। ...লেখকদের অধিকাংশই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই প্রতিরোধে সামিল হয়েছিলেন। এইরকম প্রতিবন্ধক অবস্থাতেও তাদের লেখাতে পলায়নী মনোবৃত্তি নেই।"[১৭২] রাষ্টব্যবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে বাংলাদেশের কথাসাহিত্যের বিষয়-আঙ্গিক তথা সাহিত্যিকদের দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন এসেছিল– যার ফলে

Dhaka University Institutional Repository

নবীন লোকদের পাশাপাশি চল্লিশ-পঞ্চাশ দশকের প্রবীণ লেখকেরাও নতুন শিল্প-আঙ্গিকের আশ্রয়ে গল্প রচনায় মনোনিবেশ করেন। এ সম্পর্কে চঞ্চল কুমার বোস বলেন:

> উদ্ধত সামরিক দানবের নৃশংস ভ্রকুটির ভয়ে লেখকদের আড়াল খুঁজতে হয়েছে। ফলে তারা প্রথাগত বর্ণনার চেয়ে প্রতিরূপকী আশ্রয়ে গল্পরচনায় অগ্রসর হয়েছেন। চল্লিশের গল্প লেখা শুরু করলেও আশির দশকে এসেও যিনি সমানভাবে সমাজচৈতন্যের অগ্রসর রূপকার ছিলেন এবং খোলামেলা চোখে প্রত্যক্ষ করেছেন রাষ্ট্রের উপর সামরিক জান্তার নগ্ন আগ্রাসন, তিনি হলেন বাংলাদেশের সাহিত্যের অন্যতম পুরোধা শওকত ওসমান।[১৭৩]

১৯৭১ সালের মুক্তিসংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধোত্তরকালের চেতনা গল্পকারের বিষয়ভাবনা ও শিল্পরীতির ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করেছিল। "এ পর্বে গল্প-শরীর আরও বেশি সংক্ষিপ্ত হয়ে এসেছে। জীবনের খণ্ড খণ্ড মুহূর্ত, মানুষের খণ্ড খণ্ড বিশ্বাস, ইতিহাসের অলিগলি, রাষ্ট্রযন্ত্রের খণ্ড খণ্ড ঘটনাপুঞ্জকে তিনি ছোটগল্পের শিল্প-শরীরে বেধেঁ দিয়েছেন। গল্পকার তাঁর এ পর্বের গল্পে প্রথাগত জীবনবোধ, আধুনিক জীবনপ্রবাহকে যেমন তুলে এনেছেন, তেমনি সেই জীবনের ভালো-মন্দ, হিংসা-বিদ্বেষ, ত্রুটি-বিচ্যুতি নানা অভিঘাতে পর্যুদস্ত মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্ত-প্রান্তিক মানুষের জীবনচিত্রের রূপায়ণও ঘটিয়েছেন।"[১৭৪]

শওকত ওসমানের পর্যবেক্ষণশক্তি ঔচিত্যবোধ এবং সচেতন বর্ণনা কৌশল তাঁর ছোটগল্পের কাহিনি বিন্যাসে মূখ্য হয়ে উঠেছে। এ বিষয়ে রফিকউল্লাহ খান মন্তব্য করেন:

> শৈল্পিক সৃজন-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সামাজিক দায়িত্বচেতনার সমন্বয় তাঁর অধিকাংশ রচনার বৈশিষ্ট্য। সৃজনশীলতার এবং মননশীলতার মাত্রাগত পার্থক্য তাঁর সাহিত্যকর্মে নতুন তাৎপর্যে অভিব্যক্ত হয়েছে।[১৭৫]

সত্তরের দশকে প্রকাশিত *জন্ম যদি তব বঙ্গে* (১৯৭৫), *এবং তিন মির্জা* (১৯৮৬) এবং *ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী* (১৯৯০) গ্রন্থে শওকত ওসমান একাত্তর-পরবর্তী সময়কে প্রত্যক্ষ করেছেন। "একাত্তরের স্বাধীনতা সংগ্রাম বাঙালি জাতির সার্বিক মুক্তি আকাঙ্ক্ষার দ্যোতক। *জন্ম যদি তব বঙ্গে* গ্রন্থে মুক্তিযুদ্ধের বীরত্বব্যজক লড়াই এবং স্বাধীনতাকে কেন্দ্র করে বাঙালির বিপুল স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণা শিল্পরূপ লাভ করেছে। *জন্ম যদি তব বঙ্গে* গ্রন্থের 'রক্তচিহ্ন', 'জননী : জন্মভূমি', 'ক্ষমাবর্তী' প্রভৃতি গল্পে মুক্তিযুদ্ধে বাঙালির অপরিসীম আত্মত্যাগ, ব্যাপক প্রাণহানি এবং তাঁদের গৌরবময় বীরত্বের কথা মুখ্য হয়ে উঠেছে।"[১৭৬] শওকত ওসমান বাংলাদেশ কালপর্বে রচিত গল্পে কাহিনিবিণ্যাসে রূপক-প্রতীকধর্মী, ঘটনাধর্মী, নাট্যিক-কাব্যিক পরিচর্যা, শানিত ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের প্রয়োগ করেছেন যথার্থভাবে। বাংলাদেশ কালপর্বের ঊনপঞ্চাশটি গল্পের মধ্যে অধিকাংশ গল্পে ফ্ল্যাশব্যাক রীতির ব্যবহার করেছেন। এ সম্পর্কে চঞ্চল কুমার বোস বলেন:

Dhaka University Institutional Repository

ফ্ল্যাশব্যাক বা বিপ্রতীপতা উদঘাটনরীতিতে তিনি অতীতের ঘটনাপুঞ্জকে বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে রূপদান করেছেন। কেন্দ্রীয় বা প্রান্তিক, চরিত্রের অন্তর্ময় অনুভবে, কখনোবা লেখকের সর্বজ্ঞ বর্ণনায় উপস্থাপিত হয়েছে বিগত ঘটনাপুঞ্জ, অভিজ্ঞতা, চেতনা বা মনোজাগতিক স্তর।[১৭৭]

এ পর্বে গল্পকার যে সব গল্পে ফ্ল্যাশব্যাক রীতির ব্যবহার করেছেন সেগুলোর মধ্যে– *জন্ম যদি তব বঙ্গে* গ্রন্থের 'ক্ষমাবর্তী', 'ভারতীয় গোয়েন্দা', 'ওয়াগন ব্রেকার', *এবং তিন মির্জা* গ্রন্থের 'তিনমির্জা', 'দ্বিতীয় অভিসার', 'দম্পতি', 'ন্যায়-অন্যায়', *মনিব ও তাহার কুকুর* গ্রন্থের 'গ্রহচ্যুত', 'গোয়েন্দা কাহিনীর খসড়া' প্রভৃতি গল্প উল্লেখযোগ্য। 'ভারতীয় গোয়েন্দা' এবং 'তিন মির্জা' গল্পে গল্পকারের ফ্ল্যাশব্যাক রীতির নমুনা:

(ক) ঘটনাটা ঘটেছিল খ্রিষ্টীয় ১৯৬৫ সনে হিন্দুস্থান-পাকিস্তান যুদ্ধের সময়। ঠিক আট বছর পূর্বে।[১৭৮]

(খ) এক শ' আঠাশ বছর পূর্বে সিপাহী বিদ্রোহ তখন শেষ হওয়ার পথে। ইংরেজদের সুগঠিত, বিন্যস্ত সেনাবাহিনীর সামনে শেষ পর্যন্ত দেশী ফৌজ টিকে থাকতে পারেনি।[১৭৯]

শওকত ওসমান বাংলাদেশ কালপর্বের গল্পে চরিত্র নির্মাণে চিত্রাত্মক পরিচর্যারীতি, সংকেতময়তাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। এ পর্বে "শওকত ওসমানের মানবচৈতন্য ও সমাজচৈতন্যের সন্ধিবিন্দু তাঁর সৃষ্ট চরিত্রসমগ্র, দৈনন্দিনতার অপরিমার্জিত প্রকাশে তারা রূপময়।"[১৮০] গল্পে চরিত্রের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া অর্থাৎ মানসদ্বন্দ্বটি প্রাধান্য পেয়েছে। আর এ-দ্বন্দ্বের মূলে ছিল দেশপ্রেম। যার কারণে প্রতীকী ভাবনায় এবং দৈশিকচেতনার আলোকে ব্যক্তির অন্তঃস্বরূপ প্রস্ফুটিত হয়েছে। শওকত ওসমানের এ পর্বের অধিকাংশ গল্পের চরিত্র সম্পর্কে চঞ্চল কুমার বোস মন্তব্য করেন:

চরিত্রসমূহ একাত্তরের ঐতিহাসিক মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিকায় রচিত। বাংলাদেশ নামক স্বাধীন ভূখণ্ডের জন্ম-যন্ত্রণার রক্তিম লাবণ্যে গল্পের চরিত্রগুলো সজীব। কাল্পনিক নয়, বরং গল্পের চরিত্রগুলো অভিজ্ঞতা-নির্ভর সৃষ্টি। উত্তম পুরুষে অধিকাংশ গল্পের কাহিনি বিবৃত হওয়ায় একাত্তরের ভয়াবহ আতঙ্ক জীবন্ত হয়ে উঠেছে, চরিত্রের মর্মান্তিক নিগ্রহভোগের সঙ্গে মুহূর্তেই পাঠককুল হয়ে উঠেছে অনুভূতিবিজড়িত। বিচিত্র ঘটনা ও অভিজ্ঞতার ফ্রেমে শওকত ওসমান এ গ্রন্থের মানুষগুলোকে চিত্রিত করেছেন।[১৮১]

জন্ম যদি তব বঙ্গে গ্রন্থের 'আলোক অন্বেষা', 'রক্তচিহ্ন', 'সারেঙ সুখানী', 'বারুদের গন্ধ লোবানের ধোঁয়া', 'দুই ব্রিগেডিয়ার', 'জন্ম যদি তব বঙ্গে', *এবং তিন মির্জা* গ্রন্থের 'তিন মির্জা' গল্পের চরিত্রসমূহ ছিল দ্বন্দ্ব-জটিল এক সময়ের সন্তান।

Dhaka University Institutional Repository

'আলোক অন্বেষা' গল্পের কেন্দ্রিয় চরিত্র সালামৎ আলি একটি জটিল চরিত্র। গল্পকার সালামৎ আলির আত্মগত চিন্তাপ্রবাহে মুক্তিযুদ্ধের পরিবেশকে ব্যঞ্জয় করে তুলেছেন। বর্বর পাকিস্তানি সৈন্যদের নারকীয় অত্যাচারে জর্জরিত সালামৎ আলি চরিত্রের মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া উন্মোচণে নাটকীয় পরিচর্যার সাথে বিশ্লেষণাত্মক পরিচর্যা ব্যবহৃত হয়েছে:

> দুশমনের কাছ থেকে করুণা ভিক্ষা করো না, হয় ধ্বংস করো অথবা ধ্বংস হও।[১৮২]

গল্পকার 'রক্তচিহ্ন' গল্পের নাজেম চরিত্রের মনোজাগতিক আলোড়ন এবং চিন্তা, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে ভীতিগ্রস্ত মানুষের মধ্যে আশাবাদী চেতনা জাগাতে চেয়েছেন। চরিত্রের স্বগতোক্তি নাটকীয়তা এবং বিশ্লেষণাত্মক পরিচর্যার মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন:

> গ্রাম জেগে উঠুক, গ্রামের মানুষের ধড়ে প্রাণ ফিরে আসুক। আসুক অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, মায়া-মহব্বত...সবই পুড়ে গেছে দারিদ্র্যের আগুনে। সেই আগুন নিভাতেই ত নাজেম ঘরছাড়া হয়েছিল, নিজের গ্রামছাড়া হয়েছিল। সে ত গ্রাম গড়ে তুরতে চায়...ধ্বংস করার জন্যে তার জন্ম হয়নি।[১৮৩]

'সারেঙ সুখানী' গল্পের কেন্দ্রিয় চরিত্র সোলেমান সারেঙের চরিত্র রূপায়ণে লেখক প্রতীকী ব্যঞ্জনার আশ্রয় নিয়েছেন এবং তাকে ভীতিশূন্য চরিত্রে রূপদান করেছেন। মূলত সমগ্র গল্পটি চিত্রিত করেছেন সোলেমান সারেঙের দৃষ্টিকোণ থেকে। গল্প থেকে উদ্ধৃতি:

> ঝাঁপিয়ে পড়ার পর বাংলার নদী কিছুক্ষণ আলিঙ্গনে আলিঙ্গনে সারেঙকে নিয়ে লোফালোফি করেছিল, যখন লাল হয়ে উঠেছিল পানির সমতল প্রৌঢ় মানুষের রক্তে। একসময় তলিযে যেতে হয় সমস্ত বারিরাশির স্নেহের ভিতর, যখন নির্বাত হয়ে আসে অতলান্ত মেঘনার অন্তর্জগত। তারই মধ্যে ধরা দেওয়ার পূর্বে সোলেমান সারেঙের বুকে পরিতৃপ্তির ঘনঘটা, ঠোঁটে হাসির আচড় লেগেছিল বইকি: আর ঈষৎ সময়, থোড়া রক্ত।[১৮৪]

এছাড়া *এবং তিন মির্জা* গ্রন্থের 'তিন মির্জা' গল্পের– মির্জা হায়দার, মির্জা আলি আনোয়ার ও মির্জা আলি আশরার, *ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী* গ্রন্থের 'জনপদে' গল্পের জগদীশ প্রভৃতি চরিত্র দেশ মাতৃকার মুক্তির লক্ষ্যে যে আত্মত্যাগ করেছেন তা ইতিহাস সম্পৃক্ত। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আন্দোলন-সংঘাতের মাধ্যমে এসব চরিত্রের রূপায়ণ যথার্থ হয়েছে এবং চরিত্রগুলো ইতিহাস ও সাহিত্যে স্থান লাভ করেছে।

অন্যদিকে বাংলাদেশ কালপর্বের নারী চরিত্রগুলোর মধ্যে ব্যক্তিত্বের বিকাশ লক্ষ করা যায়। এ সম্পর্কে অনীক মাহমুদ-এর মন্তব্য:

Dhaka University Institutional Repository

স্বাধীনতা পরবর্তীকালে নারীদের বলিষ্ঠ ও ব্যক্তিত্বপূর্ণ উপস্থাপন লক্ষ করা যায়।...'পিতৃপুরুষের পাপের' লালবানু, 'দ্বিতীয় অভিসার' গল্পের মাজু প্রভৃতি নারীরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে এবং প্রতিবাদ করেছে। অর্থাৎ উপজীব্যের ক্ষেত্রে যেমন শওকত কথাসাহিত্যের ক্রমবিকাশ আছে, চরিত্রচিত্রণের ক্ষেত্রেও তার উত্তরণমুখী প্রবণতা লক্ষ করা যায়।[১৮৫]

বাংলাদেশ কালপর্বের যে সব গল্পে নারী চরিত্রের উজ্জ্বল উপস্থিতি লক্ষ করা যায়– সেগুলোর মধ্যে *জন্ম যদি তব বঙ্গে* গ্রন্থের 'ক্ষমাবতী', 'জননী : জন্মভূমি', *এবং তিন মির্জা* গ্রন্থের 'দ্বিতীয় অভিসার', *ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী* গ্রন্থের 'স্বৈরিণী' গল্পগুলোর নাম উল্লেখযোগ্য।

'ক্ষমাবতী' গল্পে দেখা যায়, পাকিস্তানি সেনা কর্তৃক নারীর চূড়ান্ত সম্ভ্রমহানি, অত্যাচারের নির্মমতায় তহমিনা নামের মেয়েটি বাকরুদ্ধ হয়ে যায় এবং তহমিনা তার অশুচি শরীর নিয়ে আর বাঁচতে চায়নি– লেখক বহির্বাস্তবের সংকেতময় ব্যবহারে ব্যক্ত করেছেন। অন্যদিকে গোমতী নদীতে তহমিনার আত্মবিসর্জনকে নাটকীয় রীতিতে বিন্যাস করেছেন। এ সম্পর্কে চঞ্চল কুমার বোস অভিমত প্রকাশ করেছেন:

তার এই বিপন্ন জীবনের গোপন যন্ত্রণা উন্মোচনে লেখক স্বভাবতই মিতকথনের আশ্রয় নিয়েছেন। এক নিবিড় নৈঃশব্দের পরিপ্রেক্ষিতে অঙ্কিত চরিত্রটি মূলত ব্যঞ্জনাময়। তার আত্মহননের ঘটনাটিও স্কেচধর্মী, ঘটনার অনুষঙ্গে উন্মোচিত।[১৮৬]

'জননী : জন্মভূমি' গল্পেও পাকসেনা কর্তৃক একই সাথে কসিমন বিবি, আলিমন বিবি ও খাতু বিবির সম্ভ্রমহানির বিষয়টি চিত্রিত হয়েছে। গল্পের শেষ পর্যায়ে, ছেলের সমান বয়সী পাকসেনাদের নির্মম পাশবিকতার শিকার হওয়া চরিত্রসমূহের পরিমাণ বহির্বাস্তবের সংকেতময় ব্যবহারে গল্পকার চিত্রিত করেছেন:

আর এ ত তল্লাশী নয়, স্রেফ ভাঙ্গো মিস্‌মার করো। পরিত্যক্ত মাটির হাঁড়িগুলো পর্যন্ত রেহাই পেলে না। টিনের ঘর মুখ থুবড়ে পড়ল। পরে, যার খুশী এসব টেনে নিয়ে যাক। অবিশ্যি সেদিন মিলিটারীরা, জানি না, কী যেন ভেবে কোথাও আগুন লাগায়নি।...স্তব্ধ বৃদ্ধা যাদুকরের মন্ত্রচালিত যেন কোন পুতুল। ঘরের ভেতরে আর্তনাদ উঠেছিল বৈকি। অসহায়ের এই আর্তনাদ নতুন নয় পৃথিবীতে।[১৮৭]

'দ্বিতীয় অভিসার' গল্পে গল্পকার পাকিস্তানি সেনাদের প্রতি সম্ভ্রমহারানো নারী তথা এদেশবাসীর চরম ঘৃণা প্রদর্শনের চিত্র রূপায়িত করেছেন মাজু চরিত্রের দ্বন্দ্ব-জটিল চরিত্রাঙ্কনের মাধ্যমে। সম্ভ্রম হারানো নারী মাজু চরিত্রের অভিশপ্ত সন্তানের প্রতি সুপ্ত ভালোবাসা আবার নিজের অতীতের তিক্ত অভিজ্ঞতা– এ দু'য়ে মিলে

Dhaka University Institutional Repository

মাজুকে দিশেহারা করে তোলে। "মাজু চরিত্রের নির্মেদ কাঠামোতে শওকত ওসমান নির্যাতিতা বাঙালি নারীর চরম আত্মদানকে চিত্রিত করেছেন।"[১৮৮]

অর্থাৎ দ্বিতীয় বারের মত রাতের অভিসারিকা হয়ে তার নবজাতক সন্তানকে ধলেশ্বরী নদীর পানিতে বিসর্জন দেওয়ার মধ্যে– মাজু চরিত্রের তীব্র নির্দয়-আকাঙ্ক্ষা, মাতৃহৃদয়ের আকুলতা এবং চারিত্রিক দৃঢ়তা প্রকাশ পেয়েছে। গল্পকারের ভাষায়:

> পৃথিবী তখন তুমুল চীৎকার জুড়েছিল।
> ...মাজু পুঁটলি বুকে, মাটির উপর বসে পড়ে ডুকরে উঠছিল। কান্না, গোঙ্গানি, কথা তখন একত্র জড়িত।
> ...পৃথিবী ও প্রসূতি তখন নিঃশব্দ।
> বোবা স্তব্ধতা দিকচক্রবাল পর্যন্ত বিস্তৃত, নদীর দৌরাত্ম্য বাদ দিলে।
> মাজু ধীরে ধীরে উঠে পড়ল।
> ...জলের প্রহারে ধস নামার পূর্বেই মাজু উপর থেকেই তার পৃথিবী ধসিয়ে দিলে।[১৮৯]

উপরিউক্ত গল্পে গল্পকার বাঙালি নারীর তীব্র মানসিক শক্তিকে তুলে ধরেছেন। পাকসেনাদের বিরুদ্ধে ঘৃণার কাছে মাতৃত্বেরও পরাজয় ঘটেছে। মূলত কলঙ্কমুক্ত মাতৃত্বের বিজয় দেখিয়েছেন। অন্যদিকে *ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী* গ্রন্থের 'কুটিলা ভবেৎ' এবং 'স্বৈরিণী' গল্পে নারী জীবনের স্বপ্নভঙ্গ এবং অচরিতার্থ বাসনার শিল্পিত প্রকাশ ঘটেছে।

বাংলাদেশ কালপর্বের নিম্নবিত্ত চরিত্রাঙ্কনে গল্পকার ভিক্টোরীয় রীতি অনুসরণ করেছেন। এক্ষেত্রে চরিত্র অপেক্ষা তাদের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে গুরুত্ব দিয়েছেন। এ সব চরিত্রের মধ্যে 'ক্ষমাবতী' গল্পের তমিজ মিয়া, 'জনপদে' গল্পের সুবল মাঝি, 'জন্ম যদি তব বঙ্গে' গল্পের নামহীন বৃদ্ধ বাঙালি স্বদেশ প্রেমিক উল্লেখযোগ্য। এছাড়া শওকত ওসমান এ পর্বে একাধিক উচ্চবিত্ত শ্রেণি-চরিত্র সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে গুরুত্ব দিয়েছেন। "গল্পকারের বর্ণনায়– 'মনিব ও তাহার কুকুর' গল্পের রাজপুরুষ, 'গোয়েন্দা কাহিনীর খসড়া' গল্পে নারী লোলুপ আলী খান বর্ণনসূত্রে উপস্থাপিত, 'রত্নাকর : একটি উপন্যাসের খসড়া' গল্পের ধনাঢ্য ব্যবসায়ী হালেক চৌধুরী প্রতারণা এবং অবৈধ পন্থায় সম্পদের পাহাড় গড়েন। অপরদিকে 'গ্রহচ্যুত' গল্পের মিরাজ সরকার, 'ধর্মের দোহাই জবর' গল্পের আত্মস্বার্থ চরিতার্থকারী ইঞ্জিনিয়ার মিস্টার নাগ ও নারীলোভী এ্যান্টনী রিচার্ডসন, 'অসংখ্য শিকড় দুর্বার' গল্পের ব্যবসায়ী মিনহাজ সাহেব, 'স্বৈরিণী' গল্পের কুবাদ চৌধুরী

Dhaka University Institutional Repository

স্বার্থবুদ্ধি দ্বারা চালিত। এছাড়াও 'কেন মৌন' (*ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী*) গল্পে মোবেদ মজুমদারকে গল্পকার দেশপ্রেমহীন এক জড় পদার্থের মানুষ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।"[১৯০]

প্রতীকী গল্পের মধ্যে 'ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী' গল্পটি শিল্পসফল। "আশির দশকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে এক ভয়ঙ্কর দুর্যোগ নেমে আসে। বাংলাদেশের দুর্বল অপুষ্ট গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে উর্দিধারী সামরিক বাহিনী রাষ্ট্র ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করে। সর্বত্র আধিপত্য করে সেনাশাসনের কালো ছায়া। সামরিক একনায়কের একচ্ছত্র শাসনে সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে বাংলাদেশ।"[১৯১]

মুরারি চরিত্রের মাধ্যমে আশির দশকের ভয়াল স্বৈরাচারী শাসন ও সামরিক প্রভুর অন্তিম পরিণতিকে চিত্রিত করা হয়েছে– "কোন দাঁতালো শুয়রের চারণ-ভূমিতে মুরারি অনধিকার প্রবশ করতে গিয়েছিল। জন্তু তাকে আদৌ শ্রদ্ধা দেখায়নি।"[১৯২] মূলত মরারির নির্দয় মৃত্যুর মধ্য দিয়ে ঊনিশ'শ নব্বইয়ে স্বৈরাচারী সামরিক একনায়কের পতনকেই প্রতীকায়িত করা হয়েছে।

শওকত ওসমান বাংলাদেশ কালপর্বের গল্পে উচ্চবিত্ত চরিত্র অপেক্ষা নিম্নবিত্ত চরিত্র অঙ্কনে বেশী শিল্পসফল। এছাড়াও দৈশিক ভাবনায় উজ্জীবিত। অর্থাৎ দেশপ্রেমিক চরিত্রগুলো অঙ্কনে সার্থকতার দাবীদার। এ প্রসঙ্গে চঞ্চল কুমার বোস মন্তব্য করেন:

জীবনের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশে চরিত্রসমূহ অকৃত্রিম।...শওকত ওসমান সমাজ ও সমকালের গভীবে শেকড় সঞ্চার করে পুনর্জাত হয়েছেন; প্রতীকী চরিত্রের অনুষঙ্গে তুলে এনেছেন সমকালীন বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক বাস্তবতা। চরিত্রনির্মাণ প্রশ্নে শওকত ওসমান রূপান্তরশীল, ক্রমবিকাশধর্মী। প্রথম পর্যায়ের চরিত্রসমগ্রে বিদ্যমান আবেগময়তা ক্রমশ পরিশীলিত হয়েছে নাগরিক মননে।...তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলো শাশ্বত মানবিকতার অমলিন দ্যুতি। চল্লিশের দশক থেকে জীবনের যে পাঠ উৎকীর্ণ হয়েছে তাঁর গল্পে, নব্বই-এর দশকের অন্তিম পর্যায়ে এসেও সে জীবন শতধারায়, শতবর্ণে উৎসারিত।[১৯৩]

শওকত ওসমানের সমকাল ভাবনায় তাঁর বাংলাদেশ কালপর্বের গল্পগুলো শিল্পসফল। এ পর্বে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল তীক্ষ্ণ এবং পরিশীলিত। বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধ এবং দেশপ্রেমমূলক গল্পগুলো কখনও উত্তম পুরুষের দৃষ্টিকোণে, আবার কখনও সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণের আলোকে উপস্থাপিত। এ বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন গল্পের মধ্যে– *জন্ম যদি তব বঙ্গে* গ্রন্থের 'আলোক-অন্বেষা', 'বারুদের গন্ধ লোবানের ধোঁয়া', 'সারেঙ সুখানী', 'বার্তাবহ', 'জন্ম যদি তব বঙ্গে', 'রক্তচিহ্ন', 'ক্ষমাবতী', 'জননী : জন্মভূমি' *এবং তিন মির্জা* গ্রন্থের 'তিন

Dhaka University Institutional Repository

মির্জা', 'দ্বিতীয় অভিসার', *পুরাতন খঞ্জর* গ্রন্থের 'নিজের লাশ লইয়া' প্রভৃতি গল্প উল্লেখযোগ্য। 'জন্ম যদি তব বঙ্গে'– গল্প থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া হল:

> একটু দাঁড়াও, পথিক। দেখছ না মাটির ভেতর থেকে আমার মুঠি বাঁধা হাত উঁচিয়ে আছে। মাত্র কব্জি পর্যন্ত। মাংস ত নেই। কাকের ঠোকরে শেষ। সাদা হাড়, মাটির রঙের সঙ্গে মিলে গেছে, কারো চোখে পড়বে না সহজে। তুমি শুধু দেখে যাও। নেকড়ের পালে পড়ে আমি আমার শেষ প্রতিবাদ রেখে গেছি বাইরের জগতে। আমার মুঠি হাত, দ্যাখো, দ্যাখো।
>
> তুমিও দুশমনকে আঘাত দিতে হাত মুষ্ঠিবদ্ধ করো। একটু দাঁড়াও।
>
> দেখে যাও, জন্ম যদি তব বঙ্গে।[১৯৪]

'জন্ম যদি তব বঙ্গে' গল্পে গল্পকার সংগ্রামশীল জীবনচেতনার রূপায়ণ করতে গিয়ে চরিত্রের দৃষ্টিকোণকে গল্পের দৃষ্টিকোণ হিসেবে ব্যবহার করেছেন। 'মনিব ও তাহার কুকুর', 'ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী' প্রভৃতি গল্পসমূহ এ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। অন্যদিকে চরিত্রের দৃষ্টিকোণের সাথে সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণের সমন্বয় সাধন করে কিছু গল্প পরিবেশন করেছেন। সে-গুলোর মধ্যে *জন্ম যদি তব বঙ্গে* গল্পগ্রন্থের 'ভারতীয় গোয়েন্দা', 'দুই ব্রিগেডিয়ার', 'ওয়াগন ব্রেকার', *এবং তিন মির্জা* গ্রন্থের 'ফয়সালা', 'শেষ আগে শুরু হয়', 'দম্পতি', 'দ্বিতীয় অভিসার' প্রভৃতি গল্প উল্লেখযোগ্য। এ বৈশিষ্ট্যের কারণে গল্পের আখ্যানভাগ হয়ে ওঠে নাটকীয়। 'ওয়াগন ব্রেকার' গল্প থেকে উদ্ধৃতি:

> নির্জন কবরস্থান। সকালবেলা। তারা দুই জনে হাঁটছিল।
>
> ...সকালবেলা খবরের কাগজ দেখে আমার সন্দেহ হোলো। পুলিশের যা খবর– দিনের দুপুরে মিলের বেতন আনছিল গাড়ী করে– তার উপর অমন জায়গায় হামলা কম দুঃসাহস নয়। তিনজনই পুলিশের গুলিতে নিহত।
>
> ...অমন বুকের পাটা আর কার হবে। মাইন পোঁতার সময় যা কাণ্ড কারখানা করত– মরণ নিয়ে যেন তার খেলা করা অভ্যাস। পুলিশের রিপোর্টে কপালে কাটা দাগের কথা ছিল। তখন মানুষ চিনতে আর আমার দেরী হয়নি। আমি ত আপনাদের গাঁয়ের ঠিকানা জানিনে। নচেৎ আমিই খবর দিতে যেতাম। খবরের কাগজটা আমার– গিয়াস হঠাৎ থেমে গিয়েছিল।
>
> – "কেন এমন হলো, বাবা?" বৃদ্ধ প্রায় ডুকরে ওঠেন।
>
> – "চাচা, বেওয়ারিশ লাশের কবর এখানে। আপনি আর কাঁদবেন না। যুদ্ধের কাজ ত ফুরিয়ে গেছে। তাই এখন আমরা বেওয়ারিশ।[১৯৫]

শওকত ওসমান কিছু গল্পকে চরিত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রতীকায়িত করেছেন অর্থাৎ চরিত্রের আত্মকথার মাধ্যমে গল্পের অবয়ব নির্মাণ করেছেন। *জন্ম যদি তব বঙ্গে* গ্রন্থের 'জন্ম যদি তব বঙ্গে', *পুরাতন*

Dhaka University Institutional Repository

খঞ্জর গ্রন্থের 'নিজের লাশ লইয়া' এবং *ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী* গ্রন্থের 'অনন্ত বাসর' প্রভৃতি গল্পসমূহ এ বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করে আছে। 'অনন্ত বাসর' গল্প থেকে উদ্ধৃতি দেয়া হল:

> এতক্ষণ ভুল চিন্তায় বুঁদ ছিলাম। চোরের সঙ্গে আড়ি করে বাসন না কিনে মাটির উপর ভাত তরকারি ঢেলে খেতে যাচ্ছিলাম। আর না, আর না...।
>
> ...শিশি থেকে সমস্ত স্লিপিং নিজের তালুর উপর ঢেলে বললে, এগুলোর ব্যবস্থা হওয়া দরকার।...এগুলো গুমুতের সমান-এগুলো যারা খায় তারা অন্য কিছু খায় না।
>
> ...বিজয়িনীর মত সে স্বতঃস্ফূর্ত উচ্চারণ করে, এগুলো কমোডের খোরাক–কমোডের আহার্য।...ঝোঁকের মাথায় কী করতে না বসেছিলাম। জানোয়ারের সঙ্গে মানুষের বাজি ধরা উচিত নয়। মানুষের জন্যে তা সাজে না।[১৯৬]

ব্রিটিশ এবং পাকিস্তান কালপর্বের গল্পে ব্যবহৃত বর্ণনাধর্মিতা বাংলাদেশ কালপর্বে এসে প্রতীকধর্মিতায় রূপান্তরিত হয়েছে শওকত ওসমানের ছোটগল্পে। চঞ্চল কুমার বোসের মন্তব্য:

> পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে প্রতীকের সরলায়িত ব্যবহার লক্ষ করা গেলেও স্বাধীনতা-উত্তর ছোটগল্পে প্রতীক মূলত মননস্পর্শী হয়ে ওঠে। আশির দশকের ছোটগল্পে প্রতীকের সুক্ষ্মব্যঞ্জনাধর্মী প্রকাশে শওকত ওসমানের নাম সর্বাগ্রে উচ্চারিত।[১৯৭]

বাংলাদেশ কালপর্বে যে সব গল্পে প্রতীকী পরিচর্যা ফুটে উঠেছে সে গুলোর মধ্যে *জন্ম যদি তব বঙ্গে* গ্রন্থের 'বার্তাবহ', 'জন্ম যদি তব বঙ্গে', *এবং তিন মির্জা* গ্রন্থের 'দ্বিতীয় অভিসার', *পুরাতন খঞ্জর* গ্রন্থের 'নিজের লাশ লইয়া', *ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী* গ্রন্থের 'কুটিলা ভবেৎ' প্রভৃতি গল্প উল্লেখযোগ্য। 'নিজের লাশ লইয়া' গল্পটিতে উত্তম পুরুষের বর্ণনায় গল্পের কাহিনি প্রতীকী ব্যঞ্জনায় উপস্থাপিত। গল্পের কথক ১৯৭১ সালে–বুলেটে নিহত কোন আততায়ীর শিকার, নিজের লাশ বহন করে এমন এক স্থানে উপস্থিত হন, যেখানে আরও অনেকে তার মতো করে নিজের লাশ বহন করে চলেছে। হঠাৎ তাঁর কানে এক মায়ের আর্তনাদ ভেসে আসে– "পুত্র, আমাকে বাঁচাও, বাঁচাও।" মূলত এখানে গল্পকার উত্তম পুরুষ কংকাল-এর মাধ্যমে মা অর্থাৎ দেশকে বাঁচানোর কর্তব্যবোধ প্রতীকের মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন। এ দেশের বীর সন্তানেরা দানব পশুদের শিক্ষা দিয়েছেন– যার প্রমাণ ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর অর্থাৎ বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয়। গল্পকার গল্পের পরিণতিতে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বিজয়-কীর্তন করেছেন:

> আমি একা দাঁড়িয়ে আছি। জীবিত।
>
> উপলব্ধি করলাম, আমি রক্ত-বীজ। আমি মৃত্যুহীন।[১৯৮]

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়া আরও কিছু গল্পে গল্পকার একই সাথে নাটকীয়তা, আবেগধর্মিতা, ঘটনা প্রবাহের মাধ্যমে গল্পের প্লট নির্মাণ করেছেন এবং এর মাধ্যমে গল্পের বাস্তবতাকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছেন। এ বৈশিষ্ট্যের আলোকে যে সব গল্প বর্ণনা করেছেন সে গুলোর মধ্যে *জন্ম যদি তব বঙ্গে* গ্রন্থের 'বারুদের গন্ধ লোবানের ধোঁয়া', 'সারেঙ সুখানী', 'বার্তাবহ', 'রক্তচিহ্ন', 'ওয়াগন বেকার', *এবং তিন মির্জা* গ্রন্থের 'তিন মির্জা', 'ফয়সালা', 'দ্বিতীয় অভিসার', *ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী* গ্রন্থের 'ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী' প্রভৃতি গল্প অন্যতম। 'বার্তাবহ' এবং 'সারেঙ সুখানী' থেকে উদ্ধৃতি:

(ক) সে ভেসে চলেছে।

দুটো গহনার নৌকার দাঁড়ি-মাঝি সামান্য দূরে হাল-বৈঠা ছেড়ে মাথা নীচু করে চুপ!

জানাজা শেষ হযে গেছে।

...পিছু পিছু তারা হাঁটছে, যেন গোরস্থান পর্যন্ত এই ভাবে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাবে।

কাফেলা ক্রমশ বাড়তে লাগল।

ঘাট থেকে মাঠ থেকে যে-যেখানে থেকে পারে ছুটে আসছে। আব্রুভীতু গৃহবধু এগিয়ে আসছে ঘোমটা টেনে গাছ-গাছালীর আড়াল সম্বল করে। নচেৎ যে-ব্যক্তি বাংলাদেশের সংবাদ বয়ে এনেছে, তার জানাজায় শরীক না হলে যে সারা জীবন আফসোস থেকে যাবে। [১৯৯]

(খ) তারপর অথৈ অন্ধকারে হামাগুড়ি।...ঝাঁপিয়ে পড়ার পর বাংলার নদী কিছুক্ষণ আলিঙ্গনে আলিঙ্গনে সারেঙকে নিয়ে লোফালোফি করেছিল, যখন লাল হয়ে উঠেছিল পানির সমতল প্রৌঢ় মানুষের রক্তে। একসময় তলিয়ে যেতে হয় সমস্ত বারিরাশির স্নেহের ভিতর, যখন নির্বাত হয়ে আসে অতলান্ত মেঘনার অন্তর্জগত।[২০০]

এবং তিন মির্জা গ্রন্থের 'দ্বিতীয় অভিসার' গল্পে মাজুর গর্ভে পাকসেনাদের অত্যাচারে সন্তান এলে সে প্রতিশোধ পরায়ন হয়ে আপন ঔরসজাত সন্তান জন্মের পর ধলেশ্বরী নদীতে বিসর্জন দেয়। মাজু চরিত্রের আবেগধর্মিতা নাটকীয়ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। একদিকে পাকসেনাদের প্রতি ঘৃণা তথা প্রতিশোধ গ্রহণ, অন্যদিকে মাতৃত্বের তীব্র হাহাকার মাজু চরিত্রটিকে বিশিষ্টতা দান করেছে। গল্প থেকে উদ্ধৃতি:

অন্ধকারে জানা যায় না, গ্রামগুলো কত দূর বা আশেপাশে মানুষ আছে কি না।

শব্দ তাদের কাল হতে পারে।

...মাজু ককিয়ে উঠল 'মরিয়ম বুবু, আপনার পায়ে পড়ি। লন আপনে ফেইলা দেন।'

'আমি পারুম না।' মরিয়ম সাফ জবাব দিল।

মাজু পুটলি বুকে , মাটির উপর বসে পড়ে ডুকরে উঠছিল। কান্না, গোঙ্গানি, কথা তখন একত্র জড়িত।[২০১]

Dhaka University Institutional Repository

ছোটগল্পে শওকত ওসমান নাটকীয় রীতি প্রয়োগ করেছেন সার্থকভাবে। এ সম্পর্কে অনীক মাহমুদের মন্তব্য:

> জীবন ও বাস্তবতার প্রত্যক্ষ অভিনিবেশ সৃষ্টির জন্য তিনি উপন্যাস ও ছোটগল্পে নাটকীয় রীতির প্রয়োগ করেছেন।...তিনি নিজেও একজন নাট্যকার বিধায় তাঁর ছোটগল্পে নাটকীয়তার সংযুক্তি বলিষ্ঠ ও উদ্দেশ্য সাধনে সক্ষম হয়েছে বলে মনে হয়।[২০২]

তাছাড়া নাটকীয় পরিচর্যার সাথে চিত্রাত্মক পরিচর্যার ব্যবহার ভাষাকে অলঙ্কারমণ্ডিত করে– যা গল্পের শিল্প সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। এ ধরনের গল্পের মধ্যে 'আলোক-অন্বেষা' উল্লেখযোগ্য। এছাড়া 'সারেঙ সুখানী', 'দম্পতি', 'নিজের লাশ লইয়া' প্রভৃতি গল্পে চিত্রাত্মক পরিচর্যার ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। 'আলোক-অন্বেষা' গল্প থেকে উদ্ধৃতি:

> বহু অতীত তখন হুড়াহুড়ি ধাক্কা দিতে থাকে তার মনের ভাসমান সমতলে জায়গার জন্যে।...তবু হাতড়ে ফেরা দৃষ্টি ফেটির মধ্যেই ছবি আঁকতে থাকে। অজস্র বুদ্‌বুদ্, অজস্র রঙের স্রোত কেবল অক্ষিপটে ভেতর দিয়ে হু হু ঢুকে যাচ্ছে গন্তব্যহীন যাত্রায়।[২০৩]

এ পর্বের কিছু গল্পে প্রবাদ-প্রবচনের ব্যবহার দেখা যায়। গল্প থেকে উদ্ধৃতি:

(ক) নিয়ৎগুণে বরকত,বাসনা-গুণে মাহাত্ম্য।[২০৪]

(খ) কালির আখর কাজে লাগে আখরে।[২০৫]

(গ) যা বিষ, তাই আবার বিষহর।[২০৬]

ছোটগল্পে ভাষা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। লেখকের গভীর উপলব্ধি থেকে গল্পের বিষয়ে বৈচিত্র্য আসে। আর এই সাফল্যের অন্তরালে আছে গল্পকারের ভাষা সৃষ্টির ক্ষমতা– যা পরিবেশ ও চরিত্র অনুযায়ী বাক্য বিন্যাস ও শব্দ ব্যবহারে প্রস্ফুটিত হয়। পরিবেশ ও চরিত্র অনুযায়ী ভাষা ব্যবহৃত হলে একটি গল্প পাঠকের ইন্টারেস্ট-কে সর্বদা আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়। আর এ কারণে ছোটগল্পের শিল্পরূপের প্রাণশক্তি যথার্থ ভাষা ব্যবহারে সার্থক হয়ে ওঠে। শওকত ওসমানের গল্পের বিষয়ের পরিবেশনা যেমন স্বতস্ফূর্ত, তেমনি ভাষা ব্যবহারেও রয়েছে তাঁর নিজস্ব পরিবেশন পদ্ধতি অর্থাৎ চরিত্র ও পরিবেশ অনুযায়ী ভাষা ব্যবহারে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। শওকত ওসমানের ভাষা ব্যবহার সম্পর্কে অনীক মাহমুদ মন্তব্য করেন:

Dhaka University Institutional Repository

শওকত ওসমান তাঁর সুদীর্ঘ সাহিত্য জীবনে 'বক্তব্য ও ভাবভঙ্গির' যে সাধনা করেছেন, তা অবশ্যই তাঁর ব্যক্তিত্ব প্রকাশক ও স্বকীয় দ্যোতনার পরিবাহী। রচনার বিষয় নির্বাচন ও দৃষ্টিভঙ্গিতে তাঁর যেমন নিজস্বতা আছে, অনুরূপভাবে ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রেও রয়েছে তাঁর নিজস্ব পদ্ধতি।[২০৭]

এ কাল পর্বের ঊনপঞ্চাশটি গল্প চলিত রীতিতে রচিত। "এ পর্বের গল্প-ভাষা সাধারণত আবেগতাড়িত, কোথাও শানিত প্রতিক্রিয়ায় উজ্জ্বল, আবার কোথাও তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের আধার। তাছাড়া এ পর্যায়ে শওকত ওসমানের ব্যঙ্গ ে শ্লেষাত্মক কটাক্ষ আরও তীব্র হয়ে ওঠে।"[২০৮]

শওকত ওসমান তাঁর ছোটগল্পের কাহিনিবিন্যাসে আরবি, ফারসি, উর্দু, ইংরেজি ও আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার করেছেন নিজস্ব পদ্ধতিতে। গল্পে তাঁর ভাষা ব্যবহার সম্পর্কে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস বলেন:

> তিনি ঘোরতরভাবে সমকাল সচেতন।...বয়স তাঁকে ভোতা করে না, বরং বয়সের সঙ্গে তাঁর অনুভূতি আরো ধারালো, আরো তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে।...অবিরাম তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া শওকত ওসমানের রচনায় অস্থির ছায়া ফেলে। তাঁর বাক্য হয়ে আসছে ছোটো ও তীক্ষ্ণ। ব্যঙ্গ করে ও শ্লেষ মিশিয়ে কথা বলার প্রবণতা তাঁর এখন অনেক বেশি। যখন তিনি বিদেশী শব্দ প্রয়োগ করেন– এ কেবল ভাষাকে গয়না পরাবার সখ মেটানোর জন্য নয়, তীব্র প্রতিক্রিয়াকে শানিত করে বলাই এ ধরনের শব্দ ব্যবহারের একমাত্র লক্ষ্য। সাহিত্যিক শওকত ওসমানের যে বৈশিষ্ট্য আমাকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করে এবং মুগ্ধ করে তাহল তাঁর গল্পে (কখনও-বা উপন্যাসের সংলাপে) 'বুদ্ধিদীপ্ত বাককুশলতা যা বিদ্যুতবিভার চরিত্র নিয়ে প্রকাশ পায়। 'উইট' শব্দটির লাগসই এবং পছন্দমত প্রতিশব্দ অভিধানে মেলেনা, তাই মূল শব্দেই বলি– এই 'উইট' এর ব্যবহারে আমাদের সাহিত্যিকদের মধ্যে শওকত ওসমানের তুলনা বিরল, প্রায় নেই বললেই চলে। এখানে প্রতিদ্বন্দ্বীহীন বলা যেতে পারে।'[২০৯]

বাংলাদেশ কালপর্বে রচিত একাধিক গল্পে উর্দু ভাষার ব্যবহার লক্ষ করা যায়। এ পর্বের গল্পে উর্দু ভাষা ব্যবহারের কারণ– "গল্পকারের উদ্দিষ্ট গল্পের আবহ তৈরি, পাক হানাদার বাহিনীর স্বরূপ উন্মোচণ, চরিত্রসমূহকে প্রাণবন্ত রূপ দেওয়া এবং বাস্তবের কঠিন মাটিতে গল্পের ভিত্তিভূমি নির্মান করা।"[২১০]

জন্ম যদি তব বঙ্গে গ্রন্থের 'আলোক-অন্বেষা', 'বারুদের গন্ধ লোবানের ধোঁয়া', 'জন্ম যদি তব বঙ্গে', 'রক্তচিহ্ন' প্রভৃতি গল্পে– গল্পকার উর্দু ভাষার সার্থক ব্যবহার করেছেন গল্পের আবহ তৈরি তথা হানাদার বাহিনীর স্বরূপ উন্মোচণ করার নিমিত্তে। গল্প থেকে উদ্ধৃতি দেয়া হল:

(ক) এই কয়েদী চলো। তোমকা রোশনাই মেলে উসকা বন্দোবস্ত করে।[২১১]

(খ) –স্টুডেন্ট লোগ বড়া বদমাস। বাংলাদেশ, বাংলাদেশ করতা হ্যায়, শোর মাচাতা হ্যায়। উসকা সাজা ভি হামলোগ দিয়া।[২১২]

Dhaka University Institutional Repository

(গ) এ-ই বুড্ঢা, ইদার মুকুত বাহিনী হ্যায়?[২১৩]

(ঘ) শালা বাঙালীকা বাচ্চা ইদার আয়।
যায়েগা কিদার হারামজাদা।
টর্চ ঠিক-সে ফেলো-জী।
গনী খান কা দাদ (প্রতিশোধ) লেনা হায়।
ওই শালা দারাখ্ত কা নীচে পড়া হুয়া।
জেন্দা নেহি। এৎনা খুন বহা।
তভি হুশিয়ার।[২১৪]

শওকত ওসমান গল্পে উপভাষা অর্থাৎ আঞ্চলিক ভাষার যথাযথ ব্যবহার করেছেন। বিভিন্ন আঞ্চরিক ভাষা ব্যবহারের মাধ্যমে বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। 'বার্তাবহ', 'ওয়াগন ব্রেকার', 'কেন মৌন', 'সারেঙ সুখানী' প্রভৃতি গল্পে আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। গল্প থেকে উদ্ধৃতি দেয়া হল:

(ক) ফানি ফড়ের অরধেক অইলে তোরা বেগগুনে ফানির মদ্দি ঝাঁফ দিস।[২১৫]

(খ) আহারে পুৎ তোরে একবার দেইখ্যা লই।[২১৬]

(গ) গাঁয়ের পোলা হগ্ গল্ কথাই শোনা যাইবো পরে। ওরে জিরাইতে দাও।[২১৭]

(ঘ) দু-বার মিলিটারী আইছিল। পেরথম বার বাড়ী ঘরদোর জ্বালাইছে, তিনটা মাইয়ার ইজ্জৎ খাইছে। পরের বার আইল। হে-সব কিছু করে নাই। বরং দুস্তি পাতানোর চেষ্টা কইরল।[২১৮]

কথা সাহিত্যে শওকত ওসমান হাস্যরস সৃষ্টি করেছেন– কখনও রূপক-প্রতীকের আশ্রয়ে, আবার কখনও ব্যঙ্গের আবরণে। গল্পে তাঁর ব্যঙ্গ-বক্তব্য সম্পর্কে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস মন্তব্য করেছেন:

> তাঁর ব্যঙ্গ প্রায় ছাপিয়ে ওঠে তাঁর বক্তব্যকে, গল্পের চরিত্রের স্বভাবও আকার উপচে ওঠে তাঁর প্রতিক্রিয়া। প্রথম দিকের রচনায় তাঁর ঝাঁঝ কম, কথা বলার স্বর একটু নিচু, কিন্তু তাতে পাঠককে স্পর্শ করতে, এমনকি ধাক্কা দিতেও কোনো অসুবিধা হয়নি।[২১৯]

শওকত ওসমানের ছোটগল্পের পাশাপাশি *নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত* (১৯৮২), *শেখের সম্বরা* ১ম ও ২য় খণ্ড (১৯৯২), ব্যঙ্গধর্মী কাব্যগ্রন্থ এবং *নষ্টভান অষ্টতান* (১৯৮৬) নাটকে ব্যঙ্গ রচনার প্রধান্য দেখা যায়। মূলত সমাজ জীবনের অসংগতিকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের মাধ্যমে তিনি তাঁর ছোটগল্পে তুলে ধরেছেন। এ বিষয়ে আজহার ইসলাম মন্তব্য করেন:

Dhaka University Institutional Repository

মানুষের তৈরি সমাজ মানুষের জীবনের জন্যেই কখনো কখনো অত্যন্ত নিষ্ঠুর হয়, এই অবস্থায় সমাজের প্রতি ব্যঙ্গের কশাঘাত হানতে শিল্পী যদি নির্বিকার থাকেন, তাহলে তাকে দোষ দেওয়া চলে না। সেজন্যে দেখি মানুষ যেখানে দুর্বল, শওকত ওসমান সেখানে কৌতুকপ্রবণ, অন্যদিকে সমাজ যেখানে নিষ্ঠুর, তিনি সেখানে ব্যঙ্গপ্রবণ।[২২০]

শওকত ওসমানের গল্প থেকে কিছু উইট– এর ব্যবহার দেয়া হল:

(ক) ডালকুত্তারা তার হদিসে এগিয়ে আসবে না– তা হয় না। এই ডালকুত্তারা আবার মানুষ। কুকুরের চেয়ে হিংস্র এবং আক্কেল ঢের বেশি।[২২১]

(খ) জানোয়ারে কিছু করলে হে মনে রাখতা নাই। কুকুর কামড় দিলে কি মানুষ মনে রাখে, না পা কাইট্যা ফেলে? মানুষ কিছু কইরলে অন্য কথা। জানোয়ারকে মানুষে মাফ কইর‍্যা দ্যায়।[২২২]

(গ) পশুর নিকট উলঙ্গ থাকতে মানুষের কোনো লজ্জা থাকার কথা নয়।

এক পশু বেমালুম ন্যাংটো থাকে অন্য পশু-সমীপে।[২২৩]

(ঘ) তাছাড়া সান্ত্বনার নোঙর ফেলার জন্যে আর ডাঙ্গা কোথায়?[২২৪]

সাহিত্যিক জীবনের শেষ পর্যায়েও শওকত ওসমান কাব্যিক ভাষা ব্যবহার করেছেন তাঁর ছোটগল্পে। আর তাই এ পর্বের গল্পের অবয়বও উপমা, উৎপ্রেক্ষা, সমাসোক্তি, চিত্রকল্প প্রভৃতি অলঙ্কারে সুবিন্যস্ত। *জন্ম যদি তব বঙ্গে* গ্রন্থের 'সারেঙ সুখানী', 'আলোক-অন্বেষা', *এবং তিন মির্জা* গ্রন্থের 'দ্বিতীয় অভিসার', *ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী* গ্রন্থের 'ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী' প্রভৃতি গল্প থেকে উপমা-অলঙ্কারের উদ্ধৃতি দেয়া হল:

(ক) বাতাস গুমরে গুমরে কাঁদে নাসিমন খালার মত, নির্বাক পাথর।[২২৫]

(খ) তার মরা দেহ বকুল ফুলের মত শুকিয়ে গেলেও সহজে সৌরভ হারায় না।[২২৬]

(গ) নিদ্রিত জলের দেহাভ্যন্তরে রক্ত চলাচলের নিঃশব্দ নিনাদের মতো।[২২৭]

(ঘ) শহরের শিং ষাঁড়ের মত মাটি গুতিয়ে গুতিয়ে এগোয়।[২২৮]

এ পর্বের *জন্ম যদি তব বঙ্গে* গ্রন্থের 'রক্তচিহ্ন', 'বারুদের গন্ধ লোবানের ধোঁয়া', *পুরাতন খঞ্জর* গ্রন্থের 'নিজের লাশ লইয়া' প্রভৃতি গল্প থেকে সমাসোক্তি অলঙ্কারের উদাহরণ নিম্নরূপ:

(ক) মৃত্যুর কথা একবার চকিতে তার মনের উপর দিয়ে দৌড়ে গিয়েছিল বৈকি।[২২৯]

(খ) বাংলাদেশের বর্ষার আকাশ হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে।[২৩০]

(গ) অক্ষি-কোটরের ভেতর দিয়ে ছুটে আসছে দ্রুত উঁচু উঁচু ঢেউ তুলে।[২৩১]

Dhaka University Institutional Repository

এবং তিন মির্জা গ্রন্থের 'দ্বিতীয় অভিসার', 'দম্পতি' প্রভৃতি গল্পে চিত্রধর্মী ভাষা পরিলক্ষিত হয়:

(ক) তখন পৃথিবী জেগে উঠবে, যে-পৃথিবী সুপ্ত, গভীর প্রশান্তির মধ্যে হয়ত সুখস্বপ্ন দেখছে। পৃথিবী জেগে উঠলে তার পৃথিবী ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে। [২৩২]

(খ) চোখের পাতা তরুলতার ধূসরিত ছায়ায় যেন কোন অনাগত শ্রাবণকে ডাক দিচ্ছে। [২৩৩]

শওকত ওসমান ব্রিটিশ, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ কালপর্বের গল্পগুলোতে রাজনৈতিক সচেতনতা, সমাজ সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর গল্পগুলো প্রবহমান ঘটনাস্রোতের জীবন্ত সাক্ষী। তাঁর গল্পের অবয়ব নির্মাণে এবং শিল্পরীতির বিন্যাসে বাঙালির ইতিহাস, ঐতিহ্যের সম্পৃক্ততা পরিলক্ষিত হয়। শওকত ওসমান সম্পর্কে রফিকউল্লাহ খানের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য:

> সৃষ্টিশীল সাধনা ও মননচর্চাকে শওকত ওসমান বাঙালির জাতীয় চেতনার গুণগত বিকাশের শিল্পক্রিয়ায় পরিণত করেছেন। ক্রমাগত অন্ধকারের দিকে ধাবমান রাষ্ট্র ও সমাজযন্ত্রের সামনে তিনি উপস্থাপন করেন প্রগতি আলোয়–উত্তরণের দিগদর্শন।...জাতীয় ইতিহাসের দীর্ঘ সময়ক্রমের মধ্য দিয়ে বহমান এই ব্যক্তিপুরুষ এখন নিজেই হয়ে উঠেছেন জাতির ইতিহাসচেতনা, সৃজনশীলতা ও মননধর্মের মূর্ত প্রতীক।[২৩৪]

ছোটগল্পের আঙ্গিক নির্মাণে শওকত ওসমানের সাফল্য স্বীকৃত। তাঁর সৃষ্টিবৈচিত্র্য এবং শিল্পদৃষ্টির বহুমাত্রিক বৈশিষ্ট্যে গল্পগুলো অভিব্যঞ্জিত। *পিঁজরাপোল* কিংবা *সাবেক কাহিনী*-এর কালপর্বে শওকত ওসমান গ্রামীণ মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত মানুষের জীবনবলয় থেকে চরিত্র নির্বাচন করেছেন। কিন্তু সময়ের সতর্ক নিরীক্ষক শওকত ওসমান কালক্রমে প্রবেশ করেছেন বৈচিত্র্যময় বিষয়-উল্লাসে, প্রকরণবিন্যাসে হয়ে উঠেছেন আধুনিকতাস্পর্শী। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ এবং আশির দশকের স্বৈরতান্ত্রিক সামরিক দুঃশাসন তাঁর গল্পে প্রতীকায়িত হয়েছে। প্রথমে পর্যায়ের চরিত্রসমগ্রে বিদ্যমান আবেগময়তা ক্রমশ পরিশীলিত হয়েছে নাগরিক মননে। চল্লিশের দশক থেকে জীবনের যে পাঠ উৎকীর্ণ হয়েছে তাঁর গল্পে, বিশ শতকের শেষ দশক পর্যন্ত তাঁর গল্পে সে জীবন চিত্রিত হয়েছে নানা মাত্রায়। জীবন রূপায়নে শওকত ওসমান আধুনিক, "আমাদের আধুনিকতার অন্যতম পথিকৃৎ ও বাতিঘর।"[২৩৫]

পরিশেষে বলা যায় জীবন চলার পথে সমকালীন সমাজ, সংস্কৃতি, মানুষ এবং মানুষের নানামাত্রিক জটিলতা, পারিপার্শ্বিকতাকে শওকত ওসমান সার্থকভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং গল্পের শিল্পভাষ্যে তুলে ধরেছেন। বিষয়ের পাশাপাশি আঙ্গিকগত বৈশিষ্ট্যেও তাঁর ছোটগল্প বিশিষ্ট। এ কারণে ব্যক্তি শওকত ওসমান

Dhaka University Institutional Repository

এবং সাহিত্যিক শওকত ওসমান আমাদের বাংলা সাহিত্যে অভিন্ন সত্তা হিসেবে পরিচিত। আঙ্গিক-নিরীক্ষা, চরিত্র অনুযায়ী ভাষার প্রয়োগ এবং যথার্থ রূপক-প্রতীক ব্যবহার শওকত ওসমানের গল্পরচনার অন্যতম সাংগঠনিক বৈশিষ্ট্য– যা শওকত ওসমানকে সাহিত্য অঙ্গনে অনবদ্য ছোটগল্পকার হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসূত্র

১. ড. মো. আব্দুর রশীদ, *শওকত ওসমানের ছোটগল্প : সমকাল, জীবনবৈচিত্র্য ও শিল্পরূপ*, দিকদর্শন প্রকাশনী লি., বাংলাবাজার, ঢাকা, ২০১৫, পৃ. ১১৭।

২. শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, *পূর্বপাকিস্তানের নতুন সাহিত্য*, ওয়ার্সী বুক সেন্টার, ঢাকা, পৃ. ২২৩।

৩. শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪০।

৪. ড. মো. আব্দুর রশীদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৭।

৫. রফিকউল্লাহ খান , *মাইকেল রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য*, সাহিত্য বিলাস, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ১৭২-১৭৩।

৬. ড. মো. আব্দুর রশীদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৮।

৭. ড. মো. আব্দুর রশীদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৯।

৮. শওকত ওসমান, *শওকত ওসমান গল্পসমগ্র* (সম্পাদনা. বুলবন ওসমান), সময় প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৩, 'ভাগাড়' (*সাবেক কাহিনী*), পৃ. ১৮৪।

৯. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৭।

১০. ড. মো. আব্দুর রশীদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২০।

১১. ড. মো. আব্দুর রশীদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২০।

১২. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'জুনু আপা' (*জুনু আপা ও অন্যান্য গল্প*), পৃ. ১৩১।

১৩. শওকত ওসমান, *বিগত কালের গল্প*, 'চুহা-চরিত', বিউটি বুক হাউজ, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃ. ৫৬।

১৪. ড. মো. আব্দুর রশীদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২১।

১৫. শওকত ওসমান, *বিগত কালের গল্প*, 'চুহা-চরিত', পূর্বোক্ত, পৃ ৪৮।

১৬. শওকত ওসমান, *বিগত কালের গল্প*, 'চুহা-চরিত', পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩।

১৭. শওকত ওসমান, *বিগত কালের গল্প*, 'চুহা-চরিত', পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১।

১৮. চঞ্চল কুমার বোস, *বাংলাদেশের ছোটগল্পের শিল্পরূপ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ৮৩।

১৯. চঞ্চল কুমার বোস, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৪।

২০. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, ২০০৩, 'থুতু' (*পিঁজরাপোল*), পৃ. ৮৭।

২১. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'দাতব্য চিকিৎসালযের ইতিহাস', পৃ. ১০৩।

২২. ড. মো. আব্দুর রশীদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৫।

২৩. চঞ্চল কুমার বোস, *বাংলাদেশের কথাসাহিত্য এবং অন্যান্য*, শব্দকোষ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ৭৮।

Dhaka University Institutional Repository

২৪. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'দাতব্য চিকিৎসালযের ইতিহাস', পৃ. ৮৭।

২৫. শওকত ওসমান, *বিগত কালের গল্প*, পূর্বোক্ত, 'শেখ্‌জী', পৃ. ২৮।

২৬. রফিকউল্লাহ খান, *মাইকেল রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য*, সাহিত্য বিলাস, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ১৭১।

২৭. রফিকউল্লাহ খান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৬।

২৮. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'জুনু আপা', পৃ. ১৪১।

২৯. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'জুনু আপা', পৃ. ১৩৯।

৩০. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, *বিগত কালের গল্প*, 'ব্যবধান', পৃ. ৬৮-৬৯।

৩১. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'নতুন জন্ম', পৃ. ১৫৫।

৩২. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'নতুন জন্ম', পৃ. ১৫৪।

৩৩. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'মো'জেজা' (*সাবেক কাহিনী*), পৃ. ১৭৪।

৩৪. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'মো'জেজা', পৃ. ১৭৯।

৩৫. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'মো'জেজা', পৃ. ১৭৯।

৩৬. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'মো'জেজা', পৃ.১৮০।

৩৭. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'মো'জেজা', পৃ. ১৭৪।

৩৮. চঞ্চল কুমার বোস, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৯-৮০।

৩৯. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'ভাগাড়', পৃ. ১৮৪।

৪০. ড. মো. আব্দুর রশীদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৯।

৪১. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'দাতব্য চিকিৎসালয়ের ইতিহাস', পৃ. ১১৩।

৪২. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, *সাহিত্যে ছোটগল্প*, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., কোলকাতা, ২০০১, পৃ. ৩।

৪৩. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪।

৪৪. ড. মো. আব্দুর রশীদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩০।

৪৫. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, *বিগত কালের গল্প*, 'চুহা-চরিত', পৃ. ৪১।

৪৬. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'বকেয়া' (*সাবেক কাহিনী*), পৃ. ১৮১।

৪৭. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'সে কিরূপে স্বর্গে গেল', পৃ. ১৯০।

৪৮. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'প্রতীক্ষা', পৃ. ২১০।

৪৯. সৈয়দ আলী আহসান, *সতত স্বাগত*, ১ম প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৮৪, পৃ. ১৭৯।

৫০. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'পিঁজরাপোল' (*পিঁজরাপোল*), পৃ..৯৬।

৫১. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'কাঁথা', পৃ. ১১৯।

Dhaka University Institutional Repository

৫২. চঞ্চল কুমার বোস, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৮।

৫৩. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, *বিগত কালের গল্প*, 'ব্যবধান', পৃ. ৬৮।

৫৪. চঞ্চল কুমার বোস, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৫-৭৬।

৫৫. ড. মো. আব্দুর রশীদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩১।

৫৬. ড. মো. আব্দুর রশীদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩১।

৫৭. চঞ্চল কুমার বোস, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৮-১০৯।

৫৮. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'দেনা' (*সাবেক কাহিনী*), পৃ. ২১৩।

৫৯. ড. মো. আব্দুর রশীদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩২।

৬০. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'জুনু আপা' (*জুনু আপা ও অন্যান্য গল্প*), পৃ. ১৩৩।

৬১. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'নতুন জন্ম', পৃ. ১৫৭।

৬২. ড. মো. আব্দুর রশীদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২০।

৬৩. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'নতুন জন্ম', পৃ. ১৫৭।

৬৪. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'চুহা-চরিত', পৃ. ৩০।

৬৫. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'প্রতীক্ষা', পৃ. ২০৩-২০৪।

৬৬. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'ইলেম', পৃ. ৮৮।

৬৭. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'থুতু', পৃ. ৮৭।

৬৮. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'দীর্ণপত্র', পৃ. ১৯৭।

৬৯. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'দেনা', পৃ. ২১৫।

৭০. চঞ্চল কুমার বোস, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬২।

৭১. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'নতুন জন্ম', পৃ. ১৫৮।

৭২. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'ব্যবধান', পৃ. ৬৮।

৭৩. ড. মো. আব্দুর রশীদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৭।

৭৪. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'ভাগাড়', পৃ. ১৮৭।

৭৫. অনীক মাহমুদ, *বাংলা কথাসাহিত্যে শওকত ওসমান*, ইউরেকা বুক এজেন্সী, রাজশাহী, ১৯৯৫, পৃ. ২৫২।

৭৬. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'সাদা ইমারত', পৃ. ১৪২-১৪৩।

৭৭. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'পিঁজরাপোল', পৃ. ১০২।

৭৮. আজহার ইসলাম, *বাংলাদেশের ছোটগল্প; বিষয়-ভাবনা স্বরূপ ও শিল্পমূল্য*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ১০৬।

Dhaka University Institutional Repository

৭৯. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, 'শওকত ওসমানের প্রভাব ও প্রস্তুতি'; *নিসর্গ* (সম্পা. সরকার আশরাফ), বাণী প্রকাশনী, বগুড়া, ১৯৯১, পৃ. ১১২।

৮০. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'থুতু', পৃ. ৮৭।

৮১. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'পিঁজরাপোল', পৃ. ৯৬।

৮২. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'দেনা', পৃ. ২১৫।

৮৩. অনীক মাহমুদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫২।

৮৪. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'ইলেম', পৃ. ৮৮।

৮৫. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'কাঁথা', পৃ. ১১৫।

৮৬. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'নতুন জন্ম', পৃ. ১৫৪।

৮৭. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'থুতু', পৃ. ৮৭।

৮৮. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'ইলেম', পৃ. ৮৮।

৮৯. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'আলিম মুয়াজ্জিন', পৃ. ১২৩।

৯০. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'জুনু আপা', পৃ. ১৩৬।

৯১. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'সাদা ইমারত', পৃ. ১৪৩।

৯২. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'ইলেম', পৃ. ৮৮।

৯৩. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'নতুন জন্ম', পৃ. ১৫৩।

৯৪. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'শেখ্‌জী', পৃ. ৯।

৯৫. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'চুহা-চরিত', পৃ. ১০।

৯৬. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'জুনু আপা', পৃ. ১৩৪।

৯৭. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'পিঁজরাপোল', পৃ. ১০২।

৯৮. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'সাদা ইমারত', পৃ. ১৪৪।

৯৯. মিজানুর রহমান খান, *বনফুলের ছোটগল্প; জীবনদৃষ্টি ও শিল্পরীতি*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ১।

১০০. ড. মো. আব্দুর রশীদ, পূর্বোক্ত, ২৩১।

১০১. চঞ্চল কুমার বোস, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৬।

১০২. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'দুই মুসাফির', পৃ. ২৩০।

১০৩. রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের উপন্যাসের বিষয় ও শিল্পরূপ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ৮৫।

Dhaka University Institutional Repository

১০৪. জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, 'শ্রদ্ধাঞ্জলী'; *শওকত ওসমানের স্মারকগ্রন্থ* (সেলিনা বাহার জামান), বুলবুল পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ২০০৪, পৃ. ৪১।

১০৫. ড. মো. আব্দুর রশীদ, পূর্বোক্ত, ২৩৩।

১০৬. সৈয়দ আকরম হোসেন, *প্রসঙ্গ; বাংলা কথাসাহিত্য*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ১০৬।

১০৭. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'গোরনিদ্রা', পৃ. ২৬৮।

১০৮. ড. মো. আব্দুর রশীদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৩।।

১০৯. শওকত ওসমান, *উপলক্ষ্য*, ওয়ার্সী বুক করপোরেশন, ঢাকা, ১৯৬৫, ভূমিকাংশ।

১১০. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'স্বজন স্বজাতি' (*রাজপুরুষ*), পৃ. ৭২০-৭২১।

১১১. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'ভ্রুণাঙ্ক' (*প্রস্তর ফলক*), পৃ. ২৫৩।

১১২. ড. মো. আব্দুর রশীদ, পূর্বোক্ত, ২৩৫।

১১৩. ড. মো. আব্দুর রশীদ, পূর্বোক্ত, ২৩৬।

১১৪. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'নেত্রপথ' (*নেত্রপথ*), পৃ. ৩০২।

১১৫. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'জনারণ্যে', পৃ. ২৯৫।

১১৬. ড. মো. আব্দুর রশীদ, পূর্বোক্ত, ২৩৭।

১১৭. ড. মো. আব্দুর রশীদ, পূর্বোক্ত, ২৩৮।

১১৮. চঞ্চল কুমার বোস, পূর্বোক্ত, ২০১১, পৃ. ৮২।

১১৯. চঞ্চল কুমার বোস, *বাংলাদেশের ছোটগল্পের শিল্পরূপ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ১৩১।

১২০. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'দুই মুসাফির', পৃ. ২৩০।

১২১. ড..মো. আব্দুর রশীদ, পূর্বোক্ত, ২৩৮।

১২২. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'শিকারী', পৃ. ২৪২।

১২৩. চঞ্চল কুমার বোস, পূর্বোক্ত, ২০০৯, পৃ. ১৩২।

১২৪. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'ভ্রুণাঙ্ক' (*প্রস্তর ফলক*), পৃ. ২৫৭।

১২৫. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'আজব জীবিকা', পৃ. ২৮২।

১২৬. ড..মো. আব্দুর রশীদ, পূর্বোক্ত, ২৩৯।

১২৭. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'চিড়িমার' (*নেত্রপথ*), পৃ. ৩৭৪।

১২৮. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'জিহ্বাহীন', পৃ. ৩৭১।

১২৯. চঞ্চল কুমার বোস, পূর্বোক্ত, ২০১১, পৃ, ৮৫।

১৩০. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'হিংসাধার' (*প্রস্তর ফলক*), পৃ. ৩০৫।

১৩১. চঞ্চল কুমার বোস, পূর্বোক্ত, পৃ, ।

Dhaka University Institutional Repository

১৩২. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'পিতাপুত্র', পৃ. ২৬৫।

১৩৩. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'শৃগালস্য', পৃ. ৪৪১।

১৩৪. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'শৃগালস্য', পৃ. ৪৪৪।

১৩৫. অনীক মাহমুদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৩।

১৩৬. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'শৃগালস্য', পৃ. ৪৪৪।

১৩৭. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'উভসঙ্গী', পৃ. ২৩৬।

১৩৮. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'উদ্‌বৃত্ত', পৃ. ২৪৬।

১৩৯. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'উদ্‌বৃত্ত', পৃ. ২৪৬।

১৪০. চঞ্চল কুমার বোস, পূর্বোক্ত, ২০০৯, পৃ. ১৩৩।

১৪১. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'সৌদামিনী মালো' (*উভশৃঙ্গ*), পৃ. ৩৯৮।

১৪২. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'রাতা' (*উভশৃঙ্গ*), পৃ. ৪৫০।

১৪৩. চঞ্চল কুমার বোস, পূর্বোক্ত, ২০১১, পৃ. ৮৭।

১৪৪. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'রাতা' (*উভশৃঙ্গ*), পৃ. ৪৫০।

১৪৫. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'বালকের মুখ', পৃ. ২৯৮।

১৪৬. চঞ্চল কুমার বোস, পূর্বোক্ত, ২০১১, পৃ. ৮৪।

১৪৭. ড.মো. আব্দুর রশীদ, পূর্বোক্ত, ২৪৫।

১৪৮. চঞ্চল কুমার বোস, পূর্বোক্ত, ২০১১, পৃ. ১১৯।

১৪৯. ড.মো. আব্দুর রশীদ, পূর্বোক্ত, ২৪৬।

১৫০. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'শিকারী', পৃ. ২৪২।

১৫১. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'দীক্ষায়ণ', পৃ. ২৫৭।

১৫২. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'সৌদামিনী মালো', পৃ. ৩৯৭-৩৯৮।

১৫৩. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'দুই মুসাফির', পৃ. ২২৯-২৩০।

১৫৪. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'ব্ল্যাকআউট', পৃ. ৩৫৪-৩৫৫।

১৫৫. অনীক মাহমুদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৫।

১৫৬. ড. মো. আব্দুর রশীদ, পূর্বোক্ত, ২৫১।

১৫৭. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'শিকারী', পৃ. ২৩৮।

১৫৮. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'ভ্রূণাঙ্ক', পৃ. ২৫৩।

Dhaka University Institutional Repository

১৫৯. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'একটি বহস', পৃ. ৩০১।

১৬০. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'চিড়িয়া', পৃ. ৪০০।

১৬১. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'আজব জীবিকা', পৃ. ২৮৪।

১৬২. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'উদ্‌বৃত্ত', পৃ. ২৪৩।

১৬৩. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'রাতা', পৃ. ৪৪৫।

১৬৪. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'ভ্রুণাঙ্ক', পৃ. ২৫৩।

১৬৫. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'শিকারী', পৃ. ২৩৭।

১৬৬. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'দুই মুসাফির', পৃ. ২২৮।

১৬৭. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'দুই মুসাফির', পৃ. ২২৮।

১৬৮. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'উভসঙ্গী', পৃ. ২৩১।

১৬৯. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'শিকারী', পৃ. ২৩৭।

১৭০. রফিকউল্লাহ খান, পূর্বোক্ত, ১৯৯৭, পৃ. ১১৫।

১৭১. সুশান্ত মজুমদার সম্পাদিত, *বাংলাদেশের গল্প : সত্তর দশক*, ভূমিকা প্রথম প্রকাশ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৯, মে ১৯৯২, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, পৃ. ১০।

১৭২. নাসরীন জাহান সম্পাদিত, *বাংলাদেশের গল্প : আশির দশক*, পূর্বকথা, প্রথম প্রকাশ, চৈত্র ১৩৯৯, মার্চ ১৯৯৩, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, পৃ. ৯-১০।

১৭৩. চঞ্চল কুমার বোস, পূর্বোক্ত, ২০১১, পৃ. ১২৭-১২৮।

১৭৪. ড. মো. আব্দুর রশীদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩০।

১৭৫. রফিকউল্লাহ খান, পূর্বোক্ত, ২০০৭, পৃ. ১৭০।

১৭৬. চঞ্চল কুমার বোস, পূর্বোক্ত, ২০০৯, পৃ. ২০৭।

১৭৭. ড. মো. আব্দুর রশীদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩৩।

১৭৮. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'ভারতীয় গোয়েন্দা', পৃ. ৫০৬।

১৭৯. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'তিন মির্জা', পৃ. ৫২১।

১৮০. চঞ্চল কুমার বোস, পূর্বোক্ত, ২০১১, পৃ. ৭৫।

১৮১. চঞ্চল কুমার বোস, পূর্বোক্ত, ২০১১, পৃ. ৭৫।

১৮২. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'আলোক-অন্বেষা', পৃ. ৪৮৩।

১৮৩. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'রক্তচিহ্ন', পৃ. ৪৯৮।

১৮৪. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'সারেঙ সুখানী', পৃ. ৪৯০।

Dhaka University Institutional Repository

১৮৫. অনীক মাহমুদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৭।

১৮৬. চঞ্চল কুমার বোস, পূর্বোক্ত, ২০১১, পৃ. ৮৮।

১৮৭. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'জননী : জন্মভূমি', পৃ. ৫১৩-৫১৪।

১৮৮. চঞ্চল কুমার বোস, পূর্বোক্ত, ২০১১, পৃ. ৮৯।

১৮৯. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'দ্বিতীয় অভিসার', পৃ. ৫৫৪।

১৯০. ড. মো. আব্দুর রশীদ, পূর্বোক্ত, পৃ, ৩৪১।

১৯১. চঞ্চল কুমার বোস, পূর্বোক্ত, ২০০৯, পৃ. ২০৭-২০৮।

১৯২. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী', পৃ. ৬৩৯।

১৯৩. চঞ্চল কুমার বোস, পূর্বোক্ত, ২০১১, পৃ. ৯৩-৯৪।

১৯৪. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'জন্ম যদি তব বঙ্গে', পৃ. ৪৯৫।

১৯৫. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'ওয়াগন ব্রেকার', পৃ. ৫১৮।

১৯৬. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'অনন্ত বাসর', পৃ. ৬৫৭।

১৯৭. চঞ্চল কুমার বোস, পূর্বোক্ত, ২০১১, পৃ. ১৩৩।

১৯৮. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'নিজের লাশ লইয়া', পৃ. ৫৯৪।

১৯৯. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'বার্তাবহ', পৃ. ৪৯২।

২০০. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'সারেঙ সুখানী', পৃ. ৪৯০।

২০১. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'দ্বিতীয় অভিসার', পৃ. ৫৫৪।

২০২. অনীক মাহমুদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৭।

২০৩. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'আলোক-অন্বেষা', পৃ. ৪৭৯।

২০৪. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'গোয়েন্দা কাহিনীর খসড়া', পৃ. ৫৭৮।

২০৫. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'ফয়সালা', পৃ. ৫২৮।

২০৬. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'আলোক-অন্বেষা', পৃ. ৪৮০।

২০৭. অনীক মাহমুদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫১।

২০৮. ড. মো. আব্দুর রশীদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪৮।

২০৯. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১২।

২১০. ড. মো. আব্দুর রশীদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪৯।

২১১. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'আলোক-অন্বেষা', পৃ. ৪৮৩।

২১২. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'বারুদের গন্ধ লোবানের ধোঁয়া', পৃ. ৪৮৪।

Dhaka University Institutional Repository

২১৩. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'জন্ম যদি তব বঙ্গে', পৃ. ৪৯৪।

২১৪. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'রক্তচিহ্ন', পৃ. ৪৯৮।

২১৫. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'সারেঙ সুখানী', পৃ. ৪৯০।

২১৬. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'বার্তাবহ', পৃ. ৪৯২।

২১৭. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'ওয়াগন ব্রেকার', পৃ. ৫১৫।

২১৮. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'কেন মৌন', পৃ. ৬৮০।

২১৯. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১২।

২২০. আজহার ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৬।

২২১. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'রক্তচিহ্ন', পৃ. ৪৯৮

২২২. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'ক্ষমাবতী', পৃ. ৫০৫।

২২৩. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'মনিব ও তাহার কুকুর', পৃ. ৫৭৬।

২২৪. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'ওয়াগন ব্রেকার', পৃ. ৫১৮।

২২৫. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'সারেঙ সুখানী', পৃ. ৪৮৭।

২২৬. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'আলোক-অন্বেষা', পৃ. ৪৮০।

২২৭. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'দ্বিতীয় অভিসার', পৃ. ৫৫২।

২২৮. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী', পৃ. ৬৩৯।

২২৯. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'রক্তচিহ্ন', পৃ. ৪৯৫।

২৩০. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'বারুদের গন্ধ লোবানের ধোঁয়া', পৃ. ৪৮৫।

২৩১. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'নিজের লাশ লইয়া', পৃ. ৫৯১।

২৩২. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'দ্বিতীয় অভিসার', পৃ. ৫৫৩।

২৩৩. শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, 'দম্পতি', পৃ. ৫৪৩।

২৩৪. রফিকউল্লাহ খান, পূর্বোক্ত, ২০০৭, পৃ. ১৭৫।

২৩৫. হুমায়ুন আজাদ, 'কথাসাহিত্যের পথিকৃৎ শওকত ওসমান', রোববার, ২১ এপ্রিল, ১৯৮৫, পৃ. ৩১।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

শওকত ওসমান বাংলা কথাসাহিত্যের ইতিহাসে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। ব্রিটিশ, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ-এই তিন কালপর্বে তাঁর সাহিত্যিক জীবন বিস্তৃত ছিল। তিনি ছিলেন প্রগতিশীল মন-মনস্বিতার অধিকারী। আর তাই দেশ-কালের পরিবর্তন তাঁর মনোজগতকে প্রতিনিয়ত আলোর অভিমুখে পরিবর্তিত করেছে। পশ্চিমবঙ্গের আলো-বাতাসে বড় হলেও দেশবিভাগের পরবর্তীকালে বাংলাদেশ তাঁর আপন স্বদেশ হয়ে উঠেছিল। যার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে, উত্থান-পতনে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এ কারণে তাঁর কথাসাহিত্যের পরতে পরতে এদেশের মানুষের জীবনাবেগ প্রতিফলিত হয়েছে। যেমন– ত্রিশ-চল্লিশের দশকে রচিত গল্পে গ্রামীণ জীবন মুখ্য হয়ে উঠলেও পঞ্চাশ-ষাটের দশকে এদেশের রাজনীতির উত্তাল ঘটনা তাঁর ছোটগল্পে স্থান পেয়েছে। আবার সত্তর-আশি-নব্বইয়ের দশকে অর্থাৎ বাংলাদেশ কালপর্বের গল্পে গৌরবময় মুক্তিযুদ্ধের নানা অনুষঙ্গ নিয়ে তাঁর গল্প কাঠামো বিন্যস্ত।

যে কোনো শিল্পাঙ্গিকের সৃষ্টি ও বিকাশের সঙ্গে অবিমিশ্রভাবে জড়িত থাকে সময়-সমাজ-রাষ্ট্র ও সভ্যতার নিরন্তর প্রেরণা। শিল্প মাত্রই ধারণ করে একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের ইতিহাস, ঐতিহ্য, ধারণ করে সেই জনগোষ্ঠীর জীবনাচরণ, তাদের আচার-বিশ্বাস ও মানসিক প্রবণতা। শওকত ওসমানের ছোটগল্পও এই ধারার ব্যতিক্রম নয়। প্রায় দুই শতাব্দীর কলোনিয়াল শোষণ-নিপীড়ন থেকে মুক্তিলাভ-বাঙালির জাতিগত মুক্তির সম্ভাবনাকেই কেবল সূচিত করেনি, তার সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য অর্জনের পথকেও সুগম করে, যা লেখকের ছোটগল্পে প্রভাব বিস্তার করেছে।

ঔপনিবেশিক জীবনের দ্বিধা, দায়, ভয় ও উত্তরাধিকারকে অঙ্গীকার করে বাংলাদেশের ছোটগল্প তার ঐতিহাসিক অভিযাত্রা শুরু করে। এই যাত্রালগ্নে ছোটগল্প যে জন্মচিহ্নকে অঙ্গে ও অন্তরে ধারণ করে, তার মধ্যে ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রতিক্রিয়া, ছেচল্লিশের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দুর্ভিক্ষ, দেশভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যা এবং অগণিত মানুষের সীমাহীন দুঃখ-যন্ত্রণা। বস্তুত প্রাক-সাতচল্লিশ সময়খণ্ডে বাঙালি মুসলিম গল্পকাররা মধ্যবিত্তসুলভ দৃষ্টির অধিকারী হলেও তাঁদের গল্পের বিষয় ছিল একান্তভাবেই গ্রাম-সম্পৃক্ত।

শওকত ওসমানের কথাসাহিত্য বিষয়বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ। বিষয় নির্বাচনে তাঁর বিশেষ প্রবণতা হল তিনি সমকালীন জীবন ও সমাজের বাইরে যেতে চাননি। এবং এই সমকাল সচেতনতা সাধারণ মানুষের জীবন ও

Dhaka University Institutional Repository

কর্মের ব্যাপ্তিতে রেখায়িত। আমরা *পিঁজরাপোল*, *প্রস্তর ফলক* থেকে *রাজপুরুষ* পর্যন্ত তাঁর কথাসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গল্পগ্রন্থগুলোতে দেখেছি সর্বদাই তিনি সমাজের নির্যাতিত মানুষের স্বপক্ষে কথা বলতে ভালোবেসেছেন। ফলে গণজীবনবোধের দীপ্তিতে সমুজ্জল বিষয়কেই তিনি গল্পের উপজীব্য হিসেবে প্রাধান্য দিয়েছেন। আর এ কারণে বাস্তবতা বিবর্জিত সাহিত্য রচনা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। যেখানে সত্য বলতে গেলে অসুবিধা বা প্রবল বাধা আসার সম্ভাবনা দেখেছেন- তাঁর পেশাগত অবস্থানে বিপর্যয়ের ইঙ্গিত লক্ষ করেছেন, সেখানে তিনি রূপক ও প্রতীকী অর্থে দেশ-কালের কথা বলেছেন।

সমকালকে কথাসাহিত্যে প্রাধান্য দেয়ার ফলে শওকত কথাসাহিত্যে বিষয়ের ক্ষেত্রে কোন পুনরাবৃত্তি ঘটেনি। তাঁর সমকাল সচেতন মানসপ্রবণতা রচনাকে প্রভাবিত করেছিল বলে বিষয়বস্তুর বিবর্তন ঘটেছে প্রতিটি পর্যায়ে। আমরা চল্লিশের দশকের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, পঞ্চাশের দশকের ভাষা আন্দোলন, সামরিক আইন, ষাটের দশকের আন্দোলন, সত্তর দশকের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা আন্দোলন, আশির দশকের সামাজিক অবক্ষয় ও অস্থিরতার কথা স্মরণ করতে পারি। এগুলো সবই তাঁর কথাসাহিত্যে উপজীব্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এমনকি বাংলা শিশুসাহিত্যে রূপকথা, উপকথা বা ফ্যান্টাসির যে ধারা চলে এসেছে, সেখানেও তিনি বিষয়বস্তুর পরিবর্তন ঘটিয়ে মানুষ-দেশ-কাল-সমাজকে গ্রহণ করেছেন।

জীবন আর বাস্তবতার সমন্বয় সাধন করতে পেরেছিলেন বলে শওকত ওসমান বিষয়বস্তুর পরিবর্তনের সঙ্গে চরিত্র ও চিন্তাধারার বিবর্তন ঘটাতে পেরেছেন। বড় প্রতিভা কখনই একটি চিন্তা বা পরিসরে আবদ্ধ হয়ে পড়ে না। সৃষ্টির নব নব সন্দীপনা বড় প্রতিভার বিশালত্ব ও বৈচিত্র্যকে উর্বর করে তোলে। চল্লিশের দশকে শওকত কথাসাহিত্যের অঙ্গন জুড়ে গ্রাম আর গ্রামীণতা প্রধান হয়ে আছে। মূলত তিনি গ্রামের ছেলে। গ্রামীণ জীবনের দুঃখ-দারিদ্র্য ও নিস্তরঙ্গ জীবনের অর্থনৈতিক সঙ্কটকে সে সময় তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন। ফলে প্রবল দারিদ্র্যচিত্র অঙ্কনে তিনি ঝুঁকে পড়েন। পরবর্তী সময়ে দারিদ্র্যচিত্র অঙ্কনের প্রবণতা কমে যায়। তিনি তাঁর *সাবেক কাহিনী*' গল্পগ্রন্থের ভূমিকাতে বলেছেন– প্রগতিশীল পাঠকের কাছে সামান্য নিবেদন আছে। এই রচনার সঙ্গে আমার বর্তমান মনের কোন আত্মীয়তা নেই। দুঃখ-বিলাসের নাকী-কান্না আর যান্ত্রিক ভাবে ভাসা ভাসা ঘটনা প্রবাহকে আঁকাই একযুগে মনে করতাম বাস্তবতার পরাকাষ্ঠা। এই গল্পগুলো তার খাড়া স্বাক্ষী। আজ লজ্জার সঙ্গে তা স্বীকার করছি।

চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত শওকত ওসমানের কথাসাহিত্যের সিংহভাগে গ্রামীণ জীবনের চালচিত্র সন্নিবদ্ধ ছিল বলে এখানকার পাত্র-পাত্রীরাও গ্রামীণ অশিক্ষিত ও নাগরিকতাবর্জিত হয়ে সৃষ্ট

Dhaka University Institutional Repository

হয়। *সাবেক কাহিনী*, *জুনু আপা ও অন্যান্য গল্প*, *পিঁজরাপোল* ইত্যাদি গল্পগ্রন্থে তেমন শিক্ষিত লোকের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। অথচ ষাটের দশকে একদিকে প্রতীকের প্রবণতা যেমন তাঁর কথাসাহিত্যে বৃদ্ধি পায়, অন্যদিকে নাগরিক জীবনের চালচিত্রও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ সময়ে রচিত *উভশৃঙ্গ*, *প্রস্তর ফলক* প্রভৃতি গল্পের বইতে নাগরিক জীবন ও সমস্যার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়। চল্লিশ ও পঞ্চাশ দশকে গ্রামীণ মানুষের পাশাপাশি ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, কেরানি, আমলা, অফিসার প্রভৃতি চরিত্র চিত্রিত হয়নি বললেই চলে। অথচ ষাটের দশকেই আমরা তাঁর রচনায় উপর্যুক্ত পেশাজীবী মানুষদের সন্ধান পাচ্ছি।

শওকত ওসমানের প্রথম দিকের পাত্র-পাত্রীরা বলিষ্ঠতা, ব্যক্তিত্বশীলতায় যেন স্ফূর্তি পায়নি। অভাব-দারিদ্র্য-এদের পর্যুদস্ত মুহ্যমান ও নতজানু করেছে। অথচ স্বাধীনতা পরবর্তীকালে নারীদের বলিষ্ঠ ও ব্যক্তিত্বপূর্ণ উপস্থাপন লক্ষ করা যায়। অর্থাৎ উপজীব্যের ক্ষেত্রে যেমন শওকত কথাসাহিত্যে ক্রমবিকাশ আছে-চরিত্রচিত্রণের ক্ষেত্রেও তাঁর উত্তরণমুখী প্রবণতা লক্ষ করা যায়। তাঁর কথাসাহিত্য চেতনায় বিকাশশীল, বক্তব্যে নতুনত্বের সন্ধানী এবং উপস্থাপনায় নিরীক্ষাধর্মী।

কথাসাহিত্যে নিরীক্ষা ও চিন্তার আধুনিকায়তনে শওকত ওসমান আলাদা মাত্রা যোগ করেছেন। জীবন ও বাস্তবতার প্রত্যক্ষ অভিনিবেশ সৃষ্টির জন্য তিনি ছোটগল্পে নাটকীয় রীতির প্রয়োগ করেছেন। *নেত্রপথ* গ্রন্থের 'আপনি ও তুই', *প্রস্তর ফলক* গ্রন্থের 'দুই মুসাফির', 'ভ্রূণাঙ্ক', *নির্বাচিত গল্প* গ্রন্থের 'সিনারিও' ইত্যাদি সংলাপধর্মী রচনা। যদিও তাঁর বর্ণনাধর্মী লেখাতে প্রচুর পরিমাণে সংলাপ ব্যবহৃত হয়েছে, তথাপি চরিত্রের নাম উল্লেখ করে সংলাপের সংযুক্তি তাঁর প্রত্যক্ষতাকে সুচিহ্নিত করেছে। শওকত ওসমান নিজেও একজন সুনামধন্য নাট্যকার ছিলেন, যার কারণে তাঁর গল্পে নাটকীয়তার সংযুক্তি বলিষ্ঠ ও উদ্দেশ্য সাধনে সক্ষম হয়েছে বলে মনে হয়।

শওকত ওসমানের বহুপ্রজ লেখক চরিত্রের আরেকটি যে বিশেষত্ব তাঁর কথাসাহিত্যকে বৈচিত্র্যের সীমায় নিয়ে গেছে, সেটি হচ্ছে আত্মজৈবনিক পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে তিনি গল্প লিখেছেন অনেক। বিশেষত উত্তম পুরুষে বর্ণিত গল্প প্রায়ই গল্পগ্রন্থে পাওয়া যায়। যত সময় গেছে তাঁর সৃষ্টিকর্ম ততই নতুন বিষয়চিন্তা ও নিরীক্ষায় গতানুগতিক স্থবিরতাকে অতিক্রম করতে চেয়েছে। এ জন্য তাঁর প্রতিটি লেখায় নতুন গতিবেগ সঞ্চারিত হয়েছে। এ কারণে শওকত ওসমানের শিল্পপ্রতিভা সাধারণ মানের গণ্ডী অতিক্রম করে বিরল মর্যাদায় অভিষিক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

শওকত ওসমানের সৃষ্টিকর্ম ছিল ইতিহাস, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের শিল্পভাষ্য। তিনি জীবন চলার পথে সমকালীন সমাজ, সংস্কৃতি, মানুষের আচার-আচরণ এবং পারিপার্শ্বিকতাকে সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করে তাঁর ছোটগল্পে তুলে ধরেছেন। যার কারণে ব্যক্তি শওকত ওসমান ও সাহিত্যিক শওকত ওসমান ছিল বাংলা কথাসাহিত্যে অভিন্ন-সত্তা। শওকত ওসমানের শিল্পজিজ্ঞাসা ও সাহিত্যকৃতির মূল্যায়নে আমরা বলতে পারি, বাংলা কথাসাহিত্যে তিনি তাঁর স্থায়ী আসন প্রতিষ্ঠিত করেছেন আপন মহিমায়। তাঁর এই মহিমার বিচ্ছুরণ দিগন্তপ্রসারী, প্রভাবসঞ্চারী ও কালোত্তীর্ণ সম্ভাবনায় ঋদ্ধ অভিসারী।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

(১) মূলগ্রন্থ : শওকত ওসমানের ছোটগল্প

১. *পিঁজরাপোল*, প্রকাশকাল: ১৯৫১

প্রকাশক: নওরোজ লাইব্রেরি, কলকাতা।

২. *জুনু আপা ও অন্যান্য গল্প*, প্রকাশকাল: ১৯৫১

প্রকাশক: নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা।

৩. *সাবেক কাহিনী*, প্রকাশকাল: ১৯৫৩

প্রকাশক: ওয়ার্সী বুক সেন্টার, ঢাকা।

৪. *প্রস্তর ফলক*, প্রকাশকাল: ১৯৬৪

প্রকাশক: এ. বি. পাবলিকেশন্স, ঢাকা।

৫. *উপলক্ষ্য*, প্রকাশকাল: ১৯৬৫

প্রকাশক: ওয়ার্সী বুক করপোরেশন,ঢাকা।

৬. *নেত্রপথ*, প্রকাশকাল: ১৯৬৮

প্রকাশক: নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা।

৭. *উভশৃঙ্গ*, প্রকাশকাল: ১৯৬৮

প্রকাশক: পুথিঘর লিমিটেড, ঢাকা।

৮. *জন্ম যদি তব বঙ্গে*, প্রকাশকাল: ১৯৭৫

প্রকাশক: মুক্তধারা, ঢাকা।

৯. *এবং তিন মির্জা*, প্রকাশকাল: ১৯৮৬

প্রকাশক: বর্ণ বিচিত্রা, ঢাকা।

আলোচিত গল্প: 'তিনমির্জা', 'ফয়সালা', 'শেষ আগে শুরু হয়', 'দম্পতি', 'ন্যায়-অন্যায়' এবং 'দ্বিতীয় অভিসার'।

১০. *মনিব ও তাহার কুকুর*, প্রকাশকাল: ১৯৮৬

প্রকাশক: প্যাপিরাস প্রকাশনী, ঢাকা।

১১. *পুরাতন খঞ্জর*, প্রকাশকাল: ১৯৮৭

প্রকাশক: ওয়ার্সী প্রকাশনী, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

১২. *বিগত কালের গল্প*, প্রকাশকাল: ১৯৮৭

প্রকাশক: বিউটি বুক হাউস, ঢাকা।

১৩. *ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী*, প্রকাশকাল: ১৯৯০

প্রকাশক: পাইওনিয়ার পাবলিকেশন্স, ঢাকা।

১৪. *হন্তারক*, প্রকাশকাল: ১৯৯১

প্রকাশক: সময় প্রকাশন, ঢাকা।

১৫. *রাজকুমার*, প্রকাশকাল: ১৯৯৪

প্রকাশক: সন্ধানী প্রকাশনী, ঢাকা।

শওকত ওসমান, শওকত ওসমান গল্পসমগ্র (সম্পা. বুলবন ওসমান), সময় প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৩।

(২) **মূলগ্রন্থ: শওকত ওসমানের প্রবন্ধ**

১. *সমুদ্র নদী সমর্পিত*, নবজীবন প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৭৩।

২. *ভাব ভাষা ভাবনা*, জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্র, ১৯৭৪।

৩. *ইতিহাসে বিস্তারিত*, তুরহান স্মৃতিলোক, ঢাকা, ১৯৮৫।

৪. *সংস্কৃতির চড়াই উৎরাই*, তুরহান স্মৃতিলোক, ঢাকা, ১৯৮৫।

৫. *মুসলিম মানসের রূপান্তর*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৬।

৬. *নিঃসঙ্গ-নির্মাণ*, নওরোজ সাহিত্য সংসদ, ঢাকা, ১৯৮৬।

৭. *পূর্ণ স্বাধীনতা চূর্ণ স্বাধীনতা*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯০।

(৩) **মূলগ্রন্থ: শওকত ওসমানের কাব্য**

১. *নিজস্ব সংবাদাতা প্রেরিত*, তুরহান স্মৃতিলোক, নতুন প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৮২।

২. *শেখের সম্বরা*, তুরহান স্মৃতিলোক, নতুন প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯২।

(৪) **মূলগ্রন্থ: শওকত ওসমানের আত্মজীবনীমূলক রচনা**

১. *কালরাত্রি খণ্ডচিত্র*, জগচ্চিত্র প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৬।

২. স্বজন স্বগ্রাম, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৮৬।

৩. *রাহনামা ১: ছেলেবেলা ও কৈশোর কোলাহল*, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৭।

৪. *রাহনামা ২: অন্য রণপ্রান্তর ও ভুবন চত্বরে*, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৭।

Dhaka University Institutional Repository

৫. ১৯৭১: *স্মৃতিখণ্ড মুজিবনগর*, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৯।

৬. *উত্তরপর্ব মুজিবনগর*, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৯।

(৫) মূলগ্রন্থ: শওকত ওসমানের সম্পাদিত গ্রন্থ

১. ফজলুল হকের গল্প: ঢাকা, ১৯৮৩ (হবীবুল্লাহ বাহার ও আনোয়ারা বাহার চৌধুরী সহযোগে)।

সহায়ক গ্রন্থ :

সরকার আশরাফ {সম্পা.}, *নিসর্গ*, শওকত ওসমান সংখ্যা, ৬ষ্ট বর্ষ, ১ম সংখ্যা, বাণী প্রকাশনী, বগুড়া, ১৯৯১।

শিরীণ আখতার, *বাংলাদেশের তিনজন ঔপন্যাসিক*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৩।

অনীক মাহমুদ, *বাংলা কথাসাহিত্যে শওকত ওসমান*, ইউরেকা বুক এজেন্সী, রাজশাহী, ১৯৯৫।

আবুল আজাদ, *নজরুল ইসলাম-শওকত ওসমান সমকাল-সংস্কৃতি*, রাইটার্স ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ২০০০।

আবু রুশ্‌দ, *শওকত ওসমান ও সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র উপন্যাস*,বাতায়ন প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৩।

সেলিনা বাহার জামান, {সম্পা.}, শওকত ওসমান স্মারক গ্রন্থ, বুলবুল পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ২০০৪।

বুলবন ওসমান, *কথা-সাহিত্যে শওকত ওসমান*, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৪।

বুলবন ওসমান {সম্পা.}, *ব্যক্তি ও সাহিত্যিক শওকত ওসমান*, দীপ্তি প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৮।

মোহা. সাইদুর রহমান, *আমাদের তিন ঔপন্যাসিক*, বিশ্বসাহিত্য ভবন, ঢাকা, ২০১১।

কুদরত-ই-হুদা, *শওকত ওসমান ও সত্যেন সেনের উপন্যাস: আঙ্গিক বিচার*, আদর্শ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৩।

স্মৃতি ভৌমিক, *নাট্যকার শওকত ওসমান*, সুচয়নী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৩।

শান্তনু কায়সার, শওকত ওসমান, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১৩।

মোহাম্মদ মহিউদ্দিন, *শওকত ওসমান, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, আবু ইসহাকের উপন্যাসে সামাজিক মূল্যবোধ*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৫।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত: কল্লোলযুগ, এম.সি. সরকার অ্যান্ড প্রাইভেট লি.,কলিকাতা,১৯৯৮।

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়: কালের পুত্তলিকা; বাংলা ছোটগল্পের নব্বই বছর, ডি. এম. লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৯৮২।

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়: ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য, বুকল্যান্ড প্রা. লি., কলকাতা, ১৯৬৫।

আজহার ইসলাম: বাংলাদেশের ছোটগল্প: বিষয়-ভাবনা স্বরূপ ও শিল্পরূপ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৬।

আ. ন. ইয়াকভলেভ এবং অন্যান্য: রাজনীতির মূলকথা (অনুদিত: ননী ভৌমিক), প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৭৫।

Dhaka University Institutional Repository

আনিসুজ্জআমান: মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য, লেখক সংঘ প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৬৪।

আবুল ফজল: রেখাচিত্র, গতিধারা, ঢাকা, ২০০৬।

আবুল মনসুর আহমদ: আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর, খোশরোজ কিতাব মহল, ঢাকা, ২০০২।

আমিনুর রহমান সুলতান {সম্পা.}: সোমেন চন্দ্রের গল্প ও গল্পপাঠ, ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৩।

এ, আর, দেশাই: ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সামাজিক পটভূমি, কে.পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি, কলকাতা, ২০০১।

খালেদা হানুম: বাংলাদেশের ছোটগল্প ১৯৪৭-১৯৭০, এ্যাডর্ন পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৯৭।

খোন্দকার সিরাজুল ইসলাম: মুসলিম সাহিত্য-সমাজ, সমাজচিন্তা ও সাহিত্যকর্ম, সূচীপত্র, ঢাকা, ২০০৬।

গোপাল হালদার: সংস্কৃতির রূপান্তর, মুক্তধারা, ঢাকা, ২০০৮।

গোপিকানাথ রায় চৌধুরী: দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য, দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা, ১৯৮৬।

গোলাম মুরশিদ: হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি, অবসর, ঢাকা, ২০০৮।

চঞ্চল কুমার বোস: বাংলাদেশের ছোটগল্পের শিল্পরূপ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৯।

চঞ্চল কুমার বোস: বাংলা কথাসাহিত্য এবং অন্যান্য, শব্দকোষ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১১।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়: সাহিত্যে ছোটগল্প, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, ১৪০৮।

বশীর আল্ হেলাল: ভাষা-আন্দোলনের ইতিহাস, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৫

বিশ্বজিৎ ঘোষ: বাংলা কথা সাহিত্য পাঠ, বাংলা একাডেমি ঢাকা, ২০০২।

বিশ্বজিৎ ঘোষ: বাংলাদেশের সাহিত্য,আজকাল, ঢাকা, ২০০৯।

ভীস্মদেব চৌধুরী: তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস: সমাজ ও রাজনীতি, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৮।

ভূদেব চৌধুরী: বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার, মডার্ন বুক এজেন্সি প্রা. লি., কলকাতা, ১৯৮৯।

মিজানুর রহমান খান: বনফুলের ছোটগল্প : জীবনদৃষ্টি ও শিল্পরীতি, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৮।

মোহাম্মদ হাননান: বাঙালির ইতিহাস, অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৯।

মোহাম্মদ জাহিদ হোসেন: বাংলাদেশের ছোটগল্প : জীবন ও সমাজ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৭।

রফিকউল্লাহ্ খান: বাংলাদেশের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৭।

রফিকউল্লাহ্ খান: মাইকেল রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য, সাহিত্য বিলাস, ঢাকা, ২০১১।

রফিকুল ইসলাম: বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম, ঐতিহ্য, ঢাকা, ২০১১।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়: *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা*, মডার্ন বুক এজেন্সি প্রা. লি., কলকাতা, ১৯৮৮।

সাঈদ-উর-রহমান: *পূর্ব বাংলার রাজনীতি, সংস্কৃতি ও কবিতা*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয, ঢাকা, ১৯৮৩।

সানজিদা আকতার: *বাংলা ছোটগল্পে দেশবিভাগ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০২।

Dhaka University Institutional Repository

সিরাজ সালেকীন: *জীবনানন্দ দাশের ছোটগল্প: জীবনজিজ্ঞাসা ও শৈলীবিচার*, ঐতিহ্য, ঢাকা, ২০০৬।

সিরাজুল ইসলাম {সম্পা}: *বাংলাদেশের ইতিহাস* ১৭০৪-১৯৭১, ১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সাংস্কৃতিক ইতিহাস, বাংরাদেম এশিয়াটিক সোসাইটি,ঢাকা, ১৯৯৩।

সেমন্তী ঘোষ{সম্পা.}: *দেশভাগ : স্মৃতি আর স্তব্ধতা*, গাঙচিল, কলকাতা, ২০১১।

সৈয়দ আকরম হোসেন: *বাংলাদেশের সাহিত্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৫।

সৈয়দ আকরম হোসেন: *প্রসঙ্গ : বাংলা কথাসাহিত্য*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৯৭।

সৈয়দ আজিজুল হক: *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প : সমাজচেতনা ও জীবনের রূপায়ণ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৮।

হারুন-অর-রশিদ: *বাংলাদেশ : রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন*, ১৭৫৭-২০০০, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০৭।

শওকত ওসমান-বিষয়ক প্রবন্ধ

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস: '*শওকত ওসমানের প্রভাব ও প্রস্তুতি*'; *নিসর্গ* {সম্পা. সরকার আশরাফ}, বাণী প্রকাশনী, বগুড়া, ১৯৯১।

আতাউস সামাদ: 'দেশ, দেশ, সবার উপরে দেশ'; *ব্যক্তি ও সাহিত্যিক শওকত ওসমান* {সম্পা. বুলবন ওসমান}, দীপ্তি প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৮।

আনিসুজ্জামান: 'ভাষা আন্দোলনের প্রাসঙ্গিক কথা'; *ভাষা আন্দোলনের ইতিকথা* {সম্পা. আবদুন নুর}, মেলা প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৮।

আবুল হোসেন: 'আমার বন্ধু শওকত ওসমান'; *শওকত ওসমান স্মারক গ্রন্থ* {সম্পা. সেলিনা বাহার জামান}, বুলবুল পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ২০০৪।

আবদুল মতিন: 'শওকত ওসমান স্মরণে'; *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মুক্তিযুদ্ধের পর*, র‍্যাডিক্যাল এশিয়া পাবলিকেশান্স, ঢাকা, ১৯৯৯।

আবদুল মান্নান সৈয়দ: 'শওকত ওসমান'; *একুশের স্মারকগ্রন্থ* {সম্পা. সেলিনা হোসেন, নুরুল ইসলাম, মোবারক হোসেন}, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০০।

জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী: 'শ্রদ্ধাঞ্জলী'; শওকত ওসমান স্মারক গ্রন্থ {সম্পা. সেলিনা বাহার জামান}, বুলবুল পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ২০০৪।

তানভীর মোকাম্মেল: 'আমার শওকত স্যার বিরাশি আউট কিন্তু অপরাজিত'; *ব্যক্তি ও সাহিত্যিক শওকত ওসমান* {সম্পা. বুলবন ওসমান}, দীপ্তি প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৮।

বশীর আল্ হেলাল: 'বাংলাদেশের ছোটগল্প'; *একুশের নির্বাচিত প্রবন্ধ* ১৯৬৩-১৯৭৬ {সম্পা. মোবারক হোসেন}, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৫।

যতীন সরকার: 'ইতিহাস-চেতন শওকত ওসমান', *নিসর্গ* {সম্পা. সরকার আশরাফ}, বাণী প্রকাশনী, বগুড়া, ১৯৯১।

Dhaka University Institutional Repository

রফিকুন নবী: 'শ্রদ্ধাঞ্জলী'; *ব্যক্তি ও সাহিত্যিক শওকত ওসমান* {সম্পা. বুলবন ওসমান}, দীপ্তি প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৮।

শওকত ওসমান: 'নিজেকে লেখা পত্রলেখা'; *ব্যক্তি ও সাহিত্যিক শওকত ওসমান* {সম্পা. বুলবন ওসমান}, দীপ্তি প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৮।

সুশান্ত মজুমদার: 'শওকত ওসমান : অনুজের বোধে'; *ব্যক্তি ও সাহিত্যিক শওকত ওসমান* {সম্পা. বুলবন ওসমান}, দীপ্তি প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৮।

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম: 'দ্য স্টোরিটেলার অব আওয়ার টাইম'; *ব্যক্তি ও সাহিত্যিক শওকত ওসমান* {সম্পা. বুলবন ওসমান}, দীপ্তি প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৮।

হুমায়ুন আজাদ: 'শওকত ওসমান কথাসাহিত্যের পথিকৃৎ'; *ব্যক্তি ও সাহিত্যিক শওকত ওসমান* {সম্পা. বুলবন ওসমান}, দীপ্তি প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৮।

সহায়ক পত্রিকা

সিদ্দিকা মাহমুদা: {সম্পা}, *সাহিত্য পত্রিকা*, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয, বর্ষ :৪৯, সংখ্যা :২, ফাল্গুন, ঢাকা, ২০১২।

শওকত ওসমান : জীবনপঞ্জি

১৯১৭ ২ জানুয়ারি পশ্চিম বঙ্গের হুগলি জেলার খানাকুল থানার অন্তর্গত সবলসিংহপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈর্তৃক নাম শেখ আজিজুর রহমান। শওকত ওসমান তাঁর সাহিত্যিক নাম। পিতা– মোহাম্মদ ইয়াহিয়া ছিলেন কৃষিজীবী। তিনি মিস্ত্রিকর্মেও দক্ষ ছিলেন। মাঝে মাঝে দোকানদারিও তাঁর পেশার অন্তর্গত হয়েছে। মাতা - গুলজান বেগম। মায়ের কোমল ও কঠিন অনুশাসনের মধ্য দিয়ে শওকত ওসমান বিদ্যাভ্যাস করেছেন। আবার তাঁর গল্প উপস্থাপন কৌশলটি মাতৃসূত্রে প্রাপ্ত – মা গল্প বলতেন চমৎকার। মাতাসহ ইবাদ মন্ডলের বাড়ি ছিল সবলসিংহপুর গ্রামের পাশের গ্রাম শিংচকে। তিনি কৃষিজীবী ছিলেন। তিনি গ্রামের মোড়ল ছিলেন। কিন্তু প্রৌঢ়কালে সংসার ত্যাগী ফকিরের মত থাকতেন। পিতামহ - কোরবান আলি। দাদি-খুশীমন। শওকত ওসমান দশ বছর বয়স পর্যন্ত দাদি খুশীমন-এর আদর-যত্নে লালিত পালিত হয়েছেন।

১৯২২-২৩ নিজ গ্রামের মক্তবে পাঁচ বছর বয়সে শিক্ষাজীবন শুরু হয়। এ-সময় তাঁর শিক্ষক ছিলেন মৌলভী আইনুদ্দিন। ধর্মীয় শিক্ষার মধ্য দিয়ে তাঁর শিক্ষাজীবনের হাতেখড়ি।

Dhaka University Institutional Repository

১৯২৬ গ্রামের মাদ্রাসায় ১৯২৬-১৯২৯ পর্যন্ত পড়াশুনা করেন।

১৯২৯ কলকাতার মাদ্রাসা-এ-আলিয়াতে ভর্তি হন। আলিয়া মাদ্রাসায় দুই ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত ছিল – উপর তলায় আরবির মাধ্যমে শিক্ষাদান এবং নিচ তলায় ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষাদান। শওকত ওসমান প্রথম দুই বছর প্রথাগত শাখায় অর্থাৎ মাদ্রসায় (আরবি মাধ্যম) পড়াশুনা করেন। এরপর তিনি স্বেচ্ছায় এ্যাংলো পার্সিয়ান বিভাগে স্থানান্তরিত হন। মাদ্রাসা-এ-আলিয়ার গ্রন্থাগারের অসংখ্য পুস্তক ছিল লেখকের অগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু। বিশেষ করে অধ্যয়ন করতেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতাসমূহ। কবিতার প্রতি আগ্রহ দেখে – এক সহপাঠী আবু নসর মহাম্মদ তবীর তাঁকে কবিতা লেখায় উৎসাহ যুগিয়েছেন। বন্ধুর হৃদয়ভেদী উষ্ণ উৎসাহে স্কুল ম্যাগাজিনে কবিতা প্রকাশ করে বন্ধুমহলে 'কবিসাব' উপাধি পান। কবিতা দিয়ে সাহিত্য সাধনা আরম্ভ করলেও পরবর্তী সময়ে প্রতিশ্রুতিশীল কথাসাহিত্যিক হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন।

১৯৩৩ মাদ্রাসা-এ-আলিয়ায় এ্যাংলো পার্সিয়ান বিভাগ থেকে প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পাশ করেন।

১৯৩৪ কলকাতা সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে ভর্তি হন। সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের কয়েকজন শিক্ষকের সাহচর্য এবং তাদের যৌক্তিক ব্যাখ্যা শওকত ওসমানের অন্তর্জগতকে অসাম্প্রদায়িক চিন্তায় আলোকিত করেছিল। এদের মধ্যে বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবং ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক ফাদার ব্রায়ান ছিলেন অন্যতম।

১৯৩৬ সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে আই. এ. পাশ করেন। এরপর তিনি একই কলেজে অর্থনীতিতে বি. এ. (অনার্স) শ্রেণিতে ভর্তি হন।

১৯৩৮ মার্চ মাসে শওকত ওসমানের প্রথম সাহিত্যকর্ম 'দিনের কবিতা' 'বুলবুল' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। মূলত শওকত ওসমানের লেখকসত্তা বিকাশের বা প্রকাশের প্রাথমিক মাধ্যম হিসেবে 'সওগাত', 'মাসিক মোহাম্মদী', 'দৈনিক আজাদ', 'বুলবুল' পত্রিকা, পত্রিকার সম্পাদকবৃন্দ, পত্রিকাকেন্দ্রিক এবং কলকাতাকেন্দ্রিক সমকালীন লেখকগোষ্ঠী বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। এ সময় যে সমস্ত স্বনামধন্য সাহিত্যিকের সাথে তাঁর সখ্য গড়ে ওঠে তাঁদের মধ্যে আবুল কালাম শামসুদ্দীন (১৮৯৭-১৯৭৮), আবুল মনসুর আহমদ (১৮৯৭-১৯৭৯), মুহাম্মদ হবীবুল্লাহ বাহার (১৯০৬-১৯৬৬), আবু জাফর শামসুদ্দীন (১৯১১-১৯৮৮), আহসান হাবীব (১৯১৭-১৯৮৬), গোলাম কুদ্দুস (১৯১৭-২০০৬), ফররুখ আহমদ (১৯১৮-১৯৭৪), আবু রুশ্‌দ্‌ (১৯১৯-২০১০), আবুল হোসেন (১৯২২-২০১৪), সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ (১৯২২-১৯৭১), সরদার

Dhaka University Institutional Repository

জয়েনউদ্‌দীন (১৯২৩-১৯৮৬), শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম (১৯২৬-১৯৯৭), আলাউদ্দীন আল আজাদ (১৯৩২-২০০৯) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। এ-বছর তিনি বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন।

১৯৩৯ অনার্সের বদলে সাধারণ বি. এ. পাশ করেন। অতঃপর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলায় এম. এ. শ্রেণিতে ভর্তি হন।

১৯৪০ 'মাসিক মোহাম্মদী' পত্রিকায় 'সাহিত্যিক কড়চা' নামে একটি গদ্য রচনা প্রকাশিত হয়। 'সাহিত্যিক কড়চা' রচনাটি প্রকাশের পর আবুল কালাম শামসুদ্দীন শওকত ওসমানের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যদীপ্ত এক শিল্পিসত্তা প্রত্যক্ষ করেন।

১৯৪১ এম. এ. শ্রেণিতে দ্বিতীয় বিভাগে পাশ করেন। এরপর বাংলা সরকারের তথ্যবিভাগে 'পেম্ফলেট রাইটার'-এর চাকরি নেন। এ সময় কৃষক পত্রিকায়ও ছয় মাস কাজ করেছিলেন।

১৯৪২ অক্টোবর মাসে কলকাতা গভর্নমেন্ট কমার্স কলেজের বাংলা বিভাগের প্রভাষক পদে করেন যোগ দেন।

১৯৪৩ চট্টগ্রামে ছাত্র ফেডারেশন আয়োজিত ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। তাঁর সহযাত্রী ছিলেন নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনের সভাপতি গৌতম চট্টোপাধ্যায় এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক গীতা মুখার্জি। এ-সম্মেলনে যোগদানকালীন আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ (১৮৭১-১৯৫৩), মুনীর চৌধুরী (১৯২৫-১৯৭১) এবং মাহবুব উল আলম চৌধুরীর (১৯২৭-২০০৭) সাথে তাঁর সখ্য গড়ে ওঠে। এরপর তিনি পূর্ব বাংলার প্রগতিশীল একাধিক সংগঠনের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখেন। এছাড়া চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত 'সীমান্ত' পত্রিকার একজন নিয়মিত লেখক এবং পরামর্শকও ছিলেন শওকত ওসমান।

১৯৪৪ দুই অঙ্ক বিশিষ্ট নাটক *তস্কর লস্কর* রচনা করেন। এ নাটকে তিনি সমসাময়িককালের নৈতিক মূল্যবোধের স্খলনজনিত সামাজিক সঙ্কটকে শৈল্পিক রূপদান করেন।

১৯৪৬ ঈদ সংখ্যায় শওকত ওসমানের প্রথম উপন্যাস *বণী আদম* এবং সাথে সাথে বিভিন্ন পত্রিকাতে বিচ্ছিন্নভাবে গল্পও প্রকাশিত হয়। এ কালপর্বটি মূলত শওকত ওসমানের লেখক হিসেবে আত্মপ্রতিষ্ঠার কাল হিসেবে বিবেচিত হয়।

১৯৪৭ দেশ-বিভাগজনিত কারণে তৎকালীন পাকিস্তানের পূর্ব বাংলায় চলে আসেন। চট্টগ্রাম সরকারি কমার্স কলেজে প্রভাষক পদে যোগদান করেন।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৫১ চট্টগ্রামে মাতৃভাষার জন্য আয়োজিত সাংস্কৃতিক সম্মেলনে আহবায়ক-এর দায়িত্ব পালন করেছিলেন। *পিঁজরাপোল*, *জুনু আপা ও অন্যান্য গল্প*, *সাবেক কাহিনী* প্রভৃতি গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

১৯৫৭ কাগমারিতে অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক সম্মেলনে 'আধুনিক বাংলা সাহিত্য' নামে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

১৯৫৯ ঢাকা কলেজে বদলি হন।

১৯৬২ ছোটগল্পের স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি বাংলা একাডেমি পুরস্কার পান। *ক্রীতদাসের হাসি* উপন্যাসের জন্য আদমজী পুরস্কার লাভ করেন। এছাড়া তৎকালীন সরকারের প্রেসিডেন্ট পুরস্কারে ভূষিত হন।

১৯৬৪ অক্টোবর মাসে একটি স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণ কোর্সে লন্ডন যান। এ সময় ঘনিষ্ঠ বন্ধু সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ প্যারিসে থাকতেন। তিনি লন্ডন থেকে বন্ধুর সাথে দেখা করতে যান।

১৯৬৯ গণআন্দোলনের সমর্থক শওকত ওসমান ১৯৭১-এর স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পশ্চিম পাকিস্তানে আশ্রয় নেন।

১৯৭০ ঢাকা কলেজে সহকারি অধ্যাপক পদে পদোন্নতি লাভ করেন।

১৯৭২ ১ এপ্রিল তিনি লেখালেখির জন্য অখণ্ড অবসর পেতে চাকরি থেকে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করেন।

১৯৭৫ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যু পরবর্তীকালে তিনি নীরব প্রতিবাদ হিসেবে স্বেচ্ছা নির্বাসনে দেশ ত্যাগ করেন। এ সময় তিনি ভারতের পশ্চিমবঙ্গ সহ বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় সময় অতিবাহিত করেছেন।

১৯৮০ সামরিক আইন ও বাংলাদেশের গণতন্ত্রের বিপর্যয় তাকে বেদনাদগ্ধ করেছিল। *পূর্ণ স্বাধীনতা চূর্ণ স্বাধীনতা* প্রবন্ধে সামরিকতন্ত্রের প্রতি শওকত ওসমানের বিরূপ মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়।

১৯৮১ নির্বাসন থেকে ফিরে প্রথমেই ছুটে যান ঢাকা বিশ্বদ্যিালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদ প্রাঙ্গণে চিরনিদ্রায় শায়িত কবি কাজী নজরুল ইসলামের সমাধিতে।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৮২ *নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত* ব্যঙ্গ কাব্য রচনা করেন।

১৯৮৩ একুশের পদক পেয়েছেন।

১৯৮৯ ৭৩তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে দেশের শিল্পী-সাহিত্যিকরা তাঁকে সংবর্ধনা প্রদান করেন। এ উপলক্ষে 'শুভ জন্মদিন' শিরোনামে একটি সুভেনির প্রকাশিত হয়।

১৯৯০ 'মুক্তধারা সাহিত্য পুরস্কার' লাভ করেন।

১৯৯২ *শেখের সম্ভরা* ব্যঙ্গ কাব্য রচনার মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন অসংগতিকে তির্যক ভাষায় ফুটিয়ে তুলেছেন। বাংলাদেশ লেখিকা সংঘ পুরস্কার লাভ করেন।

১৯৯৫ সত্যেন সেন পুরস্কার প্রদান করা হয়।

১৯৯৮ জীবন ও শিল্পচেতনা নিয়ে প্রায় অর্ধ-শতাব্দী কাল সাহিত্য চর্চায় নিমগ্ন থেকে ১৪ মে শওকত ওসমান মৃত্যুবরণ করেন।

Dhaka University Institutional Repository